Approved by the Provincial Text-Book Committee and prescribed by the Director of Public Instruction, Bengal and Bihar, as a Text-Book for Classes V & VI of Secondary Schools, (H. E., M. E. and M. V.).
(*Vide*, *Calcutta Gazette June* 22, 1939)
Also Approved by tho D. P, I. Bihar,
(*Vide*, *Bihar*. *Gazette*, *Nov*. 23, 1938)

প্রাথমিক রচনা

ও

অনুবাদ

শ্রীকালিদাস রায়, কবিশেখর

কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য এক টাকা বার আনা

প্রকাশক—শ্রীক্ষীরোদলাল দত্ত
কমলা বুক ডিপো
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দশম সংস্করণ—১৯৪৫
একাদশ সংস্করণ—১৯৪৬

প্রিণ্টার—শ্রীফকির চন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩।এ, মদনমিত্র লেন, কলিকাতা

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক
দুরাত্মার ছল	...	....	২০৫
অতিলোভের দণ্ড	...	....	২০৭
পদ্যে গল্প	...	...	২১০
ঐতিহাসিক গল্প	...	...	২১২
চাঁদ-কেদার, শিবাজী প্রভৃ	....	...	২১২-২১৫
হাসির গল্প	....	...	২১৭
পৌরাণিক গল্প	...	...	২২২
চিত্র হইতে গল্প	...	...	২২৬
গল্পের অনুশীলনী	...	...	২৩০
মহাত্মা গান্ধী	....	...	২৩৭
ফুল	....	....	২৪০
ফল	...	...	২৪২
সর্প	....	....	২৪৩
ছয় ঋতু	...	...	২৪৬
কাশীভ্রমণ	....	...	২৫১
ভূমিকম্প	....	...	২৫৫
পরিশিষ্ট	...	...	২৫৯

প্রাথমিক রচনা

মুখবন্ধিকা

(শিক্ষকগণের পাঠনার সহায়তার জন্য)

বাক্য-গঠন সম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ

রচনামাত্রেই কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি। রচনাকে সুন্দর ও সুপাঠ্য করিতে হইলে বাক্যগুলিকেও বিশুদ্ধ ও সরস করিয়া গঠন করিতে হইবে। সেই সঙ্গে বাক্যে অনেকখানি ভাবের প্রকাশ হওয়া চাই। তাহা না হইলে, অযথা বাক্যের সংখ্যা বাড়াইতে হয়। একটি বাক্যে অনেকখানি ভাব প্রকাশ করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে বিশেষণাদি প্রয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু সেইগুলিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিলেই বাক্য সুরচিত হয় না। কোন্ বিশেষ্যের পক্ষে কোন্ বিশেষণটি সম্পূর্ণ উপযোগী, কোন্ ক্রিয়ার সহিত কোন্ ক্রিয়াবিশেষণের ব্যবহার সঙ্গত, তাহা জানা চাই। বিশেষণ আবার দুই শ্রেণীর আছে। কতকগুলি চলিত ভাষার

বহু দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই অংশ শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিবেন ইহাই অভিপ্রেত।

পক্ষে, কতকগুলি মার্জ্জিত ভাষার পক্ষে উপযোগী। চলিত ভাষার বিশেষণাদি মার্জ্জিত ভাষায় চলিবে না। যেমন—

(১) মেঠো পুষ্পে ক্ষেত্রখানি ভরা।

(২) পুষ্পিত গাছে কলকণ্ঠ পাখীগুলি গান ধরেছে।

এই দুইটি বাক্যে ত্রুটি আছে। হওয়া উচিত—

(১) মেঠো ফুলে ক্ষেতখানি ভরা।

(২) পুষ্পিত বৃক্ষে কলকণ্ঠ পক্ষিগণ গান ধরিয়াছে।

তেমনি—

(১) শামুকটি শনৈঃ শনৈঃ বাঁশের গায়ে উঠ্‌ছে।

(২) তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান কর।

এই দুইটি বাক্যেও দোষ আছে। 'শনৈঃ শনৈঃ'—স্থলে হওয়া উচিত **আস্তে আস্তে** এবং 'তাড়াতাড়ির' স্থলে হওয়া উচিত **সত্বর**। চলিত ভাষার সঙ্গে মার্জ্জিত ভাষার মিশ্রণকে বলে **গুরু-চণ্ডালিয়া** দোষ।

দুগ্ধবতী, শীতল উৎপত্তি ও **দ্রুত** এই চারিটি শব্দের সাহায্যে বাক্য রচনা করিতে দিলে যদি কেহ লিখে—

(১) আমার দুগ্ধবতী গাভী আছে। (২) জল শীতল পদার্থ (৩) এইভাবে রোগের উৎপত্তি হয়। (৪) দ্রুত চল।

তবে বাক্য-গঠনে কোন ত্রুটি থাকে না সত্য,—কিন্তু বাক্যগুলিতে অতি অল্প ভাবই প্রকাশিত হয়। তাহার বদলে যদি লেখা যায়,—

(১) বঙ্গদেশের গোষ্ঠ একদিন দুগ্ধবতী গাভীতে পূর্ণ ছিল।

(২) গ্রীষ্মকালে কূপের জল শীতল হয়—শীতকালে উষ্ণ থাকে।

(৩) বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফলপুষ্পের উৎপত্তি। (৪) দ্রুত গমনের জন্যই দেশে দেশে অশ্বের এত সমাদর।

—তাহা হইলে বাক্যগুলির মূল্য ও মর্য্যাদা বাড়িয়া যায়,—**অনেকখানি** ভাবও প্রকাশিত হয়।

বাক্যে **সরসতা সৃষ্টি** করা সহজ নয়। সে কথা পরে হইবে। কি করিয়া বিশুদ্ধভাবে বাক্যগঠন করিতে হয়, সেই কথাই এখন বলা যা'ক।

কোন রচনায় বাক্যগুলির মধ্যে যদি পরস্পর কোন যোগসূত্র না থাকে, যদি প্রত্যেকটি বাক্যের সহিত পরবর্ত্তী বাক্যের সম্বন্ধ বুঝাইয়া না দেওয়া হয়,—তাহা হইলে রচনায় ভাব 'জমাট বাঁধে' না—অর্থও সুস্পষ্ট হয় না। সে-জন্য সংযোজক অব্যয়ের (Conjunction) সাহায্যে একটি বাক্যের সহিত আর একটি বাক্যের যোগ সাধন করিতে হয়।

এই শ্রেণীর অব্যয়-শব্দ বাক্যে ব্যবহার করিতে হইলে আগে দুইটি সরল বাক্য রচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

তবে ও নতুবা দিয়া বাক্য রচনা করিতে হইলে,—

(১) তবে ফসল ফলিবে না। (২) নতুবা সংসার চলিবে না।

এইরূপ লিখিলেই যথেষ্ট হইবে না; লেখা উচিত—

(১) যদি সুবৃষ্টি না হয়, তবে ফসল ফলিবে না।

(২) কাজকর্ম্ম কর, নতুবা সংসার চলিবে না।

বঙ্গভাষায় বাক্য রচনা করিতে হইলে প্রথমে কর্তৃকারক, তাহার পর অন্যান্য কারক,—সর্ব্বশেষে ক্রিয়া বসাইতে হয়। কর্ম্মকারক ও ক্রিয়াবিশেষণকে ক্রিয়ার কাছাকাছি বসাইলেই

চলে। **সম্বন্ধপদ** ও বিশেষণ, যে বিশেষ্যের পরিচয়ের জন্য ব্যবহার করিতে হইবে, সেই বিশেষ্যের ঠিক আগেই বসিবে।

(১) তিনি এই সংবাদ শ্রবণে অবিলম্বে গৃহত্যাগ করিলেন।

(২) আমি গাছ হইতে আঁকষী দিয়া একে একে ফলগুলি পাড়িলাম।

(৩) সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে বর্ষিত হইতেছে।

এইগুলি **সাধারণ নিয়মের** উদাহরণ। তাই বলিয়াই সর্ব্বত্রই এই নিয়ম চলিবে না,—বাক্যের মধ্যে যেখানে যে পদটি বা যে কারকটি বসাইলে শুনিতে ভাল লাগে ও অর্থ বেশ স্পষ্ট হয়—ঠিক সেইখানেই সেটিকে বসাইতে হইবে। সে সম্বন্ধে **বাঁধাধরা** কোনও নিয়ম নাই।

ক্রিয়াপদটি প্রায় সর্ব্বত্র শেষেই বসিবে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে ক্রিয়াও আগে বসিতে পারে। বাক্যের যে পদটির উপর বেশি জোর দিবার প্রয়োজন, তাহাকেই সাধারণতঃ সর্ব্বাগ্রে কিংবা সর্ব্ব শেষে বসাইতে হইবে। যে বাক্যাংশ অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারাই সমাপ্ত, সে বাক্যাংশকে আগেই বসাইয়া লওয়া যাইতে পারে, কর্ত্তৃপদ উহ্য থাকিতে পারে, ক্রিয়াপদও উহ্য থাকিতে পারে,—যে-কোন কারকও শেষে বসিতে পারে।

কতকগুলি উদাহরণের দ্বারা বাঙ্গালার **বাক্য-রচনার প্রকৃতিটি** বুঝানো যাইতে পারে।

১। দানবরাজ ব্রহ্মার নিকট এই বর চাহিয়া লইলেন যে, তাঁহার মৃত্যু মানবের হাতে কখনও হইবে না।

এই বাক্যটি সাধারণ নিয়মে ঠিকই আছে,—কিন্তু **শ্রুতিমধুর** নহে

তাহা ছাড়া, ব্রহ্মাকেই 'দানবরাজ' বলিয়া ভুল হইতে পারে। 'মানবের হাতে কখনও তাঁহার মৃত্যু হইবে না, ব্রহ্মার নিকট দানবরাজ এই বর চাহিয়া লইলেন।' পদগুলিকে এইভাবে সাজাইলে শোভন হয়।

২। রাজা কহিলেন—"কেন মারিবে ভাই? রাজ্যের লোভে?" এখানে উদ্ধৃত অংশে কর্তৃপদ ও কর্ম্মপদ উহ্য, সম্বোধনপদ—**ভাই** ক্রিয়ার পরে। (যদিও সম্বোধনপদ সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমেই বসে। যেমন—**নক্ষত্র**, তুমি আমাকে মারিতে চাও?)

রাজ্যের লোভে? ইহাও একটি বাক্য। ইহাতে কর্তৃপদ 'তুমি', কর্ম্মপদ 'আমাকে,' অব্যয় 'কি' ও ক্রিয়াপদ 'মারিবে' সবগুলিই উহ্য।

এইরূপ অনেক বাক্যে কোন কোন পদ **উহ্য** থাকিতে পারে। পূর্ব্বের বাক্য দেখিয়া কি কি পদ উহ্য তাহা স্থির করিতে হয়।

৩। রাজ্য পাইতে চাও ত, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য মনে কর।

কর্তৃপদ উহ্য—কর্ম্মপদ দিয়াই দুইটি বাক্যই আরব্ধ।

৪। তাঁহার সাহিত্যসেবার প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা—এইখানে কর্তৃপদ ও ক্রিয়া দুই-ই মাঝে আসিয়াছে। দুই-ই আবার প্রথমেও বসিতে পারে: যেমন,—

রবীন্দ্রনাথই ছিলেন তাঁহার সাহিত্য-সেবার প্রারম্ভে উৎসাহদাতা। এইরূপ বহু বাক্যে ক্রিয়াপদ আগে কিংবা মাঝে বসিতে পারে।

৫। এইরূপ বলিয়া, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া জাফর ইব্রাহিমকে বিদায় দিলেন। অসমাপিকা ক্রিয়া দুটি এখানে কর্তৃপদের আগে বসিয়াছে।

৬। তখন ক্ষুধিত, রুষ্ট, উত্তেজিত, জ্ঞানশূন্য দস্যুদলের একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—(বঙ্কিমচন্দ্র)

কর্তৃপদের সঙ্গে যতগুলি পদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অর্থাৎ যে পদগুলির ব্যবহার করিলে কর্তৃপদ সম্পূর্ণাঙ্গ হয় সেইগুলি সবই কর্তৃপদের পূর্ব্বে বসিয়াছে।

কর্তৃকারক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা **সম্বন্ধ**-পদ ও **অন্যান্য কারকের** সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। যেমন—সম্বন্ধ পদে।

৭। ম্যাসিডোনিয়ার অধীশ্বর, প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারের অধিকার-কালে ইত্যাদি। (বিদ্যাসাগর)

৮। তাহারা আপনার সন্তানকে ভাল কাপড় পরায় কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য।—(সঞ্জীবচন্দ্র)। এখানে ক্রিয়াপদ মাঝখানে বসিয়াছে,— **জোর দিবার উদ্দেশ্যে,** কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য, এই অংশকে বসানো হইয়াছে।

(ক) আমি টাকাকড়ি চাই না, আমি চাই শান্তি।

(খ) সেকালে মাটির দখল ঠিক হইতে লাঠির জোরে।

(গ) তুমি কি চলে যেতে চাও এ বাড়ী থেকে?

(ঘ) আমার যাহা কিছু আছে সবই দেশের এবং দশের।

(ঙ) টাকা এখন পাবে না, পাবে সেই পৌষমাসে।

উপরের বাক্যগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন কারকঘটিত পদগুলি জোর দেওয়ার জন্যই শেষে বসিয়াছে। ক্রিয়াগুলি সবই বসিয়াছে **মাঝে**।

প্রত্যহ গঙ্গাস্নানান্তে কাশীর দশাশ্বমেধ-ঘাটে সমবেত ভিক্ষুকগণের প্রত্যেককে তিনি একটি করিয়া পয়সা ভিক্ষা দিতেন।

এখানে কর্তৃপদ ক্রিয়াপদ হইতে বহুদূরে বসিলে ভাল শুনাইবে না বলিয়া তাহাকে প্রথমে না বসাইয়া **ক্রিয়ার কাছাকাছি** আনা হইয়াছে।

১। তৎক্ষণাৎ রাজসভা হইতে একজন রাজপুরুষ আসিয়া তাহাকে রোগশয্যা হইতে ধরিয়া লইয়া গেল।

ক্রিয়াবিশেষণ এখানে প্রথমে বসিয়াছে। ক্রিয়াবিশেষণ যদি ক্রিয়ার কাছাকাছি না বসে, তাহা হইলে সাধারণতঃ প্রথমেই বসে।

১১। (১) ধন, মান, যশ,—কিছুই আমি চাহি না।

(২) পথের হরিজনকেও মহাত্মা নিজের পরিজন মনে করেন।

(৩) অতিলোভ হইতেই মানুষের এত ক্ষতিক্ষোভ।

(৪) কলার ভেলায় আমি সাগর পার হইতে চাহিয়াছিলাম।

উপরের বাক্যগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন কারক কর্ত্তৃপদের আগেই বসিয়াছে। অবশ্য বাক্যে ঐ কারক ঘটিত পদগুলির প্রাধান্য বুঝাইতেছে।

অনুশীলনী

১। **অর্থসৌষ্ঠবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া** নিম্নলিখিত বাক্য-তালিকার পদগুলিকে সাজাও :—

(ক) আমাদিগকে রেলপথ পরিচিত করিয়াছে বিদেশের সহিত। খ) হর্ষবর্দ্ধন গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থানে এক প্রকাণ্ড মেলা প্রয়োগে বসাইতেন পাঁচ বৎসর অন্তর। (গ) সকলকেই দেশকে ভালবাসিতে হইবে অন্তরের সহিত। (ঘ) বাল্যকালের নির্ভীকতা সম্বন্ধে শেরশাহের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় একটি বিবরণ। (ঙ) চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয় আপনার গুরুভার অহল্যাবাঈ যেরূপ দক্ষতার সহিত বহন করিয়াছেন রমণী হইয়াও। (চ) পথে ঘাটে সকলকে আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে অন্ধখঞ্জ দেখিলেই উচিত দান করা।

২। **গুরুচণ্ডালিয়া দোষ** সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত বাক্য-গুলিকে পুনরায় লিখ।

(১) পাখীগণ সাঁজবেলায় কূজন করিতে করিতে কুলায়ে ঢুকিল। (২) দুর্দ্দান্ত ছেলেটার সাজা এমনি নিদারুণ হওয়া ঠিক। (৩) সুশীলা

নামক ঠাণ্ডা মেয়েটি বৃক্ষ হইতে ফুল চয়ন করিতেছিল। (৪) একটি তেজালো অশ্বে চ'ড়ে বীর সোহরাব লড়াই করিবার তরে যাত্রা করিল। (৫) ভারতের পাহাড় অরণ্যে হরেক রকম বুনো জাতি বাস করে। (৬) স্বর্ণের বর্ণ হলুদ, রৌপ্যের রঙ ধবল; লৌহ কালো হইলেও তাহার গুণের ওর নেই। (৭) পিতা ও মাকে ভক্তি করা সকল বেটাবেটীরই কর্ত্তব্য। (৮) ভুলক্রমে তোমার স্কন্ধে এই গুরুভার বোঝা চাপানো হইয়াছে।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শব্দগুলিকে **বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া** দেওয়া হইল এইগুলিকে সাজাইয়া **সৌষ্ঠবপূর্ণ** বাক্য রচনা কর :—

(১) বেলা মেঘ আসিল আছে পড়িয়া করিয়া তখনও। (২) নক্ষত্র রায়কে মহারাজ অরণ্যের সঙ্গে পদব্রজে লইয়া চলিলেন দিকে। (৩) কিন্তু হইতেছে ভ্রম সন্ধ্যা মেঘের অন্ধকারে। (৪) তাঁহার পুত্র না মনে যে সোহরাবই একথাও হইল। (৬) একদা হেলায় যাহার সেনানী বিজয় লঙ্কা করিল জয়। (৭) পড়িলে হীরার শিঙে ভাঙে ভো:ার ধার। (৮) আপনি মানে না মোড়ল গাঁয়ে। (৯) ভেড়া কত বলে তল গেল ঘোড়া হাতী জল।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাক্য-রচনা

বাক্য রচনায় বিশেষণ প্রয়োগ

সুশীল, খঞ্জ, অগাধ, ভয়ানক, ভীষণ, জলীয়, বিষম, অসম্ভব ইত্যাদি বিশেষণ সাহায্যে বাক্য রচনা করিতে হইলে যদি—গাভীটি সুশীল, খাটটি খঞ্জ বা তাহার ওজর খঞ্জ, তাহার ব্যবহার বেশ উজ্জ্বল, তাহার কথায় তেজ অগাধ, তার ভয়ানক ঘুম পেয়েছে, সে ভীষণ পড়া পড়ছে, কলমী একটি জলীয় উদ্ভিদ, খরিশ বিষাক্ত সর্প এ বিষয়ে তাহার বিষম দৃষ্টি, মেলায় অসম্ভব ভিড় হয়েছে—এইরূপ লেখা যায় তাহা হইলে বিশেষণগুলির প্রয়োগ ঠিক হইবে না। কোন্ বিশেষণ কোন্ বিশেষ্যের সঙ্গে সচরাচর চলে এবং চলিলে শুনিতে অসঙ্গত লাগে না, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

নিম্নে বিশেষ্যপদের পূর্ব্বে কিংবা পরে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ দিয়া বাক্য রচনার কতকগুলি নিদর্শন দেওয়া হইল—

আকাশ (নির্ম্মল, নীল, পূর্ণ)—**নির্ম্মল নীল** আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে।

ধেনু (পয়স্বিনী)—**পয়স্বিনী** ধেনুই বাঙ্গালার প্রধান সম্পত্তি ছিল।

গাই (দুধলো)—একদিন **দুধালো** গাইএ গোয়াল ছিল ভরা।

উদর (দগ্ধ)—এই **দগ্ধ** উদরের জন্য কত পাপই করিতে হইবে।

পেট (ভরা, খালি)—**খালি** পেটে কিংবা **ভরা** পেটে চা খেও না।

নদী (ভরা, মরা)—ডুবলো চড়া, **মরা** গাঙ আজ কূলে কূলে **ভরা**।

দৃষ্টি (কাতর)—ভিখারীটি **কাতর** দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।
শোক (দারুণ)—তিনি তরুণ বয়সে **দারুণ** শোক পাইলেন।
বন (গভীর)—**গভীর** বনে রবির কিরণ প্রবেশ করে না।
তরী (ভগ্ন)—ভগ্ন তরীতে আরোহণ করিলে মগ্ন হইবার আশঙ্কা।
পথ (পিচ্ছিল দ্রুত)—**পিচ্ছল** পথে দ্রুত গমন মূঢ়তা।
পবন (চঞ্চল)—**চঞ্চল** পবনে জননীর অঞ্চলখানি দুলিতেছে।
সম্বল (চরম)—পরিণামে হরিনামই **চরম** সম্বল।
কড়ি (কানা)—যে খেলতে জানে সে **কানা** কড়িতেই খেলতে পারে।
মেয়ে (কুঁদুলে)—এমন **কুঁদুলে** মেয়ে কোথাও গিয়ে সুখ পাবে না।
ডাক্তার (হাতুড়ে)—পাড়াগাঁয়ে **হাতুড়ে** ডাক্তার ছাড়া উপায় কি?
ছুরি (ভোঁতা ধারালো)—**ভোঁতা** ছুরি কি সহজে **ধারালো** হবে?

অনুশীলনী

উপযুক্ত **বিশেষণ** বসাইয়া শূন্য স্থান পূরণ কর—

—ভিক্ষুককে দয়া কর। —মল্লিকারই আদর, —পলাশকে কেহ আদর করে না। —রঙ ধোপে নিশ্চয়ই টিকিবে। রাস্তাটি—ছিল, অল্পদিন হইল হইয়াছে। কাচ—পদার্থ, কিন্তু—। ধাতুর মধ্যে স্বর্ণ—। ইহার বর্ণ—। যেমন—বাজিয়ে, তেমনি—গাইয়ে। এই ভারতবর্ষে সবই পাইবে, —পর্ব্বতে, —নদী, —অরণ্য, —মরুভূমি,—প্রান্তর। ইহার—দিক্ —সমুদ্রের দ্বারা—। পদ্ম—জলে ফুটে না, —জলেই ফুটে। —বাতাসে বেড়াও,—খাদ্য খাও, —জলে স্নান কর,—শ্রম করিও না, শরীর—সময়ের মধ্যেই—হইবে। যেমন—ওল তেমনই—তেঁতুল।

চলিত ভাষায় বিশেষণ-প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

চলন্ত গাড়ী হইতে ঝাঁপ দেওয়া আর **জ্বলন্ত** আগুনে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা। **ফলন্ত** বা **ফুলন্ত** গাছ কাটিয়া ফেলা পাপ। তাহার **পেঁচোয়া** বুদ্ধির কাছে কাহারও বাঁচোয়া নাই। বেশি **চতুর** হইলেই শেষে **ফতুর** হইতে হয়। একটা **ঘরাও** ব্যাপারে পরকে জড়াও কেন? **খাজাই** হউক, আর **গজাই** হউক, **টাটকা** ও **তাজা** হওয়া চাই। **জ'লো** দুধ আর টকো দই, এ ছাড়া তোর পুঁজি কই? **বেঁশো** ঘরে বাস করি, **মেঠো** হাওয়া খাই, **কুনো** বল, **বুনো** বল, কোন দুঃখ নাই। তার যেমন **ইঁদুরে** কপাল, তেমনি **বাঁদুরে** বুদ্ধি। **নিবুনিবু** দীপখানি **ডুবুডুবু** না (নৌকা), **মরমর** ছেলেটির পাশে কাঁদে মা। **কন্‌কনে** শীতে **গনগনে** আগুনই ত চাই। **বস্তাপচা** মাল **সস্তা** পেলেও কিনতে নেই; **আসল খাঁটি** জিনিস কোথায় পাইবে? সবই এখানে **ভেজাল, নকল** আর **মেকি**।

মার্জ্জিত ভাষায় বিশেষণ প্রয়োগের কয়েকটি দৃষ্টান্ত

লুব্ধ কাঠুরিয়া কুঠারখানি হারাইয়া **ক্ষুব্ধ** হইয়া কুটীরে ফিরিল। দিনান্তের **ক্লান্ত** পান্থ **শ্রান্ত** পদে প্রবেশিল গ্রামে। **প্রচুর** অর্থ না পাইলে সবই ব্যর্থ। **উদ্ধত** বীরযুবক **উদ্যত** অসি হস্তে শিবিরে প্রবেশ করিল। **সুস্থ** শরীরকে অকারণে **ব্যস্ত** করিয়া লাভ কি? **আশ্বস্ত** চিত্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার শিরের কেশ **ধবল** হইয়াছে, কিন্তু শরীর বেশ **সবলই** আছে। **নানা** মুনির নানা মত **ভক্ত** জনের একটি পথ।

পিতা **সঞ্চিত** অর্থ হইতে পুত্রকে **বঞ্চিত** করিলেন। তাহার **শিষ্ট** আচরণে ও **মিষ্ট** আলাপনে সকলেই **হৃষ্ট** ও **তুষ্ট**। আমি যে **উত্তম** পুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ কি ?

[লক্ষ্য করিতে হইবে, একই বিশেষণ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ্য-পদের সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। যেমন—

মন্দ—মন্দ কপাল, মন্দ গতি, মন্দ অগ্নি (মন্দাগ্নি), মন্দ পবন, মন্দ সংসর্গ, (মন্দা) বাজার, মন্দ অভিপ্রায়।

পাকা—পাকা কথা, পাকা রাস্তা, পাকা দেখা, পাকা চোর, পাকা হাত, পাকা ফলার, পাকা আম, পাকা রঙ, পাকা খেলোয়াড় ।]

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত **বিশেষণগুলির** সঙ্গে উপযুক্ত **বিশেষ্যপদ** যোগে বাক্য রচনা কর:—

চঞ্চল, দিব্য, খর, মগ্ন, নগ্ন, গহন, নিবিড়, গাঢ়, পঙ্কিল, পাষণ্ড, বিপন্ন, গভীর, রম্য, কদর্য্য, প্রসন্ন, স্তব্ধ, দুর্দ্দান্ত, বক্র, প্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ, গম্ভীর, খর্ব্ব, হ্রস্ব, বধির, দীর্ঘ, মাদক, সুপ্ত, দাতব্য, প্রাপ্য, পক্ব, পঞ্চম, প্রিয়তম, পূজ্যতম, অন্যতম, দৃঢ়, লঘু, হীন, হেয়, দেয়, শ্রেষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ, চরম, পরম।

বাসি, ঢিলে, কষা, সোনা, খেলো, পিছন, চেনা (মুখ), আস্ত, মস্ত, পাতলা, ঢাকাই, ভুয়ো, আসল, নকল, চটা, উল্টা, মেটে, মাঝারি, খাটো, লালচে, বেগুনে, খোঁয়াটে, বাড়তি, জীবন্ত, ভাসন্ত, ফুলো, হুজুগে, দরাজ, ঠুনকো, পল্কা, চটকদার, মজাদার, মিহি, শাঁসালো, ঝাঁঝালো, জড়সড়, কোণঠাসা, বোট্কা, সিঁদুরে, ভয়াল, দয়াল, সরকারী, দরকারী, জরুরী, ঝামা, আমা, দামী, খেনো ও হাল্কা।

২। **উপযুক্ত বিশেষ্যপদ** প্রয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত শূন্যস্থান-গুলি পূর্ণ কর :—

বাক্সে—রেখে দাও। ছেলেরা রঙ্গীন—ভালবাসে। পটোলের চাষের জন্য বেলে—চাই। পচা—মশা জন্মায়। আঁটা—বেশীক্ষণ থাকা যায় না। মেকি—চালাইতে চেষ্টা করিও না। চোরাই—কিন'না; কাণা—বামুনকে দান। ঠুনকো—কারবারে লাভের আশা বৃথা। সোজ—ঘি ওঠে না।

ক্রিয়াবিশেষণ-প্রয়োগে বাক্য-রচনা

নিম্নে (মার্জ্জিত ভাষা ও চলতি ভাষার উপযোগী) কতকগুলি ক্রিয়া-বিশেষণ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল :—

ঘনঘন—ভিখারী আসিয়া ফিরিয়া যেতেছে ঘনঘন।' **কখনও কখনও**—কখনও কখনও তাঁহাকে বিলাতি পোশাক পরিতেও দেখি।

ঠায়—পাঁচটা হইতে ঠায় বসিয়া আছি, এখনও দেখা নাই। **বরাবর**—বরাবর চ'লে গেলে সামনেই একটি নদী পাবেন। **সটান**—বড় সাহেবের কাছে সটান চ'লে যাও। ভয় কি? **মাঝে মাঝে**—'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই—চিরদিন কেন পাই না'। নিশ্চয়—তোমাকে এ কাজ নিশ্চয় করিতে হইবে। **নিশ্চয়ই**—সেখানে আর যাইব না? নিশ্চয়ই যাইব। **ক্রমশঃ**—ক্রমশঃ তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে। **সত্যসত্যই** তুমি কি সত্যসত্যই চিরদিনের জন্য দেশ ছাড়িয়া যাইবে?

প্রাণপণে—প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া দেখিলাম—আমার দ্বারা এ কাজ হইবে না। **কচিৎ**—এখানে তাহাকে কচিৎ কখনও দেখি। **কদাচ**—কদাচ মিথ্যা কথা বলিও না।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত ক্রিয়া-বিশেষণগুলির সাহায্যে বাক্য গঠন কর :—

সত্বর, মন্দমন্দ, একাদিক্রমে, মৃদুমৃদু, উচ্চৈস্বরে, মুহুর্মুহুঃ, আকণ্ঠ, যাবজ্জীবন, যথাশক্তি, বেঘোরে, সদ্যসদ্য, চিরকাল, অচিরে, অবিলম্বে, অধুনা, সম্প্রতি, রাতারাতি, ইচ্ছামত, ইতিমধ্যে সর্ব্বথা, বহুধা, ক্রমশঃ, বেলাবেলি, সর্বপ্রযত্নে, অযথা।

উপযুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ যোগে শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর :—

—শ্রম কর, ফল পাইবে। তাহাকে—এখানে দেখি। তুমি যে দেখছি—বড়লোক হইবার চেষ্টা করছ। —স্নান করিবে। তিনি ঘণ্টা তিনেক—বকিয়া গেলেন। আমি মাঝখানে চলি, তুমি—চলো, রবি—আসুক। যদি—এসে পড়ে, তখন কি হবে? উদয় ও বুদ্ধদেব—প্রথম ও দ্বিতীয় হইয়াছে। তিনি ঘটনাটির—বর্ণনা করিলেন। উৎকণ্ঠিত হইও না,—সংবাদ আসিবে।

"বিশেষণের বিশেষণ" যোগে বাক্য রচনার উদাহরণ

ভারি—তুমি দিনদিন ভারি দুষ্ট হচ্ছ। **বেশ**—রমেশ বেশ চালাক লোক। **নেহাৎ**—আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট।

অতিশয়—জীবন অতিশয় সাবধান লোক। **ধবধবে**—তার রঙ ধবধবে সাদা। **টকটকে**—আমগুলি টকটকে (টুকটুকে) লাল। **মিশমিশে**—বলির জন্য একটি মিশমিশে কালো ছাগল চাই।

কতকটা—আজ তাহার অবস্থা কতকটা ভাল। **কিছু**—বাজারের

অবস্থা কিছু খারাপ। **কিঞ্চিৎ**—তিনি একটি ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ব্যস্ত আছেন। **পরম**—আপনার পত্র পাইয়া পরম পুলকিত হইলাম।

অত্যন্ত—তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম! **বড়ই**—সে অর্থাভাবে বড়ই অসুখী। **একান্ত**—আমি আপনার একান্ত অনুগত।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বিশেষণ পদগুলির পরে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ করিয়া বাক্য রচনা কর:—বেজায় ঠিক, অথবা, খুব বেশী, অন্যূন, কম, অল্প, সামান্য, অপেক্ষাকৃত, রীতিমত, অনেকটা, প্রায়, কষ কষে (কাঁচা,) তলতলে (পাকা), ঘোর ঈষৎ, তুলতুলে (নরম)।

অব্যয় শব্দের যোগে বাক্য রচনার দৃষ্টান্ত

বিনা—দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? **ছাড়া**—কচি ছেলে মা ছাড়া কেমন করে থাকবে? **চেয়ে**—রামের চেয়ে শ্যাম ঢের বেশি বুদ্ধিমান্। **থেকে**—(১) কলিকাতা থেকে কটক কত দূর? (২) এখান থেকে সেখানে সব জিনিষই সস্তা। **মত, মতন**—(১) এটি তার মুখের মত জবাব হয়েছে। (২) তোমার মতন বোকা আর দেখি নাই।

ন্যায়—সে সকল বিষয়েই পিতার ন্যায়। **ধিক**—ধিক এই পরাধীন জীবনে! **জন্য**—তোমার জন্যই আমার এ লাঞ্ছনা।

বটে—(১) বটে? এত বড় আস্পর্দ্ধা! (২) হাঁ, তাই বটে। **প্রভৃতি ইত্যাদি**—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি এদেশের বন্য জন্তুর কথা এবার বলিব। **হায়**—হায়! তোমার জন্যই দুঃখ হয়। **মরি**—মরি কি সুন্দর শোভা হয়েছে গগনে'। **মরি মরি**—মরি, মরি! শিশুটির কি মধুমাখা কথাগুলি!

কিনা—এরূপ বর্ষাবাদলে যাব কিনা তাই ভাবিতেছি। **নাকি**—তাই নাকি? হবেত সাবধান হইতে হয়! **কেন**—তুমি একটি গান গাও ত? 'কেন আমি কি গাইতে জানি না?' **বই**—রবি বই মুখ খোলে না সে, কবি বই কার কথায় থাকে? (বিষ্ণুরাম)।

অগত্যা—তুমি আজও আসিলে না, অগত্যা আমাকেই যাইতে হইল। **কিন্তু**—অখিলের যোগ্যতা নাই, কিন্তু ভাগ্য ভালো। **অতএব**—তুমি কথামত কাজ কর নাই, অতএব তোমাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। **যেহেতু**—তোমার বুদ্ধি প্রখর নয়, (অতএব) তোমাকে বেশি বেশি খাটিতেই হইবে। **কাজেই**- বিনা পয়সায় পেলাম না,—কাজেই পয়সা দিয়ে কিনে আনতে হবে। **নতুবা**—তোমার দুস্কৃতির সীমা নাই, নতুবা এমন দুর্গতি হইবে কেন? **নইলে**—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নইলে খরচ বাড়ে।

এমন অনেক অব্যয়-ক্রিয়াবিশেষণাদি আছে, যাহাদের একটিকে ব্যবহার করিলে তাহার সঙ্গে আর একটিকে ব্যবহার করিতে হয়; নতুবা ভাবপ্রকাশ সম্পূর্ণ হয় না। একটিকে ব্যবহার করিলে আর একটি আপনিই আসিয়া পড়িবে।

যেমন—**যদি** সে আসে, **তবে** আমি যাইব। এখন '**যদি সে আসে**' বলিলেই আর একটি বাক্য চাই নতুবা বাক্যটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এই দ্বিতীয় বাক্যটিকে **তবে** দিয়া আরম্ভ করিতে হইবে; যদি আর 'তবে' এই দুইটি শব্দ সমস্ত বাক্যটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে।

হয়...নয়—হয় তুমি যাও নয় (নয়ত) আমি যাই।

হয়ত....নয়ত—হয়ত তাহার বুদ্ধি নাই, নয়ত সে একেবারেই পড়ে না।

যদিও...তবু—যদিও সে সম্মত নয়, তবু একবার চেষ্টা করিয়া দেখ।
যদি বা...তাও—যদিবা একটি হাঁড়ি পাইলাম তাও আবার ফুটো।
যখন...তখন—(ক) যখন তোমার ইচ্ছাই নাই—তখন তোমাকে অনুরোধ করিয়া ফল কি? (খ) যখন আমি পুরীতে ছিলাম তখন প্রত্যহ সমুদ্রতীরে বেড়াইতাম।
এমন...যে—সে আজকাল এমন দুর্ব্বল যে, নড়িতেই পারে না।
এমনই...তবে—এমনই যদি তাহার ইচ্ছা, তবে আগে বলে নাই কেন?
যত...তত—যার ছেলে যত খায়, তার ছেলে তত লালায় (চায়)।

অনুশীলনী

উল্লিখিত রীতি অনুসরণে বাক্য রচনা কর :—

যেন—এইভাবে। যদিই—তাও। যাঁহা—তাঁহা। যাবৎ—তাবৎ। এত—যে। প্রথমে—শেষে। কেন—তাই। প্রথমতঃ—দ্বিতীয়তঃ। পূর্ব্বে—পরে। যবে—তবে। কি এমন—যে। যিনি—তিনিই। এত কি—যে। কত—যে জন্য। যত্র—তত্র। যদি—অগত্যা।

নিম্নলিখিত অব্যয় শব্দগুলির সাহায্যে বাক্য রচনা কর :—

দ্বারা, উপরে, ভিতরে, মাঝে, তাই, অয়ি, ধন্য-ধন্য, পিছু, আগে, পরে, মারফতে, প্রমুখাৎ, সঙ্গে, সহ, সহিত, সমানে, দিয়া (দ্বারা অর্থে), অধীনে, নীচে, তবে, লাগি, লাগিয়া (জন্য), অপেক্ষা, ব্যতীত, করিয়া (দ্বারা), হইয়া (বদলে, মধ্য দিয়া), তাঁবে, ওরফে, বনাম, দরুন, কাছে, বরং, অধিকন্তু।

একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন পদে প্রয়োগ

একই শব্দ প্রায় অভিন্ন অর্থে বা বিভিন্ন অর্থে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ্য-বিশেষণাদি পদে ব্যবহৃত হইতে পারে। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ভিন্ন-ভিন্ন পদে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখানো হইল।

শোনা (বিশেষ্য)—চোখে দেখা আর কাণে শোনা—দুই এক নয়।
(বিশেষণ)—শোনা কথায় কখনও বিশ্বাস করিও না।

জোর (বি)—তাহার গায়ে খুব জোর।
(বিণ)—তোমার দেখছি জোর তলব (বা বরাত)।
ক্রি-বিণ—বাতাসটা তখন জোর বইছিল।

(বিণ)—আমার কিছু টাকার প্রয়োজন। (সর্ব্বনাম)—তুমি ত অনেক পাইয়াছ, আমাকে কিছু দাও। (বিণ-বিণ) এজন্য সে কিছু দুঃখিত। আজ সে কিছু সুস্থ আছে।

নাই (ক্রিয়া)—তাহার কোন উপায় নাই (ন+অস্তি)। (অব্যয়)—সে এদিকে আসে নাই। (বিণ)—নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।

গেল (ক্রিয়া)—ক্রমে তাহার সর্ব্বস্ব গেল।
(বিণ)—গেল বছরে আমাদের একেবারেই ধান হয় নাই।

আসছে (ক্রিয়া)—ঝড় আসছে, দরজা বন্ধ কর।
(বিণ)—আসছে বছরে প্রচুর ফসল হ'বে।

ফলে (ক্রিয়া)—এই গাছে আম ফলে না।
(বি)—ফলে লোভ না রাখিয়া কাজ কর।

(অব্যয়) সে সময়ে উপস্থিত হইল না, ফলে কাজটি হারাইল।

ভুলে (ক্রিয়া)—সে সব কথা ভুলে গিয়েছে। (বি) 'ভুল কর' না। এরূপ ভুলে বিপদ্ আছে। (ক্রি-বিণ) ভুলেও সে এদিকে আসে না।

দিয়া (ক্রিয়া)—মেঘ জল দিয়া প্রতিদান চাহে না। (অব্যয়) দা দিয়া পা কাটিও না যেন। পথ দিয়া চল, বিপথে যাইও না।

হইতে (ক্রিয়া)—এ সংসারে সকলেই সুখী হইতে চায়। (অব্যয়)—বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা কত দূর?

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে ভিন্ন-ভিন্ন পদে ব্যবহার কর:—

থেকে, অবধি, ছেঁদা, কি, ফুটা, জ্বালা, কড়া, আনা, ন্যায়, কত, অপেক্ষা, চেয়ে, টানা, কাট, দ্রুত, সোজা, চটা, নেহাৎ, হানা, ছাড়া, সত্বর, নিশ্চয়, সত্য, মিথ্যা, কালে, প্রত্যক্ষ, ধ্রুব, শুভ, যে, কাজেই তাই, মোট, শেষে, জন্য, ভিন্ন, লাগিয়া।

বিবিধ শব্দ-যোগে বাক্য-রচনা

পাঠ্যপুস্তকে সচরাচর-ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দগুচ্ছ বা শব্দের সাহায্যে বাক্য-রচনার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল।

যার-পর-নাই (যৎপরোনাস্তি)—ইহা শুনিয়া তিনি যার-পর-নাই দুঃখিত হইলেন। **স্বীকার করি**—স্বীকার করি তুমি নির্দোষ, কিন্তু কুসংসর্গে মেশ কেন? **ইহা ছাড়া**—(এতদ্ব্যতিরিক্ত)—ইহা ছাড়া, তাহার অন্য দোষও ছিল। **মোট কথা**—মোট কথা, যতই কারণ দেখাও

তোমার দণ্ড হইবেই। **পনেরো-আনা** (অধিকাংশই)—তাহার কথার পনেরো আনাই মিথ্যা। **যথাক্রমে**—কনক, অমিয় ও অমিতাভ যথাক্রমে পরীক্ষায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছে।

একদিকে, অপরদিকে—একদিকে নিজের সন্তান, অন্যদিকে প্রভুপুত্র, ধাত্রীপান্না উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। **সত্যসত্যই**—একদিন সত্যসত্যই পালে বাঘ পড়িল। **ধন্য ধন্য করা**—সভার লোকেরা এই কথা শুনিয়া একবাক্যে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। **না জানি**—না জানি, অদৃষ্টে কত দুঃখই আছে! **মুখ দিয়া**—আমার মুখ দিয়া এই অশুভ সংবাদ কেন বলাইবেন? **অধিক কি**—দৈহিক ক্ষতি ত হইবেই; অধিক কি, ইহাতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে।

এমন কি—রাজপুতনার সকল রাজ্য এমন কি সহোদর শক্ত-সিংহও প্রতাপকে ত্যাগ করিলেন। **যেমন-তেমন**—ভীষ্ম যেমন তেমন বীর ছিলেন না। **আপন আপন**—সময় থাকিতে আপন আপন পথ দেখ।

মুক্তকণ্ঠে—সকলে মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই কার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। **পদব্রজে**—বিদ্যাসাগর নিজ গ্রাম হইতে পদব্রজে কলিকাতা আসিতেন। **দ্রুতপদে**—এই কথা শুনিয়া দূত দ্রুতপদে সেখান হইতে প্রস্থান করিল। **স্থানান্তরে**—এখানে কোন সুবিধা হইবে না, স্থানান্তরে যাও। **আকণ্ঠ**—আকণ্ঠ ভোজন করিলে উদরাময় জন্মিবার সম্ভাবনা।

শোকাকুল—'একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা'। **পশ্চাৎপদ** (পিছপা)—তিনি কোন কাজে সহজে পশ্চাৎপদ হইতেন না। **গাত্রোত্থান**—আহার্য্য প্রস্তুত, এইবার সকলে গাত্রোত্থান করুন। **অন্তঃপাতী**—মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী বীর-সিংহ গ্রামে

বিদ্যাসাগরের জন্ম। **নিকটবর্ত্তী**—কেবল স্বগ্রাম কেন, নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহেও চাঁদা তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। **যাবজ্জীবন**—দেশবন্ধু যাবজ্জীবন কেবল দেশের ও দশের মঙ্গলচিন্তাই করিয়াছেন। **যথাশক্তি**—সকলেরই যথাশক্তি দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দান করা উচিত। **হৃষ্টপুষ্ট**—বাঘ মারিতে গিয়া তিনি একটি হৃষ্টপুষ্ট শশক শিকার করিয়া ফিরিলেন।

নির্ভীক—খেসদেশীয় দস্যু নির্ভীকভাবেই আলেকজাণ্ডারকে উত্তর দিল। **হস্তগত**—আপনার পত্র ঠিক সময়েই হস্তগত হইয়াছে। **সতৃষ্ণ**—সৈনিকটি সতৃষ্ণনয়নে জলপাত্রের পানে চাহিয়া রহিল। **দেশহিতৈষী**—সুভাষচন্দ্র দেশহিতৈষিগণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। **প্রজাবৎসল**—প্রজাবৎসল রামচন্দ্রের একদণ্ড বিশ্রাম ছিল না। **আদ্যন্ত** (আগাগোড়া)—বিচারক মনোযোগ-সহকারে আদ্যন্ত সব শুনিলেন।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত সমাসবদ্ধ পদগুলির সাহায্যে বাক্য রচনা কর :—
দম্পতি, সুগন্ধি, শশব্যস্ত, জীবদ্দশা, আমরণ, সায়াহ্ন, শতাব্দী, মুক্তহস্ত, ধনকুবের, উচ্ছৃঙ্খল, চিরস্থায়ী, প্রত্যক্ষ, নিরুৎসাহ, গ্রীষ্মাবকাশ, মেঘাচ্ছন্ন, অম্লানবদনে, প্রাপ্তবয়স্ক, পূর্ণগর্ভা, সর্ব্বস্বান্ত, দেশান্তরে, গৃহপালিত, পূর্ব্বোক্ত, শাসনাধীন, কৃতার্থ, রক্তাক্ত, পদচ্যুত, দিগ্বিজয়, পুরুষসিংহ, শ্রদ্ধাভাজন, যাতায়াত, রত্নগর্ভা, অতিথিসৎকার, দানবীর, প্রাণপণ, চক্ষুঃশূল, ক্রমক্রমে, যোগাযোগ, জন্মান্ধ, আজন্ম, দিগ্‌দিগন্ত, ভিক্ষার্থী।

কাছছাড়া, মা-মরা, আধপোড়া, ডাঙ্গাডোবা, কাঠ-ফাটা, টানা-পড়েন বস্তাপচা, বেসুরা, বেতালা, মিশকালো, গাছপাকা, বিলাতফেরৎ, দিশেহারা, মনগড়া, ঠাকুরঘর, চা বাগান, জোয়ারভাটা, হতভাগা, চৌমাথা, বেহিসাবী, সাদাসিধা, ভুঁইফোড়, ফুটিফাটা, কুপোকাৎ, গালগল্প, চাঁছাছোলা, দাকাটা, ঘাতাভাঙা, হাড়ভাঙা, রাজ-রাজড়া, লক্ষ্মীছাড়া, গাঁটকাটা, নজরবন্দী, দিলদরিয়া, রাজবন্দী, ছন্নছাড়া।

২। নিম্নলিখিত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ দিয়া বাক্য গঠন কর ঃ—

কড়ায় গণ্ডায়, ঘুণাক্ষরে, বিলবিসর্গ, ষোলআনা, হাত-ধরাধরি, যেমন-তেমন, বগলদাবা, অরণ্যে রোদন, বিড়াল-তপস্বী, হাতে-খড়ি, কণ্ঠাগত-প্রাণ, আকাশ-কুসুম, আকাশ-পাতাল, বক-ধার্ম্মিক, হাতের-লক্ষ্মী, হাতে হাতে, হট্টগোল, হস্তি-মূর্খ, সোনায় সোহাগা, তীর্থের কাক, ঝড়ো কাক, মেছোহাট, চোখের মণি, সাক্ষিগোপাল, শাপে বর, রাবণের চিতা, মণিহারা ফণী, ফাঁকা আওয়াজ, পুঁটিমাছের প্রাণ, জড়ভরত জবুথবু, অন্ধের যষ্টি, কথা-কাটাকাটি, চাঁদের হাট, হাতে কলমে, ষাঁড়ের গোবর, চিনির বলদ, চক্ষুলজ্জা, চোরাবালি।

নিম্নলিখিত সচরাচর-ব্যবহৃত ক্রিয়া-প্রধান বাক্যাংশগুলির সাহায্যে বাক্য রচনা কর ঃ—

প্রমাদ গণা, প্রবোধ মানা, কালহরণ করা, কষ্ট স্বীকার করা, অস্তমিত হওয়া, কৃতার্থ হওয়া, ধন্যবাদ দেওয়া, অতিক্রম করা, আবির্ভাব হওয়া, প্রশ্রয় দেওয়া, আসক্ত থাকা, হস্তগত হওয়া, দলবদ্ধ হওয়া, চিরস্মরণীয় হইয়া থাকা, নির্ভর করা, ফল ফলা, ধিক্কার দেওয়া।

হস্তক্ষেপ করা, ভ্রূক্ষেপ না করা, রেহাই পাওয়া, শক্তিতে কুলানো, দাঁড় করানো, সিদ্ধিলাভ করা, উৎসন্ন যাওয়া, বশবর্ত্তী হওয়া।

হাহাকার করা, সূত্রপাত হওয়া, প্রবর্ত্তন করা, ধূ ধূ করা, খাঁ খাঁ করা, থর থর করিয়া কাঁপা, ইয়ত্তা না থাকা, পদার্পণ করা, আত্মসাৎ করা, ভস্মসাৎ করা, ছল ছল করা, মেঘ মেঘ করা, পাততাড়ি গুটানো, কানভারী করা, হাত করা, বাগে পাওয়া, হুল ফুটানো, তিলকে তাল করা, হাল ধরা, হাল ছাড়া, টানা টানা, চাল চুলো, পাশ ফেরা, রাশ টানা, হাড় জুড়ানো, কেঁচে গণ্ডুষ করা, লণ্ডভণ্ড করা, এদিক-ওদিক করা, হেস্তনেস্ত করা, কাজ হাসিল করা, আর্জ্জি পেশ করা, কাজ গুছানো, পাশ কাটানো, বানচাল হওয়া, কানাকানি করা, হাতাহাতি করা, পিঠটান দেওয়া।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশ

(Substance-writing)

সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনীয়তা—মনের কথা বেশ গুছাইয়া বলিতে হইলে যাহাতে সকলের শুনিতে ভাল লাগে এবং নিজের মনেও আনন্দ হয়, এমন করিয়া বলিতে হইলে—ভাষার নানা ছাঁদ, ভঙ্গী ও রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

আবার সেই মনের ভাব লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে আরও সতর্ক হইতে হয়। বেশ গুছাইয়া সরস ও বিশুদ্ধ করিয়া লিখিতে না পারিলে নিজেরই ভাল লাগে না—অপরের ভাল লাগিবে কেন? অন্যের পাঠের জন্যই লেখা। সেই লেখা যদি অন্যের ভাল না লাগে তাহা হইলে লেখাটাই অনেকটা বিফল হইয়া যায়,—তাহাতে কাজও হয় না। সেজন্য বাক্য-রচনার নানাপ্রকার রীতি-ভঙ্গী ও ছাঁদ আয়ত্ত করা শিখিতে হয়। এই সকল পুস্তক ঐ প্রকার শিক্ষা দেওয়ার জন্যই রচিত। ঐ শিক্ষা পরখ করিবার জন্যই পরীক্ষা (Examination) গৃহীত হয়।

বিস্তৃতভাবে বলিতে হইলে সরস করিয়া বলিতে হয়, নতুবা যাহারা শোনে বা পড়ে তাহাদের ধৈর্য্য থাকে না, অধিকক্ষণ কেহ মনোযোগ দিতে পারে না। বিস্তৃতভাবে ভাবপ্রকাশ করিতে হইলে অনেক কথা এলোমেলো হইয়া পড়িতে পারে—এক কথা দুইবার বলা হইয়াও যাইতে পারে।

সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশ আরও কঠিন। অল্প পরিসরের মধ্যে

অনেকটুকু ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, ভাষার যথেষ্ট জ্ঞানের দরকার। যে সকল শব্দে অনেকখানি ভাব প্রকাশ পাইতে পারে, এমন অনেক শব্দ বাছিতে হইবে ; গল্পের মধ্যে ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, অথচ বক্তব্যের কিছুই বাদ পড়িবে না—কেবল বাদ দিতে হইবে অনাবশ্যক ভাষাবিস্তারকে। কোনটুকু আবশ্যক, কোনটুকু অনাবশ্যক তাহাও চিনিয়া ফেলিতে হইবে।

তুমি যদি একটি গল্প শুনিতে চাও, তবে তাহা সংক্ষেপে শুনিতে চাও না—বেশ বিনাইয়া বিনাইয়া রসাইয়া রসাইয়া ফলাও করিয়া বলিলে তোমার ভাল লাগে। নিজেও গল্প করিতে গেলে ঐ ভাবেই চেষ্টা কর, এই গল্পই বেশ সরস করিয়া বলিতে না পারিলে বিস্তৃত করিয়া বলা বিড়ম্বনা ; তাহাতে লোকে বিরক্তই হয়। অথচ গল্পটির ভাব হয়ত অপরকে জানাইবার প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গল্পকেও অনেক সময় সংক্ষিপ্ত করিতে হয়।

গল্প ছাড়া অন্য যাহা কিছু সবই লোকে সংক্ষেপে শুনিতে চায়। বিস্তৃত করিয়া কোন জিনিসের বা ব্যাপারের বর্ণনা শুনিবার অবসর, ধৈর্য্য ও প্রবৃত্তি সকল লোকের থাকে না। তাই লোকে প্রায়ই বলে—"আহা, যা বল্‌বে সংক্ষেপে বল।"

আবার যে সকল বিষয়ের সঙ্গে কাজ কর্ম্মের সম্বন্ধ, সে সকল বিষয়ের কথা বিস্তৃতভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিলে চলে না। তাহাতে কাজকর্ম্মের ক্ষতি হয়—কাজ আদায় করা কঠিন হয়। কথায় বলে কাজের কথা। কাজের কথার অর্থই সংক্ষেপে এমন কয়েকটি কথা, যাহাতে কেবলমাত্র কাজ চলার সহায়তা করে।

সে-জন্য চিঠিপত্র, আবেদন, রিপোর্ট, বিজ্ঞাপন, দেশবিদেশের সংবাদ ইত্যাদি অনেক জিনিসকে সংক্ষেপেই বিবৃত করা উচিত। অনেক কথাই

যাহাকে বলিতে হয়, অনেক বিষয়ে যাহাকে লিখিতে হয়, তাহাকেই সংক্ষেপে ভাব প্রকাশ ... ভ্যাস করিতে হয়।

সংক্ষেপে ভাব প্রক... করিতে হইলে কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। **শিক্ষকমহাশয়গণ** ছাত্রগণকে এগুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলে তাহারা যথেষ্ট উপকৃত হইবে।

১। যে পাঠ বা রচনাটির ভাব সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইবে, সেটিকে বারবার পড়িতে হইবে। বারবার পড়িতে গেলেই মূল কথাটি ধরা পড়িয়া যাইবে।

২। সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশের সময় পাঠ বা রচনাটিকে না দেখিয়া,—বারবার পড়ার ফলে যেটুকু মনে থাকিয়া যাইবে, তাহাই নিজের ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে। চোখের সম্মুখে পাঠ বা রচনাটি খোলা থাকিলেই তাহারই কথাগুলি আসিয়া পড়িবে; কোন্‌টিকে ছাড়িব, কোন্‌টিকে লইব, এইরূপ একটা সমস্যা উপস্থিত হইবে,—তাহাতে সময় বেশি লাগিবে, উত্তরও দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। যতটুকু মনে থাকিয়া যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ততটুকুকেই মূল কথা বা সারাংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৩। যেখানে মূল পাঠাংশ শুধু একটিমাত্র ভাবকে ফেনাইয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, সেখানে সমস্তটা মোটামুটি বুঝিয়া ভাবটিকে অল্প কথায় প্রকাশ করিলেই চলে। কিন্তু যাহাতে একাধিক ভাবের কথা আছে অথবা যাহা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত, তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিতে হইলে, প্রত্যেক অংশের জন্য

পৃথক পৃথক উত্তর লিখিবে ঃ গল্পের আকারে যাহা লিখিত,—তাহার অবান্তর বা বাজে কথাগুলি বাদ দিয়া যতটুকুতে গল্পের কাঠামো, আর উদ্দেশ্যটুকু বোঝা যায়, ততটুকু রাখিতে হইবে।

৪। সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশ করিতে হইলে অনাবশ্যক বিশেষণ ও ক্রিয়াবিশেষণগুলিকেও বাদ দিতে হইবে। বড় বড় সমাসের বদলে ছোট ছোট শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। অনাবশ্যক শব্দের ঘটা থাকিলে ছাড়িয়া দিতে হইবে। অলঙ্কৃত করিয়া বা রসান দিয়া অথবা ঘুরপেঁচে যাহা লিখিত আছে,—তাহাকে সরল ভাষায় লিখিতে হইবে, একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করিতে হইবে এবং কোন' কোন' বাক্যকে একটিমাত্র, বিশেষণ বা ক্রিয়াবিশেষণের দ্বারাই প্রকাশ করিতে হইবে।

৫। সকল রচনার ভাববস্তুকেই দুইচার কথায় সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায় না। সংক্ষিপ্ত করিতে হইবে বলিয়াই প্রধান প্রধান অংশ বাদ দিতে হইবে, ইহা ঠিক নয়। প্রধান প্রধান অংশের কোনটি যাহাতে বাদ না যায়—মূলভাবের যাহাতে অঙ্গহানি বা ক্ষতি না হয়, সেইদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে; তাহাতে যদি উত্তর কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়ে—পড়িবে, উপায় কি ?

নিম্নশ্রেণীতে ছাত্রগণের পক্ষে, আগে নিয়মগুলি আয়ত্ত করিয়া পরে সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশ শিক্ষা সহজ নয়। সেজন্য কতকগুলি নমুনা বা

নিদর্শন দেওয়া হইল ; আশা করা যায়, শিক্ষকগণের সহায়তায় সেগুলি হইতেই তাহারা কৌশলটি সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে।

(১)

কোনও সময়ে হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল,—দেখ ভাই সকল, আমরা নিয়ত পরিশ্রম করি ; কিন্তু উদর কখনও পরিশ্রম করে না। সে সর্ব্বক্ষণ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, অথচ আমরা প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিতেছি। সে নিয়ত আলস্যে কালহরণ করিবে, আমরা কেন তাহার পরিচর্য্যা করিব ? অতএব, আইস সকলে প্রতিজ্ঞা করি, আজ অবধি আমরা আর উদরের আনুকূল্য করিব না।

এই চক্রান্ত করিয়া, তাহারা পরিশ্রম ছাড়িয়া দিল। পা তাহায় আহারস্থানে যায় না ; হাত আর মুখে আহার তুলিয়া দেয় না ; মুখ আর আহার গ্রহণ করে না, দন্ত আর ভক্ষ্য বস্তুর চর্ব্বণ করে না। উদরকে জব্দ করিবার চেষ্টায়, দুইচারি দিন এইরূপ করিলে শরীর শুষ্ক হইয়া আসিল ; অবয়ব সকল এত নিস্তেজ হইয়া পড়িল যে, প্রায় নড়িবার শক্তি রহিল না ; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, যদিও উদর পরিশ্রম করে না বটে, কিন্তু উদরই প্রধান অবয়ব ; উদরের পরিচর্য্যার জন্য পরিশ্রম না করিলে সকলকেই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইতে হইবে। আমরা পরিশ্রম করিয়া কেবল উদরের সাহায্য করি, এমন নহে। উদরের পক্ষে যেমন অন্য অন্য অবয়বের সাহায্য আবশ্যক, অন্য অন্য অবয়বের পক্ষেও সেইরূপ উদরের সাহায্য আবশ্যক। যদি সুস্থ থাকা আবশ্যক হয়, সকল অবয়বকেই স্ব স্ব নিরূপিত কর্ম্ম করিতে হইবে, নতুবা কাহারও কল্যাণ নাই।

সংক্ষিপ্ত-সার

হস্ত, পদ ইত্যাদি অবয়বগুলি একবার পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল—তাহারা আর উদরের জন্য খাটিবে না ; কারণ উদরটা বসিয়া বসিয়া খায়, আর তাহারা অনর্থক উহার জন্য খাটিয়া মরে। উদরকে জব্দ করিবার জন্য তাহারা আপন নিত্য কর্ম্ম বন্ধ করিয়া দিল। ফলে, সকলেই দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, উদর বসিয়া বসিয়াই খায় না, উদরও নিঃশব্দে কাজ করে, পরস্পরের সাহায্যেই তাহারা বাঁচিয়া আছে। সুস্থ ও জীবিত থাকিতে হইলে সকলকেই স্ব স্ব কর্ম্ম করিতে হইবে।

ইহা হইতে কি **নীতি শিক্ষা** হইল বা ইহার গূঢ় অর্থ কি ? তাহার উত্তর দিতে হইলে বলিতে হইবে—

গূঢ়মর্ম্ম

কতকগুলি লোক চঞ্চল হইয়া কাজ করে ; কতকগুলি লোক স্থির হইয়া কাজ করে। ভাবিয়া না দেখিলে মনে হইবে, চঞ্চল কর্ম্মীরাই কাজ করে, আর নীরবকর্ম্মীরা বুঝি বসিয়া ভোগ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়শ্রেণীর কর্ম্মীর সহযোগেই, জীবদেহের মত সমাজ, সংসার, রাজ্য ইত্যাদি—সমস্তই শৃঙ্খলার সহিত চলিতে থাকে। নীরব কর্ম্মীদের জব্দ করিতে গেলে সবই অচল হইয়া যাইবে।

(২)

চল নামি,—আষাঢ় আসিয়াছে,—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু, একা একজনে যূথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না, মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ও ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবীও ভাসাই।

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহাদের ঐক্য নাই, তাহারাই তুচ্ছ। দেখ, ভাইসকল, কেহ একা নামিও না—অর্দ্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে এই বিশোষিত (বিশুষ্ক) পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া তাহার গলা ধরিয়া, বুকে পা দিয়া পৃথিবীতে নামিব; নির্ঝর পথে স্ফটিক হইয়া বাহির হইব। নদীকূলের শূন্য হৃদয় ভাসাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া মহাকল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া তরঙ্গের উপর তরঙ্গ হানিয়া মহানন্দে ক্রীড়া করিব।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু? ইস্! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশদেশান্তরে বেড়াইব! আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়ামাত্র; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে, বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত-মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। বায়ু ত আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল; নহিলে আমরা কেহ নই। চল,—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি-বিন্দু কিন্তু পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব, বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণ-লতা-বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টি, আমাদের সমান কে? আমরাই সংসার রাখি।

দেখ, দেখ, আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ। গাছপালা মাথা নাড়িতেছে,—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতেছে, চাষা চষিতেছে, ছেলে ভিজিতেছে। কেবল বেনে-বউ—আমসী ও আমসত্ত্ব লইয়া পলাইতেছে। মর্ পাপিষ্ঠা! তুই একখানা রেখে যা না, আমরা খাব। দে, উহার কাপড় ভিজিয়ে দে।

আমরা জাতিতে জল, কিন্তু রঙ্গ জানি। লোকের চাল ফুটা করিয়া ঘরে উঁকি মারি। মল্লিকার মধু লইয়া গিয়া ভ্রমরের অন্ন মারি! মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকাইয়া দিলে; তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি।

তা যা'ক,—আমাদের বল দেখ—দেখ পর্ব্বত-কন্দর, দেশ-প্রদেশ ধুইয়া লইয়া নূতন দেশ নির্ম্মাণ করিব। কোন' দেশের মানুষ রাখিব—কোন' দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বাহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র। আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমদের মত বলবানই বা কে?

(বঙ্কিমচন্দ্র)

সংক্ষিপ্ত সার

বঙ্কিমচন্দ্র এই সরল রচনাটিতে বলিতে চাহিয়াছেন, বৃষ্টিবিন্দুগুলি ক্ষুদ্র হইলেও কেবল ঐক্যের বলে কিরূপ অসাধ্য-সাধন করিয়া থাকে।

মেঘ বৃষ্টিবিন্দুর সমষ্টি। এই মেঘকে বাতাস দেশে দেশে চালাইয়া লইয়া যায়। এক সঙ্গে কোটি কোটি জলবিন্দু ঝরিয়া পড়িলে জগতের ইষ্ট অনিষ্ট দুই-ই সাধন করে। পাহাড়ে ঝরণা ঝরে, নূতন নদীর সৃষ্টি হয়, মরা নদীতে ঢল নামে, তাহার শ্রী ফিরে, তপ্ত শুষ্ক পৃথিবী শীতল হয়, শস্য

বাঁচে, জীবজন্তু-মানুষ সকলেই স্বস্তি পায়—লোকে পানীয় জল পায়, চাষীরা আনন্দ পায়, উপকৃত হয়। নদীতে নৌকা জাহাজ ছুটে, তাহাতে বাণিজ্য চলে, নদীর ভাঙনে গড়নে নূতন নূতন দেশ গঠিত হয়।

আবার বৃষ্টিতে সংসারী লোকদের নানা অসুবিধা ঘটে। ঘরদুয়ার ভাঙিয়া যায়, নদীতে বন্যা আসে, তাহাতে অনেক গ্রামনগর ভাসিয়া যায়, নৌকা-জাহাজ ডুবিয়া যায়, কত মানুষ মারা যায়। ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দুগণ কেবল একতার বলে এত কাণ্ড করিতে পারে।

(৪)

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল।
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান।
কাষ্ঠ দগ্ধ হ'য়ে করে পরে অন্নদান।
স্বর্ণ করে নিজরূপে অপরে শোভিত।
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে।
সাধুর ঐশ্বর্য্য শুধু পরহিত তরে। (রজনীকান্ত)

ভাবার্থ

নদী, তরু, গাভী, স্বর্ণ, কাষ্ঠ, বংশী ও শস্য যাহা কিছু ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টি করে, সে সকলের কিছুই তাহারা নিজেরা ভোগ করে না, পরের তৃপ্তি ও মঙ্গলের জন্যই দান করে। সাধুলোক তেমনি নিজে ভোগ না করিয়া আপনার ধনসম্পদ্ পরের হিতের জন্যই ব্যয় করেন।

(৫)

দিবস হইল শেষ। রবি গেল পাটে,
কঠোর কর্ম্মের পথে যাত্রা শেষ তার।
মাঠে শেষ কৃষিকার্য্য বেচাকেনা হাটে,
তটে শেষ পাটনীর শেষ খেয়া পার।
ঘাটে শেষ ঘাটভরা কাঁকণের তান,
গোঠে শেষ গোধনের দিনান্ত ভোজন
বট-বিল্ব বিটপীতে বিহগের গানে।
বাটে শেষ মানবের ব্যস্ত বিচরণ
ফোটা শেষ কুসুমের বনে উপবনে,
মঠে শেষ আরতির মঙ্গল নিনাদ ;
ঝাঁটে পাটে গৃহকাজ কুটীর-প্রাঙ্গণে,
হাঁটা শেষ পথিকের ক্লান্তি অবসাদ।
এই সর্ব্বশেষ মাঝে উদাস সন্ধ্যায়,
জীবনের শেষ সে-ও উঁকি দিয়ে যায়। (পর্ণপুট)

দিন শেষ হইল, সন্ধ্যা আসিল। দিনশেষের সঙ্গে সঙ্গে মাঠে, ঘাটে, গোঠে,—পল্লীর সর্ব্বত্রই দিনের কাজ সমাপ্ত হইল। পথে পথিকের হাঁটাহাঁটি, মঠে আরতি, খেয়াঘাটে খেয়া-পারাপার ও কুটীরের আঙ্গিনায় সংসারের কাজ সারা হইল। চারিদিকে কেবলই 'শেষ আর শেষ' দেখিয়া এই সময়ে জীবনের শেষের অর্থাৎ মরণের কথাও মনে পড়ে।

[পল্লীর কোথায় কোথায় কি কি শেষ হইল, পৃথক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই—একসঙ্গে সেগুলির নাম করিলেই চলিবে। শেষ দুই পংক্তির অর্থটুকু দিতে হইল।]

(৬)

কলের ঘড়িটি বলে—টিক্ টিক্ টিক্,
যারা শুধু করে খেলা, হেলায় কাটায় বেলা,
তাদের জীবন বৃথা—শতবার ধিক্।
কলের ঘড়িটি বলে—টিক্ টিক্ টিক্—
যদি হ'তে চাও বড় কাজ কর—কাজ কর,
চুপ ক'রে বসে থাকা কভু নহে ঠিক্।
কলের ঘড়িটি বলে—টিক্ টিক্ টিক্—
সময় বহিয়া যায়, কারো পানে নাহি চায়
আঁখিতে নাহিক ঘুম, জাগে অনিমিখ।

ভাবার্থ

কলের ঘড়িটির অনবরত টিক্ টিক্ শব্দ শুনিয়া আমাদের শিক্ষা করা উচিত—সময় কাহারো মুখপানে না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। একবার গেলে তাহা আর ফিরে না। আলস্যে বা খেলাধূলায় সময় না কাটাইয়া ঐ ঘড়িটির মতই আমাদের কাজ করা উচিত।

(৭)

মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার
উপকার বিনা সে না জানে অপকার॥
দেখ ও কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ॥
কাক কারও করে নাই সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কভু ধন বিতরণ॥

কাকের কঠোর স্বর বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই॥
সারী আর শুকপাখী অনেকেই রাখে।
যত্ন করি' কে কোথায় কাক পুষে থাকে?

(ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত)

ভাবার্থ

মহানুভব ব্যক্তি উপকার ছাড়া অপকার কাহাকে বলে তাহা জানেন না। চন্দনবৃক্ষ ছেদনকারীকেও অঙ্গের সুগন্ধ দান করে।

কাক কাহারও টাকাকড়ি চুরি করে নাই, কোকিলও কাহাকেও কিছু দান করে নাই। তবু কোকিলকে লোকে আদর করে কেন? আর কাক না পুষিয়া লোকে শুক-সারীই বা পোষে কেন? তাহার কারণ, কাকের গুণ নাই, তাহার কণ্ঠস্বর কর্কশ; কোকিল ও শুকসারীর কণ্ঠস্বর মধুর। এ জগতে গুণের আদরই সর্ব্বত্র।

[কতকগুলি গদ্যনিবন্ধের অংশ ও কবিতার অংশ অনুশীলনের জন্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারিত; কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের কলেবর অযথা বৃদ্ধি পাইবে। এই ভাবিয়া প্রথম খণ্ডে কয়েকটি নিদর্শনী দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে কয়েকটি পদ্য ও গদ্য নিবন্ধ উদ্ধৃত হইল। সংক্ষিপ্তসার-রচনার জন্য সেইগুলি নির্ব্বাচন করিলেই চলিবে।]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ণাশুদ্ধি

বানান-ভুল একটি সাংঘাতিক দোষ। বানান-ভুলে রচনার সৌষ্ঠব নষ্ট হইয়া যায়, লেখকের অযত্ন ও অমনোযোগ সূচিত হয়, অনেক সময় ঠিক বানান না করিলে ভিন্ন একটি শব্দের রূপও ধরে—তাহাতে অর্থবোধেরও অসুবিধা ঘটে। যেমন—**নদীকুল——নদীসমূহ, নদী-কূল—নদীর তীর**। উ-ঊকারের তফাতে অর্থের যথেষ্ট তফাৎ হইয়া যায়। বানান-ভুল যাহাতে না হয়, সেজন্য ছাত্রগণকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

(১) পড়িবার সময় শব্দগুলির প্রত্যেক অক্ষরটির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সকল শব্দ একটু বড় ও যেগুলিতে যুক্তাক্ষর আছে, সে-গুলির প্রত্যেক অক্ষরের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। **স—ষ—শ, ণ—ন, র—ড়—ঢ়, য—জ, ইকার—ঈকার,—উ—ঊকার,** এইগুলির মধ্যে বড় বেশি গোল হইবার সম্ভাবনা। সেজন্য যে সকল শব্দে এই অক্ষরগুলির প্রয়োগ আছে, সেই সকল শব্দের প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(২) লিখিবার সময় যে বানানটি প্রায়ই ভুল হয়, সেই বানানটি অনেকবার করিয়া লিখিতে হইবে।

(৩) কোন বানান সম্বন্ধে সন্দেহ হইলেই, আলস্য ত্যাগ করিয়া অভিধান দেখিতে হইবে, অথবা শিক্ষক কিংবা অন্য কোন' অভিজ্ঞ লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হইবে।

(৪) নিয়মমত প্রত্যহ শ্রুতিলিখন লিখিতে হইবে।

(৫) প্রতিদিনকার পাঠ্যাংশটুকুকে বই দেখিয়া খাতায় অন্ততঃ একবার নকল করিয়া ফেলিতে হইবে।

যে সকল বানানের প্রায়ই ভুল হয়, তাহাদের মোটামুটি একটা তালিকা দেওয়া হইল—

ই-কারের স্থলে ঈ-কার

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
জ্যাতী	জাতি	সচীব	সচিব	বাসুকী	বাসুকি
সারথী	সারথি	প্রাণীগণ	প্রাণিগণ	আশীষ	আশিষ
অঞ্জলী	অঞ্জলি	কালীদাস	কালিদাস	কৃতীত্ব	কৃতিত্ব
বিকীরণ	বিকিরণ	কুটীল	কুটিল	বধীর	বধির

ঈকারের স্থলে ইকার

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
চিৎকার	চীৎকার	অধিন	অধীন	রবিন্দ্র	রবীন্দ্র
নিচ	নীচ	ভাগিরথী	ভাগীরথী	পরিক্ষা	পরীক্ষা
নিরোগ	নীরোগ	মনিষী	মনীষী	প্রতিক্ষা	প্রতীক্ষা
অতিত	অতীত	ভিষণ	ভীষণ	আশির্ব্বাদ	আশীর্ব্বাদ

যেখানে **ইকার** ও **ঈকার** দুইই আছে, সেখানে কোন্‌টি—**ই** কোন্‌টি **ঈ**, এই লইয়া গোল বাধে—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
রিতীনিতী	রীতিনীতি	শারিরীক	শারীরিক
বাল্মিকী	বাল্মীকি	পীপিলিকা	পিপীলিকা
দধিচী	দধীচি	প্রতিতী	প্রতীতি
নীরিহ	নিরীহ	দ্বীতিয়	দ্বিতীয়

ন ও **ণ**এর প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যাকরণে নিয়ম দেওয়া আছে,—সেই নিয়ম অনুসারেই চলিতে হইবে—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ফাল্গুণ	ফাল্গুন	মুণি	মুনি	পূর্ব্বাহ্ন	পূর্ব্বাহ্ণ
গগণ	গগন	কঙ্কন	কঙ্কণ	দুর্ণাম	দুর্নাম
পীড়ণ	পীড়ন	ফেণ	ফেন	মৃণ্ময়	মৃন্ময়
দর্পন	দর্পণ	ক্ষুন্ন	ক্ষুণ্ণ	মূর্দ্ধণ্য	মূর্দ্ধন্য
দর্শণ	দর্শন	সায়াহ্ণ	সায়াহ্ন	ম্রিয়মান	ম্রিয়মাণ
নিমন্ত্রন	নিমন্ত্রণ	মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন	মৃনাল	মৃণাল

স, ষ, শ,—এই তিনে গোলই বড় বেশি হয়। সে জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে ভুল বানান প্রায়ই দেখা যায়—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
শষ্য	শস্য	পুরষ্কার	পুরস্কার	সুশ্রূসা	শুশ্রূষা
ধ্বংশ	ধ্বংস	আষ্পদ	আস্পদ	আশীষ	আশিস্
প্রসংশা	প্রশংসা	গোষ্পদ	গোষ্পদ	বিষদৃশ	বিসদৃশ
পরিস্কার	পরিষ্কার	বৈসম্য	বৈষম্য	পরিষ্থিতি	পরিস্থিতি

'ব্য'কে আমরা যে ভাবে উচ্চারণ করি, তাহাতে ছাত্রছাত্রীগণের বানানে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া যায়। তাহারা 'ব্যা'র মত শোনে, সেজন্য 'ব্য' এ অনাবশ্যক আ-কার যোগ করে।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ব্যাবহার	ব্যবহার	ব্যাবধান	ব্যবধান
ব্যাথা	ব্যথা	ব্যাতীত	ব্যতীত
ব্যায়	ব্যয়	ব্যাবসায়	ব্যবসায়

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে :—ব্যাকরণ, ব্যায়াম, ব্যারাম, ব্যাস, ব্যাধি, ব্যাঘ্র ইত্যাদি শব্দে আকারের প্রয়োজন আছে।

ঊ কারের স্থলে—উ কার

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পূণ্য	পুণ্য	ভূক্ত	ভুক্ত	মূখ্য	মুখ্য
বিদূষী	বিদুষী	প্রভূ	প্রভু	ভূবন	ভুবন
দূর্গা	দুর্গা	অদ্ভূত	অদ্ভুত	শম্ভূ	শম্ভু

উ কারের স্থলে—ঊকার

দুর	দূর	ময়ুর	ময়ূর	শুকর	শূকর
ভুত	ভূত	বধু	বধূ	নুপুর	নূপুর
কৌতুহল	কৌতূহল	দ্রুত	দূত	জাগরুক	জাগরূক
অনুকুল	অনুকূল	শুদ্র	শূদ্র	মুর্খ	মূর্খ

বানানে র, ড়, ঢ়,—এই তিনটির মধ্যে বড়ই গোলযোগ ঘটে। কারণ, অনেকে ড় ও ঢ়-এর উচ্চারণ করিতেই পারে না। আবার কোন' কোন' অঞ্চলে ড়-এর উচ্চারণ 'র', আর 'র',-এর উচ্চারণ 'ড়' এইরূপ শোনা যায় বাল্যকাল হইতেই শিশুদের ঐরূপ উচ্চারণ-দোষ

মজ্জাগত হইয়া যায়, পরে কিছুতেই পুস্তকে ঠিক বানান দেখিয়াও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে না। বর্ণশিক্ষার সময় 'ব'-এ শূন্য 'র', ড-এ শূন্য 'র' আর 'ঢ'-এ শূন্য 'র' এইরূপ না শিখাইয়া র, ড়, ঢ়-এর প্রকৃত উচ্চারণের সহিতই ঐ অক্ষরগুলির সঙ্গে পরিচয় করানো উচিত। এই গোলযোগের জন্য কতকগুলি ভুল বানানের সৃষ্টি হয়। যেমন—

	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ঘড়	ঘর	জড়া	জরা	চরচাপর	চড়চাপড়
পরসী	পড়সী	গাড়	গাঢ়	করাই	কড়াই
গর	গড়	আষাড়	আষাঢ়	মাকরসা	মাকড়সা
কাপর	কাপড়	গরুর	গরুড়	ধড়পাকর	ধরপাকড়
আছার	আছাড়	গারোয়ান	গাড়োয়ান	শতকড়া	শতকরা

'ব-ফলাকে' বাদ দেওয়ার জন্য অনেকগুলি শব্দে বানান-ভুল হয়। সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত শব্দগুলি উল্লেখযোগ্য—স্বতন্ত্র, স্বাস্থ্য, স্বচ্ছ, সান্ত্বনা, পার্শ্ব, ঊর্দ্ধ, উচ্ছ্বাস, দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয়। আবার অনাবশ্যক ব-ফলা যোগ করিয়াও বানানভুলের সৃষ্টি হয়, যেমন—উজ্জ্বল, স্বার্থক, স্বত্তা, সত্ত্বা, আয়ত্ব, ইয়ত্ত্বা, বিদ্যাবত্ত্বা, স্বরস্বতী, স্বহায় ইত্যাদি।

'ট' ও 'ঠ'-এর মধ্যের গোলযোগ দৃষ্ট হয়—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
হটাৎ	হঠাৎ	কোষ্টী	কোষ্ঠী	কোঠর	কোটর
যথেষ্ঠ	যথেষ্ট	অন্ত্যেষ্ঠি	অন্ত্যেষ্টি	জ্যেষ্ট	জ্যেষ্ঠ
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ	ষষ্টী	ষষ্ঠী	লুন্টন	লুণ্ঠন
শটতা	শঠতা	যষ্ঠি	যষ্টি	শ্রেষ্ট	শ্রেষ্ঠ

অন্যান্য কতকগুলি উদাহরণ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পটল (খাদ্য)	পটোল	কামাক্ষ্যা	কামাখ্যা	চিক্কন	চিক্কণ
শশ্মান	শ্মশান	জগত	জগৎ		
আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা	পরাস্থ	পরাস্ত	গননা	গণনা
সাহার্য্য	সাহায্য	রুড়	রূঢ়	বিদ্ধান	বিদ্বান্
অধ্যায়ণ	অধ্যয়ন	মিমাংসা	মীমাংসা	নাট্টশালা	নাট্যশালা
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	সংগ্যা	সংজ্ঞা	দোষণীয়	দূষণীয়
অত্যান্ত	অত্যন্ত	নিক্কন	নিক্কণ	প্রযুজ্য	প্রযোজ্য

সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালায় উচ্চারণের দোষে এই বানান ভুলগুলি হয়। কোন কোন শব্দের বাঙ্গালায় উচ্চারণের পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কিন্তু বানানে সংস্কৃতের নিয়ম ঠিকই রাখিতে হইবে। পক্ক (পক্ব), খট্টা (খট্বা), ব্রম্হা (ব্রহ্মা), ব্রাম্ভন (ব্রাহ্মণ), অথিতি (অতিথি), কথপোকথন (কথোপকথন), প্রোয়জন (প্রয়োজন), মধ্যান্ন (মধ্যাহ্ন), সাক্ষ্যাৎ (সাক্ষাৎ), সন্মান (সম্মান), সন্মুখ (সম্মুখ), সন্মিলনী (সম্মিলনী), আল্হাদ (আহ্লাদ), পারাবৎ (পারাবত), কুৎসিৎ (কুৎসিত), উচিৎ (উচিত), মন্মোহন (মনোমোহন), ঋষিকেশ (হৃষীকেশ), লক্ষী (লক্ষ্মী), কুষ্টী (কোষ্ঠী), লুভী (লোভী), রুগী (রোগী), অজিৎ (অজিত), গর্ধব (গর্দ্দভ), অঘ্রাণ (অগ্রহায়ণ), পুষ্কর্ণী (পুষ্করিণী), ভগ্নী (ভগিনী), দুরাদৃষ্ট (দুরদৃষ্ট), মুখস্ত (মুখস্থ), বিপদ-গ্রস্থ (বিপদগ্রস্ত)।

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত শব্দ-যুগ্মকগুলির মধ্যে অর্থের প্রভেদ নির্ণয় কর :—

চড়া—চরা, সারা—সাড়া, পাড়া—পারা, কড়া—করা, বড়—বর, ধড়—ধর, গোড়—গোর, নারী—নাড়ী, হাড়—হার, বাড়ী—বারি, পড়া—পরা, পাড়—পার, জোড়—জোর, গড়—গর।

লক্ষ্মণ—লক্ষণ। স্বতন্ত্র—সতন্ত্র। স্বজাতি—সজাতি। সুভাষ—সুবাস। ষষ্ঠী—যষ্টি। সুত—সূত। জাতি—জাতী। ক্ষীরদ—ক্ষীরোদ। চির—চীর। টিকা—টীকা। তির—তীর। আহুত—আহ্বত। আভাস—আভাষ। জর—জড়।

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে শুদ্ধভাবে লিখ :—

ভগমান, অর্থ্যাত, তারাতারি, ক্ষুদা, মধুশোধন, বাষ্পায়মান, মনোপুত, কুটীল, শুণ্য, সহধর্ম্মিনী, কুজ্জটিকা, সুরধনী, বিপণ্ণ, বৃত্তি, আদ্র, কত্রীপদ, প্রতীক্ষা, শজ্জা, শর্য্যা, জাতিয়, মুমুর্ষ, অনুমাত্র, অনুবীক্ষন, দুরবীক্ষণ, অণুপমা, সন্ন্যাসী, কুলিন, কত্রিক, আজন্ম, মহত্ত্ব, নিরব, নথুবা।

৩। নিম্নলিখিত বাক্যগুলির বানান শুদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার লিখঃ—

(ক) ইদৃশ আখ্যেপ বাক্য শ্রবনে দিল্লিশ্বরের অন্তকরণে যথেষ্ট কৌতুহল উদ্ভূত হইল। (খ) গৃষ্মকালে আম্র ফল পক্ক হইলে উদ্বানের রমণিয় সোভা হয়। (গ) কাঁচ সচ্ছ কঠিন পদার্থ, হিরক ছারা কাঁচ কাটা যায় না (ঘ) আমি অত্যান্ত পিড়ীত হইয়া পরাতে তোমার সঙ্গে সাক্ষ্যাৎ করিতে পারি নাই। (ঙ) সে এখনও কাপর পড়িতে জানে না, সে লেখাপরা করিবে কী? (চ) লক্ষণ সিতা সমবিভ্যহারে বাল্মিকীর তপবনে উপনীত হইলেন। (ছ) তাহার কুটিরের চতুঃপার্শে শিরিস যুথিকা ও অতশী পুষ্প ফুটিয়াছে। (জ) উদ্বিঘ্ন হইও না—সত্তর সুসম্বাদ আসিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ছেদ-বিন্যাস

যথাযোগ্য ছেদবিন্যাস না করিলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয় না। ছেদ বড় বড় বাক্যকে নানা অংশে এমনভাবে ভাগ করিয়া দেয় যে, তাহাতে বাক্যটি আর বুঝিতে কষ্ট হয় না; সহজেই বক্তব্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে। শুধু বড় বড় বাক্য কেন ছোট ছোট বাক্যেও ছেদের প্রয়োজন হয়

যেমন—(১) মানুষ আমরা নহিত মেষ।

(২) সত্য কথা বলিও না বলিলে দণ্ড হইবে।

এই বাক্য-দুইটির যদি স্থলবিশেষে একটি করিয়া 'কমা' দেওয়া না থাকে তাহা হইলে পাঠক উল্টাই বুঝিতে পারে। যেমন—

(১) মানুষ আমরা নহিত (আমরা) মেষ।

(২) সত্যকথা বলিও না বলিলে দণ্ড হইবে।

এইরূপ অর্থ ও হইতে পারে। সে-জন্য ছেদবিন্যাস সম্বন্ধে সতর্কতা চাই। লিখিতে হইলে ছেদগুলির পরিচয় ও প্রয়োগের নিয়ম জানা চাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার কয়েক পংক্তি লইয়া এ বিষয়ে আলোচনা করি—

"বাঙ্গালার ইতিহাস নাই; যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়,—উপন্যাস, কতকগুলি অযোগ্য, অসার, স্বার্থপর পর-পীড়কদের জীবন চরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কিন্তু কে লিখিবে? কেন? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে—যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যা'ন, তবে মা'র গল্প করিতে কত আনন্দ; আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ—ইহার গল্প করিতে কি আমাদের আনন্দ নাই? আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি।"

উপরে উদ্ধৃত অণুচ্ছেদে প্রায় সকল প্রকারের ছেদই আছে।

১। অণুচ্ছেদটির গোড়ায় ও শেষে "—" দেওয়া আছে; তাহাতে বুঝাইতেছে—এই অংশ অন্যের কথা—এখানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

এই চিহ্নকে **উদ্ধরণ-চিহ্ন** বলে। এই চিহ্ন উদ্ধৃত অংশের গোড়ায় ও শেষে বসিয়া থাকে।

২। ঐ অণুচ্ছেদে অনেকগুলি (,) চিহ্ন আছে। ইহাকে **কমা** বলে। ইহার দ্বারা প্রত্যেক বাক্যের ভিন্ন-ভিন্ন অংশকে পৃথক করিয়া দেখান হইয়াছে; তাহাতে প্রত্যেক বাক্যটি সহজেই বুঝা যাইতেছে।

বাক্যের মধ্যে পর পর একপদের (বিশেষ্য, বিশেষণ) শব্দ একাধিক থাকিলে কমার দ্বারা পৃথক্ করিয়া দেখানো হয়। উপরের কয়েক পংক্তিতে—**অযোগ্য, অসার, স্বার্থপর,**—তিনটিই এক বিশেষ্যের বিশেষণ; কমা বসাইয়া পৃথক্ করিয়া দেখানো হইয়াছে।

এইরূপ বিশেষ্যপদের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, যেমন—**রাম, লক্ষ্মণ, ভরত** ও **শত্রুঘ্ন**—দশরথের চারি পুত্র। রাম ও লক্ষ্মণের পর কমা দেওয়া হইয়াছে। ভরতের পর 'ও' আছে, সেজন্য কমার প্রয়োজন হইল না। ক্রিয়াপদের উদাহরণ, যেমন—**সে নাচে, গায়, হাসে, কাঁদে**—কেবল কোন' কাজ করে না।

ছোট ছোট বাক্যের পর পূর্ণচ্ছেদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কমাযোগে সেগুলিকে একটি অখণ্ড বাক্যের মতই দেখানো হয়। যেমন --**তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে।**

বাক্যের মধ্য ছাড়াও কমা নানা স্থলেই প্রযুক্ত হয়। (১) সম্বোধন পদের পর, যেমন—**ভাই,** তোমাকে গোপনে একটি কথা বলি। (২) তারিখ লেখার বেলায়, যেমন—**১৮ই পৌষ, ১৩৩৫**। (৩) ঠিকানায়

যেমন—**সুরধাম, শ্যামবাজার, কলিকাতা**। (৪) উপাধিতে যেমন—**শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, সরস্বতী, এম-এ, এল-এম-এস।**

৩। উপরের পংক্তিগুলিতে (ক) 'বাংলার ইতিহাস নাই'—ও (খ) 'গল্প করিতে কত আনন্দ'—এই দুইটি বাক্যাংশের পরে যে-চিহ্নটি আছে, তাহাকে বলে **সেমি-কোলন** (;) **বা অর্দ্ধচ্ছেদ**। এই ছেদটি কমা ও পূর্ণচ্ছেদের মাঝামাঝি। এখানে 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই',—এই বাক্যটির পর পূর্ণচ্ছেদই পড়িতে পারিত, কিন্তু পরের বাক্যটি **'যাহা আছে—তাহা'**—দিয়া আরম্ভ হওয়ায়—বাক্যটিতে পূর্ব্ব বাক্যের ভাবের জের চলিতেছে। দ্বিতীয় বাক্যটি সম্বন্ধেও ঐকথা। পরবর্ত্তী বাক্য **"আর এই আমাদের"** দিয়া আরম্ভ হওয়ায় পূর্ব্বের বাক্যটিকে সম্পূর্ণ সমাপ্ত হইতে দিতেছে না; সে জন্য অর্দ্ধচ্ছেদ বা সেমি-কোলন বসিয়াছে।

নতুবা, যেহেতু, কারণ, অতএব ইত্যাদি অব্যয়ের দ্বারা যখন দুইটি বাক্য সংযুক্ত হয়, তখনও মাঝে এই ছেদ যোগ করা হয়।

যেমন—ভীষ্ম কিছুতেই টলিলেন না ; কারণ, সত্য রক্ষাই তাঁহার ধর্ম্ম।

দুইটি বাক্যে বিপরীত ভাব (antithesis) দেখাইলেও মাঝে এই ছেদ বসে, যেমন—ক্ষমা বীরের ভূষণ ; ক্রোধ কাপুরুষের সম্বল।

৪। প্রত্যেক বাক্যের পর বিরাম বুঝাইতে **পূর্ণচ্ছেদ** ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে কবিতার প্রত্যেক ছত্রের পরে বসিত। আজকাল কবিতাতেও বাক্য সম্পূর্ণরূপে শেষ না হইলে বসে না।

৫। 'আনন্দ নাই'? 'কে লিখিবে'? 'কেন'? এই তিন স্থলে যে ছেদটি বসিয়াছে—তাহা **জিজ্ঞাসা-চিহ্ন** অথবা প্রশ্নবোধক চিহ্ন। প্রশ্নাত্মক বাক্যে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে হইলেই এই ছেদ বসে।

৬। 'ইতিহাস নয়—' 'সকলেই লিখিবে—' ও 'বাঙ্গালা দেশ—' এই তিন অংশে যে চিহ্ন আছে তাহাকে "—" **ড্যাশ** বলে। "ইতিহাস

নয়—উপন্যাস"। এখানে শুধু 'উপন্যাস' কথাটিতেই একটি বাক্য,—বাক্যের বাকি অংশ লুপ্ত আছে। ড্যাশই উহার সূচনা করিতেছে।

'আমি লিখিব, তুমি লিখিবে, সকলেই লিখিবে—যে বাঙ্গালী তাহাকেই' ইত্যাদি। এখানে 'আমি, তুমি, সকলে' পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া জড়াইয়া বলা হইল—যে বাঙ্গালী তাহাকেই অর্থাৎ বাঙ্গালী মাত্রকেই। এইভাবে এক কথায় জড়াইয়া বলিতে হইলে ড্যাশটি ব্যবহৃত হয়।

'বাঙ্গালাদেশ' ও 'ইহার' মধ্যে **ভাবের জের** চলিতেছে—তাহাই বুঝাইবার জন্য এই তৃতীয় ড্যাশটি ব্যবহৃত।

তাহা ছাড়া, এক কথা বলিতে অন্য কথা আসিয়া পড়িলে তাহার **আগে পিছে** ড্যাশ দিতে হয়। যেমন—

তোমার সঙ্গে—সত্য কথা বলিতে কি—আমার কখনও বন্ধুত্ব হইবে না। পুরীর সমুদ্রের ধারে—সে অনেক দিনের কথা—তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। "তা' সবে—অবোধ আমি—অবহেলা পরধন-লোভে মত্ত।" (মাইকেল)।

উদাহরণ ও **তালিকা** দিতে হইলে অথবা দুই এক পংক্তি **ভূমিকা** করিয়া কোন' **বক্তব্য নিবেদন** বা **বিজ্ঞাপন** করিতে হইলে ড্যাশ দিতে হয়। যেমন—(ক) পদার্থ তিন প্রকার—তরল, কঠিন ও বাষ্পীয়। (খ) নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এবার পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে—কনক, অমিয়, অমিতাভ ও সোমনাথ। (গ) আমার নিবেদন এই,—(ঘ) এতদ্দ্বারা সকলকে জানানো হইতেছে যে,—

৭। পর-পীড়ক ও জীবন-চরিত এই শব্দ দুইটির মধ্যকার চিহ্নের নাম **হাইফেন** বা **যোজক-চিহ্ন**। এই চিহ্ন দুই বা ততোধিক শব্দকে সমাসে সংযুক্ত করে।

৮। যা'ন ও মা'র এই দুইটির (') চিহ্নটিকে **বিলোপ-চিহ্ন** বলে। একটি করিয়া অক্ষর লুপ্ত আছে, তাহাই বুঝাইতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রচনা-শিক্ষা

রচনা শিখিবার নিয়ম-পদ্ধতি

কোন' ঘটনা, স্থান, ব্যক্তি বা দ্রব্যের একটি বর্ণনা দিতে হইলে, কোন' একটি বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু ভাবা হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে হইলে এবং নিজের বক্তব্যকে বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া প্রকাশ করিতে হইলে রচনা লেখা অভ্যাস করিতে হয়।

লিখিতে গেলেই যেমন "কালি কলম, মন', এই তিনটি জিনিস চাই,—রচনা লিখিতে হইলে তেমনি **ভাব, ভাষা ও সাজানোর কৌশল** (বিন্যাস-শৃঙ্খলা) আয়ত্ত করা চাই। এই তিনটি জিনিস কাহারও আপনা হইতে জন্মে না, প্রয়াস ও অভ্যাসের দ্বারা ক্রমে আয়ত্ত করিতে হয়। রচনা লেখা অভ্যাস করিতে হইলে এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে।

১। প্রথমে যে বিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে, তাহার সম্বন্ধে- যাহা কিছু জানিবার আছে, তাহা আগেই জানিয়া লইতে হইবে। কতক নিজের অভিজ্ঞতায় জানা থাকার কথা; কতক ভাবিয়া বাহির করিয়া লইতে হয়; কতক পুস্তকাদি পড়িয়া সংগ্রহ করিতে হয় এবং কতক বা শিক্ষক কিংবা অন্য কোন' বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে জানিয়া লইতে হয়।

২। রচনার উপাদান বা মালমস্‌লা সংগ্রহ করা হইলে, সেগুলিকে এমন করিয়া সাজাইতে হইবে, যাহাতে এলোমেলো মনে না হয়। মনে রাখিবার জন্য একটু কাগজে ঐগুলিকে প্রথমে লিখিয়া ফেলিতে হইবে। তৎপরে দেখিতে হইবে, কোন্‌টির সঙ্গে কোন্‌টির নিকট সম্বন্ধ আছে, কোন্‌গুলির পরস্পর কাছাকাছি বসিলে বে-মানান হয় না।

তৎপর এক-শ্রেণীর কথাগুলি লইয়া এক একটি প্যারা (বা অণুচ্ছেদ) গঠন করিতে হইবে। সব চেয়ে দরকারী কথাগুলিকে গোড়ার দিকে লিখিয়া ফেলিতে হইবে, আর শেষাংশের (উপসংহারের) জন্যও কিছু রাখিতে হইবে। যেগুলি খুব বেশি দামী কথা নয়, সেগুলি রচনার মাঝখানে থাকিবে। রচনার শেষভাগে বা উপসংহারে হয় কোন বিশেষ দরকারী কথা থাকিবে, নয়ত লেখকের নিজের **মন্তব্য** বা **সিদ্ধান্ত** থাকিবে।

৩। বক্তব্য কথাগুলিকে সংক্ষেপে একবার ১-২-৩ করিয়া লিখিয়া ফেলিয়া রচনার বিষয়কে কয়েক অংশে বিভক্ত করিয়া ফেলিলে ভাল হয়। তৎপরে যে সকল কথা এলোমেলো ভাবে মনে আসিয়াছে, তাহাদিগকে বাছিয়া যে যে ভাগে পড়ে, সেই সেই ভাগে লইয়া প্রত্যেক ভাগের জন্য পৃথক পৃথক প্যারা লিখিলেই চলিতে পারে।

৪। যে বিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইবে প্রথমেই তাহার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া চাই। যেমন **স্বর্ণের** সম্বন্ধে লিখিতে হইলে—তাহার **রঙ, দাম, ওজন, কোথায়** কি **করিয়া পাওয়া যায়** এই বিষয়গুলি প্রথমে লিখিতে হইবে।

৫। যে-সব কথার দ্বারা রচনার মূল্য বিশেষ কিছু বাড়িবে না, কেবল **দীর্ঘতাই** বাড়িবে, সে সব কথা না বলাই উচিত। কোন বিশেষ

প্রয়োজনীয় অংশের সম্বন্ধে দুই চার কথা বলিয়া কোন' অল্প প্রয়োজনীয় অংশের জন্য বেশি কথা বলিলে **রচনার ওজন** ঠিক থাকে না।

যেমন **পুরীর** সম্বন্ধে রচনা লিখিতে গিয়া যদি কেহ পুরীর পাণ্ডা-পূজারীদের আচরণ বা পুরীর স্টেশনের একটি ঘটনা সম্বন্ধে এক পাতা লেখে; অথচ সমুদ্রের কথা দুই ছত্র আর জগন্নাথ-মন্দিরের কথা তিন ছত্র মাত্র লেখে, তবে সে লেখায় **সামঞ্জস্য** থাকে না।

৬। প্রসিদ্ধ কবি ও লেখকদের রচনা হইতে দুই ছত্র **কবিতা** তোলা যাইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহা যেন বে-খাপ্পা বা বে-মানান না হয়। বলিবার কথা যদি তাহাতে বিশদ বা সরস হয়, তবেই ঐরূপ দুই-চার ছত্র কবিতা তোলা যাইতে পারে।

৭। দৃষ্টান্তস্বরূপ অথবা বলিবার কথাটিকে স্পষ্ট করিবার জন্য, সংক্ষেপে কোন' **গল্প, কাহিনী** বা **আখ্যায়িকা** যোগ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাই যেন রচনার সর্ব্বস্ব হইয়া না উঠে অর্থাৎ রচনার অধিকাংশ যেন কোন দৃষ্টান্ত বা গল্পই দখল করিয়া না বসে।

একটি বিষয়ের রচনা লিখিতে দিলে কোন' কোন' ছাত্র আট দশ ছত্র একথা-ওকথা লিখিয়া একটি গল্প ফাঁদিয়া বসে এবং সেই গল্পই রচনা-টিকে শেষ করিয়া ফেলে। **সিংহের** সম্বন্ধে রচনা লিখিতে দিলে কয়েক ছত্রে সিংহের বর্ণনা করিয়া 'এণ্ড্রোক্লিস ও লায়নের' গল্পটি বলিয়া শেষ করিলেই হইবে না, সংক্ষেপে একটি প্যারায় গল্পটিকে বলিয়া যাইতে হইবে। ইতিহাস বা পুরাণের কাহিনী যোগ করা সম্বন্ধেও ঐ কথা।

৮। ভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার প্রয়োজন। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণকে কঠিন বা জটিল বিষয় লইয়া রচনা করিতে হয় না। কাজেই তাহাদের রচনায় ভাষা সহজ সরল হওয়াই স্বাভাবিক, ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে, বড় বড় বাক্য মনে আসিলে সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া

ছোট ছোট বাক্যে পরিণত করিতে হইবে। ঘড় বড় শব্দ বা সমাস যত দূর সম্ভব ত্যাগ করিতে হইবে। আগাগোড়া জমকালো ভাষায় লিখিতে পারিলে রচনা যে মন্দ হয়, তাহা নয়। তবে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে ওজন বা সামঞ্জস্য রাখিয়া সে ভাষায় আগাগোড়া লেখা কঠিন। সেজন্য জমকালো ভাষা বা গাল ভরা শব্দ ত্যাগ করাই উচিত। দেখিতে হইবে, একই রচনায় দুই রকম ঢঙ বা ছাঁদের ভাষাপ্রয়োগ না ঘটে। অনেকে গুরুগম্ভীর ভাষায় রচনা আরম্ভ করে, এবং ভাবে—ভাষার চটক দেখাইতে পারিলেই বুঝি রচনা ভাল হইবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ভাষায় গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে পারে না। তাহাতে রচনাটা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। **ভাবই প্রধান, ভাষা তাহার বাহন মাত্র।** ভাবের অভাব হইলেই ভাষার চটক দিয়া ক্ষতিপূরণ করিবার লোভ জন্মে। সে লোভ সংবরণ করিতে হইবে।

আজকাল বাঙলা সাহিত্যে চল্‌তি ভাষাও চলিতেছে। চল্‌তি ভাষাতে রচনাদি লিখিলেও চলিতে পারে। আগাগোড়া চল্‌তি ভাষাতে লেখা ছাত্রদের পক্ষে সহজ নয়। চল্‌তি ও মার্জ্জিত ভাষায় মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনাই বেশি। সেজন্য, রীতিমত অভ্যাস না থাকিলে চল্‌তি ভাষায় রচনার চেষ্টা না করাই ভাল।

(১)

'কোন' **জীবজন্তু** সম্বন্ধে রচনা করিতে হইলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিতে হইবে।

১। **কোন্ জাতীয় জন্তু?**—জলচর—না স্থলচর—না উভয়চর? ডিম হয়, না—একেবারে ছানা হয়? মেরুদণ্ড আছে কি নাই? একেবারে কতকগুলি ডিম বা ছানা হয়।

২। **আকৃতি**—কত বড় হয়? দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পরিচয়।

শিঙ, ক্ষুর, লেজ ইত্যাদি থাকিলে তাহাদের পরিচয়। গায়ের চামড়া। লোম থাকিলে তাহার কথা। পা, চোখ, দাঁত ও মাথা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা।

৩। **প্রকৃতি**—শান্ত না হিংস্র? সহজে পোষ মানে কিনা? কোন' গুণ বা দোষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিনা? বুদ্ধি আছে কি না?

৪। **আহার**—কি ভাবে আহার করে? কি ভাবে তাহা সংগ্রহ করে? জাবর কাটে কিনা? কি কি প্রধান খাদ্য?

৫। **কত দিন বাঁচে**—কত দিনে যৌবনপ্রাপ্ত হয়?

৬। মানুষের কি **উপকার** বা **অপকার** করে? মরিয়া গেলে তাহার দেহের কোন' কোন' অংশ কাজে লাগে কিনা?

৭। দোষগুণ, বুদ্ধি বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন' **দৃষ্টান্ত** বা **গল্প**।

৮। **শিকারের** উপায় বা **পালনের** নিয়ম।

(২)

স্থান-বিষয়ক রচনায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হইবে,—

১। স্থানটির **নাম**। সে নাম কেন হইল?

২। **সীমা** ও আয়তনের **পরিমাণ**। **কোথায় অবস্থিত?** নদীর ধারে—না রেলের ধারে? ঐ স্থানে যাইবার উপায় কি?

৩। **অধিবাসীদের সংখ্যা, জাতি, ধর্ম্ম, আচরণ, ব্যবহার, রাজনীতি, আর্থিক অবস্থা, জীবিকা ও সভ্যতা।**

৪। **জলবায়ু, কৃষি, শিল্প** ও **বাণিজ্য**। ইতিহাসে কোন' **প্রসিদ্ধি** আছে কিনা—কোন' বিখ্যাত ঘটনা ঘটিয়াছে কিনা—সেখানে কোন' শ্রেষ্ঠ **লোক** বা **মহাপুরুষ** জন্মিয়াছেন অথবা বাস করিয়াছেন কিনা?—স্থানীয় **উৎসব, আমোদ।**

৫। **বিদ্যালয়, দেবালয়, হাটবাজার, পথঘাট, চিকিৎসালয়** ইত্যাদির পরিচয়। ৬। **প্রাকৃতিক দৃশ্য।**

(৩)

কোন **ব্যক্তিবিশেষের** সম্বন্ধে লিখিতে হইলে লক্ষ্য করিতে হইবে—

১। **জন্ম-তারিখ, জন্মস্থান, বংশ**। মাতাপিতার পরিচয়।

২। **বাল্য-জীবন, শিক্ষা**। কিরূপ ভাবে প্রতিপালিত, প্রথম জীবনে কোন' **গুণ বা দোষের** অঙ্কুর দেখা গিয়াছিল কিনা। **সংসর্গ।**

৩। **কর্ম্মক্ষেত্র, জীবিকা,** জীবনের প্রধান প্রধান **ঘটনা, দুঃখ-কষ্ট, শোকতাপ, জীবন-সংগ্রাম, স্বাস্থ্য, ধর্ম্মমত,** দেশের সহিত সম্বন্ধ, কার্য্যক্ষেত্রের সহযোগীদের পরিচয়। **পারিবারিক ও সামাজিক জীবন**। ৪। **শেষজীবন—মৃত্যু** ও দেশের ক্ষতি।

৫। **আচার, আচরণ, চরিত্র** ও চরিত্র হইতে শিক্ষণীয় কি ?

(৪)

কোন **বস্তুবিষয়ক রচনা**—লিখিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর পূর্ব্বেই জানিয়া লইতে হইবে,—

১। **কোথা হইতে পাওয়া যায় ?** খনি হইতে—না বৃক্ষলতা হইতে—না জীবজন্তু হইতে ? ২। **উৎপত্তির স্থান ও সংগ্রহের উপায়।**

৩। বস্তুটি কি কি **কাজে** লাগে ? উহা হইতে **কি কি দ্রব্য** উৎপন্ন হয় ? কি ভাবে তাহা বাজারে পৌছায় ? **মূল্য** !

৪। কোন্ দেশে বস্তুটির প্রাচুর্য্য ? উহা হইতে সে দেশে অর্থাগম, অন্নসংস্থান ও আর্থিক উন্নতির কি সুবিধা হইয়াছে ?

৫। একস্থান হইতে অন্য স্থানে চালানের উপায়। কি ভাবে

উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। কলকারখানার সহিত বস্তুটির সম্পর্ক। কুটীর-শিল্পের সহিত কোন সম্পর্ক আছে কি না?

রচনার উপকরণ-সংগ্রহ

শিক্ষক—ননী, কোনো নদী দেখেছ?

ছাত্র—হাঁ, দেখেছি। ভাগীরথী, দামোদর ও অজয়।

শিক্ষক—নদী কয় প্রকারের হয় বল'ত?

ছাত্র—তিন প্রকারের,—শাখানদী, উপনদী ও মূলনদী।

শিক্ষক—বল দেখি, নদী কোথা হইতে জন্মে?

ছাত্র—নদী জন্মে পর্ব্বত, হ্রদ কিংবা অন্য কোন নদী হ'তে।

শিক্ষক—নদীর আকৃতি, প্রকৃতি ও গতির সম্বন্ধে কিছু জান?

ছাত্র—নদী জন্মস্থানে ও জন্মস্থানের কাছাকাছি অঞ্চলে খুব সরু থাকে, ক্রমে ক্রমে চওড়া হ'তে সুরু করে, মোহনার কাছাকাছি গিয়ে খুব চওড়া হয় এবং অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হয়। নদী এক তীর ভাঙে—অন্য তীর গড়ে। নদী এঁকে বেঁকে যায়,—সোজা যায় না।

শিক্ষক—কেন সোজা যায় না, বল'ত?

ছাত্র—ঠিক বল্‌তে পারি না।

শিক্ষক—জল নীচের দিকে গড়িয়ে নামে, উপরের দিকে উঠ্‌তে পারে না। নীচু জমি যে দিকে পায়, জল সেই দিকেই যায়। সাম্‌নে সব সময় ত নীচু জমি পায় না, কাজেই তাকে বাধ্য হয়ে নীচু জমির দিকেই বেঁকে যেতে হয়। নদী কোথায় পড়ে বল্‌তে পার?

ছাত্র—সমুদ্র, হ্রদ, কিংবা অন্য নদীতে। এসব ভূগোলেই পড়েছি।

শিক্ষক—নদী আমাদের কি উপকার করে, বলতে পার?

ছাত্র—নদী স্নান-পানের জন্য জল যোগায়, নদীতে প্রচুর মাছ জন্মে,

নদীতীরের জলবায়ু ভাল হয়, নদীতে ঢল নেমে দু'পাশের জমির উর্ব্বরতা বাড়ায়—তাতে প্রচুর ফসল হয়। এই সব আর কি?

শিক্ষক—আর যাতায়াতের সুবিধা হয়, নৌকায় চ'ড়ে নদীপথ দিয়ে নানা দেশে যাওয়া যায়। ব্যবসাবাণিজ্যের কত সুবিধা হয়। আচ্ছা, নদীতীরে এত লোক বাস করে কেন?

ছাত্র—ঐ সব সুবিধার জন্য।

শিক্ষক—হাঁ—ঐ সব সুবিধা ভোগ করবার জন্যই বটে। যখন রেল হয়নি, তখন নদী যাতায়াত ও ব্যবসাবাণিজ্যের একমাত্র গতি ছিল। সেজন্য নদীর তীর ধ'রেই যতগ্রাম, নগর জনপদ, তীর্থ, গঞ্জ, বাজার গ'ড়ে উঠেছিল। এক একটি নদীকে আশ্রয় ক'রেই এক একটা দেশের সভ্যতাও গ'ড়ে উঠেছিল। যেমন—গঙ্গা, নাইল, সাতিল আরব (দজলা-ফোরাত), ইয়াং সিকিয়াং। সে সব কথা আরও বড় হ'লে বুঝবে। এখন এই সব কথা নিয়ে, আরও নূতন দুই চারিটি কথা যোগ দিয়ে, **নদী সম্বন্ধে একটি রচনা** লেখ, দেখি।

নদী

যে জলধারা পর্ব্বত, হ্রদ কিংবা অন্য বৃহৎ জলধারা হইতে উৎপন্ন হইয়া সাগর, হ্রদ, কিংবা অন্য কোন বৃহৎ জলধারায় পতিত হয় তাহাকে **নদী** বলে। যে জলধারা পর্ব্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া অন্য কোন বড় নদীতে পড়ে, তাহাকে বলে **উপনদী**। যেমন—যমুনা, কুশী।

এক নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া যদি কোন জলধারা হ্রদ বা সাগরে পড়ে, তবে তাহাকে **শাখানদী** বলে। যেমন—ভাগীরথী, ভৈরব।

নদী যে-স্থলে সমুদ্রের সহিত মিশে সে স্থলকে বলে **মোহনা**।

পর্ব্বতের বৃষ্টিজল, ঝরনার জল, বরফ-গলা জলে নদী পরিপুষ্ট হয়।

জন্মস্থানের কাছাকাছি নদী বেশি চওড়া থাকে না। সমতলে নামিলে দুইদিক হইতে অনেক ছোট ছোট জলধারা নদীতে আসিয়া পড়ে, সমতলের সমস্ত বৃষ্টির জলও নদীতে গড়াইয়া নামে—দুইচারিটি উপনদীও তাহার সঙ্গে যোগ দেয় তখন খুব চওড়া হয়। সাগরে পড়িবার আগে কোন' কোন' নদী অনেকগুলি শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়।

নদীই সমগ্র দেশের জলনিকাশের নালী। বর্ষার সময়ে দেশে যত বৃষ্টি হয়, তাহার বেশির ভাগই নদীধারা দিয়া গড়াইয়া সাগরে যায়। সমতলে বৃষ্টির জল কতক খাল, বিল ও পুকুরে থাকিয়া যায়, কতকটা কৃষিকার্য্যে লাগিয়া যায়, বেশির ভাগ নদীতে আসিয়া পড়ে। পর্ব্বতে যে বৃষ্টি হয়, তাহার প্রায় সমস্তটাই নদীকে পুষ্ট করে। ফলে, নদীগুলি বর্ষাকালে কূলে কূলে ভরা হইয়া খরস্রোতে বহিতে থাকে। বর্ষাকালে এক এক সময় জলরাশি কূল ছাপাইয়া উঠে,—তখন তাহাকে বন্যা বলে।

এই বন্যায় দেশ ভাসিয়া যায়, গ্রাম নগর উৎসন্ন যায়, ফসল নষ্ট হয়। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা সব ভাসিয়া যায়। অন্যান্য ঋতুতে নদীতে অতি অল্পই জল থাকে, কোন কোন নদীতে একেবারেই জল থাকে না।

নদী কখনও সোজা চলে না ; তাহাকে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে হয়। অন্যান্য তরল পদার্থের মত জলও নিম্নগামী অর্থাৎ নীচু জমির দিকেই গড়াইয়া যায়। সম্মুখে নীচু জমি না পাইলেই জলধারাকে বাধ্য হইয়া বাঁকিয়া, যেদিকের ভূমি নীচু সেইদিকেই যাইতে হয়। পাহাড়িয়া অঞ্চলে নদীকে বারবার দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া কেবলই আঁকাবাঁকা পথে যাইতে হয়,—সমতলে ততটা নয়।

নদীর আর একটি ধর্ম্ম,—নদী এক দিকের তীর ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে চলে ; অন্য দিকের তীর ক্রমে দূরে পড়িয়া যায়, মাঝখানে চড়া বা চর পড়ে। যে তীরে নদীর ভাঙ্গন—সে তীরের লোক কখন্ তাহাদের

ঘরবাড়ী সব নদীগর্ভে যায়, সেই ভয়ে অস্থির থাকে। অন্য তীরের লোকেরা নিশ্চিন্ত হইয়া চড়ায় চাষবাস আরম্ভ করিয়া দেয়।

নদীর তীরকে আশ্রয় করিয়া লোকে **বসতি স্থাপন** করে। সেজন্য নদীর তীরেই বড় বড় গ্রাম-নগর গড়িয়া উঠে। স্নান ও পানীয় জলের সুবিধা, চাষ-আবাদ, মাছধরা, যাতায়াত, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদি ব্যাপারে নদী মানুষের কত উপকার করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। নদীর তীরে মানুষের জীবিকা অর্জ্জনের অনেক সুযোগ আছে। মানুষের নিত্য ব্যবহারের উপযোগী সকল দ্রব্যই নদীতীরে সুলভ।

বহুদূর পর্য্যন্ত নদীর তীরের ভূমি বেশ **উর্ব্বরা** থাকে। বন্যার জলে যে পলিমাটি দুইধারে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা জমির পক্ষে উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। চাষে জলের অভাব হইলেও নদী হইতে জল সেঁচিয়া লওয়া হয়। নদীর জল নির্ম্মল ও সুপেয়। নদী বায়ুকেও বিশুদ্ধ রাখে। সেজন্য নদীতীরের স্বাস্থ্য খুব ভাল। নদী লোকালয়ের সমস্ত আবর্জ্জনা ও জঞ্জাল ধৌত করিয়া লইয়া যায়। নদীবক্ষে নৌকাযোগে দেশ-দেশান্তরে যাওয়া যায়।

বন্যার অসুবিধা থাকিলেও নানাপ্রকার সুবিধার জন্য নদীর তীর ঘেঁসিয়াই সকল দেশে ঘন বসতি। ঘন বসতি হইতেই সভ্যতার উৎপত্তি। নদীই দেশের সভ্যতার সৃষ্টি করে এবং বিস্তার সাধন করে।

ভারতবর্ষ, চীন, ইরাক, মিশর ইত্যাদি দেশের সভ্যতা নদীধারাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে রচনা লিখ :—

১। অরণ্য। ২। আগ্নেয় পর্ব্বত। ৩। মেঘ। ৪। বৃষ্টি। ৫। হ্রদ। ৬। সমতলভূমি। ৭। সাগর। ৮। মরুভূমি। ৯। পর্ব্বত।

ঘোড়ার সম্বন্ধে রচনা লিখিতে গেলে আগেই তাহার আকৃতি ও প্রকৃতির কথা বলিতে হইবে। কত প্রকারের ঘোড়া আছে, কোন্ কোন্ দেশে ঘোড়া পাওয়া যায়, তাহা জানিয়া লইতে হইবে। ঘোড়া মানুষের কোন্ কোন্ কাজে লাগে, তাহাও বলা চাই। ঘোড়ার প্রভুভক্তির দুই একটি উদাহরণ দিতে পারিলে ভাল হয়।

অশ্ব

শিক্ষক—ঘোড়ার আকৃতি বর্ণনা কর্‌তে হ'লে কোন্ কোন্ অঙ্গের কথা বিশেষ ক'রে বল্‌বে?

ছাত্র—মাথা, চোখ, গলা, কেশর, লেজ ও লোমের কথা বল্‌ব।

শিক্ষক—ক্ষুর ও নাকের কথাও বল্‌তে হবে। লক্ষ্য ক'রে দেখো ঘোড়ার ক্ষুর গোরুছাগলের ক্ষুরের মত চেরা নয়। নাকের ছিদ্র খুব বিস্তৃত। ঠোঁট ও দাঁতের কথাও বল্‌বে—ঠোঁট দিয়া ঘোড়া খাদ্যদ্রব্য চেপে ধরে। ঘাসখড় কাট্‌বার জন্য সম্মুখে ধারালো দাঁত আছে,—আর চিবানোর জন্য পিছনে শক্ত দাঁত আছে। ঘোড়ার কাণ সহজেই নড়ে। আচ্ছা, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জান?

ছাত্র—পরিশ্রমী, দ্রুতগামী, শান্ত, প্রভুভক্ত—

শিক্ষক—তা'ছাড়া আরও আছে। ঘোড়া সহজে ভয় পায়, শিক্ষা দিলে তাহাকে সাহসী ক'রে তোলা যায়। ঘোড়া বুদ্ধিমান্ জন্তু, শিখালে কত কি শিখতে পারে। সার্কাস দেখনি? আচ্ছা, কোন্ কোন্ দেশ ঘোড়ার জন্য প্রসিদ্ধ বল্‌তে পার?

ছাত্র—আরব দেশ,—আর জানি না।

শিক্ষক—স্কটল্যাণ্ড, বর্ম্মা, বার্ব্বারী, ফ্লাণ্ডার্স, তিব্বত, ইরান,

সিন্ধুদেশ। অবশ্য আরব দেশের ঘোড়াই সব চেয়ে ভাল? ঘোড়া কি কি উপকার করে?

ছাত্র—গাড়ী টানে, ভার বয়, সার্কাসে খেলা দেখায়, লোকে ঘোড়ার পিঠে চ'ড়ে যুদ্ধ করে, শিকার করে, রেস খেলে।

শিক্ষক—ইউরোপের ঘোড়া লাঙ্গলও বয়। আচ্ছা, ঘোড়ার আদর আগের চেয়ে আজকাল বেড়েছে না কমেছে?

ছাত্র—রেসের জন্য ঘোড়ার আদর খুব বেড়েছে।

শিক্ষক—যুদ্ধে আজকাল ঘোড়ার ব্যবহার হয় না। রেল, মোটর ইত্যাদির প্রবর্ত্তন হওয়ায় ঘোড়ার আদর কমেছে। দ্রুত গমনের জন্য নয়, সখ ক'রে চড়ে বেড়ানোর জন্য কেউ কেউ ঘোড়া পোষে।

শিক্ষক—ঘোড়ার মৃতদেহ হ'তে আমরা কি কি উপকার পাই?

ছাত্র—জানি না।

শিক্ষক—কেন? ঘোড়ার চামড়ায় অনেক জিনিস তৈয়ারী হয়, লোম চেয়ারের গদির জন্য ব্যবহার করা হয়। ক্ষুরে শিরিস, হাড়ে ছুরির বাঁট, চর্ব্বিতে সাবান তৈয়ারী হয়। কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রভুভক্ত অশ্বের নাম করতে পার?

ছাত্র—রাণা প্রতাপের **চৈতকের** কথা জানি।

শিক্ষক—আলেক্‌জাণ্ডারের **বুকেফেলাস,** রুস্তমের **রুকুশ** ও মোহাম্মদ খাঁর **লায়লার** নামও খুব প্রসিদ্ধ।

এই কথাগুলি নিয়ে এবং নিজে আর যা' জান, সে সব কথা যোগ দিয়ে ঘোড়ার সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ দেখি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রচনার নিদর্শন

সিংহ

সিংহ একটি সুশ্রী **জন্তু**। সিংহের ঘাড়ে ও মাথায় প্রচুর **কেশর** আছে। এই কেশরের জন্য সিংহকে এত সুন্দর দেখায়। সিংহীর কেশর নাই। সিংহের লাঙ্গুলও সুশ্রী—উহাতে গুচ্ছ-গুচ্ছ লোম আছে। সিংহের মাথা অনেকটা চতুষ্কোণ, দেহের তুলনায় অনেক বড়,—কেশরের জন্য আরও বড় দেখায়। সিংহের **দাঁত** অনেকটা বিড়ালের দাঁতের মত, দুই পাটীতে ৩০টি দাঁত আছে, ৪টি দাঁত লম্বা ও ধারালো। এই চারিটি দাঁতে সে জীবজন্তুর দেহ বিঁধিয়া ফেলে,—১২টি দাঁতে সে শিকার ছিঁড়িয়া খায়,—বাকী ১৪টি দাঁতে সে চিবাইতে পারে। সিংহের **নখর** ধারালো ও বাঁকা। এই নখরগুলিকে সে চলিবার সময় গুটাইয়া রাখে,—শিকারকে আঘাত করিবার সময় বাহির করে। পায়ে **মাংসের গদি** আছে, সেজন্য চলিতে শব্দ হয় না,—সহসা শিকারকে আক্রমণ করিবার পক্ষে বেশ সুবিধা হয়।

সিংহের **চক্ষু** উজ্জ্বল, কিন্তু সে রৌদ্রের আলোক সহ্য করিতে পারে না। দিনের বেলায় সিংহ চোখ বুজিয়া গভীর বন বা গুহার অন্ধকারে কাটাইয়া দেয়। রাত্রির অন্ধকারে তাহার চোখ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকে।

সিংহ কেবল মাংসই খায়। ইহাকে অন্য **খাদ্য** খাওয়াতে পারা যায় না। শোনা যায়,—সিংহ মৃত জীবের মাংস খায় না। প্রথম চেষ্টাতেই যদি শিকার ধরিতে পারিল, তবে ইহার আহার জুটিল, দ্বিতীয় বার আর চেষ্টাও করে না। ক্ষুধা পাইলে সিংহ অযথা জীবহিংসা করে না। সিংহ ব্যাঘ্রের মত হিংস্র ও ভয়ানক জন্তু নয়।

সিংহের শরীরে **বল** অসাধারণ। সিংহের বল এত বেশি যে, সিংহ

হস্তীকেও বধ করিতে পারে। অনেক বড় বড় জীবকে মুখে করিয়া টানিয়া গুহায় লইয়া যায়। দেহের গঠন, অসাধারণ বল ও কতকগুলি বিশেষ বিশেষ গুণের জন্য সিংহকে **পশুরাজ** বলা হয়।

মানুষ সিংহকে মনে মনে বীর বলিয়া শ্রদ্ধা করে। **বীরত্ব** ও **পৌরুষের** কথা বুঝাইতে হইলে সিংহের সহিত উপমা দেওয়া হয়। পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বুঝাইলে সিংহ শব্দের ব্যবহার করা হয়। বীরজাতির পতাকায় সিংহের চিত্র অঙ্কিত থাকে। হিন্দুরা সিংহকে মহাশক্তিরূপা মহামায়ার বাহনরূপে কল্পনা করিয়াছে।

সিংহকে শিকার করিতে পারিলে মানুষের ভারি বাহাদুরি। সিংহকে ধরিয়া খাঁচায় পুরিয়া মানুষ গৌরব অনুভব করে। বনের রাজা মানুষের ফন্দিতে বন্দী হইয়া একটি অদ্ভুত দেখিবার সামগ্রী হইয়া উঠে। সিংহ সহজেই পোষ মানে, তাই সার্কাসওয়ালারা নিরাপদে সিংহের খেলা দেখাইতে পারে।

সিংহের তিন বৎসর অন্তর এক সঙ্গে চার পাঁচটি **শাবক** জন্মে; কিন্তু সবগুলি বাঁচিতে পায় না, সিংহই অধিকাংশকে মারিয়া ফেলে।

সিংহের কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। একসময়ে একটি ক্রীতদাস প্রভুর বাড়ী হইতে পলাইয়া পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল। সেখানে একটি সিংহ পায়ের ক্ষতে অসহ্য যন্ত্রণাভোগ করিতেছিল। ক্রীতদাসটি ভয় না পাইয়া কাছে গিয়া দেখিল সিংহের পায়ে একটি কাঁটা বিঁধিয়াছে। সে ধীরে ধীরে কাঁটাটি তুলিয়া দিলে সিংহ সুস্থ হইল। কিছুকাল পরে ক্রীতদাসটি ধরা পড়িল এবং পলায়নের দণ্ডস্বরূপ সিংহের মুখে অর্পিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয়, অপরাধী ক্রীতদাস ঐ সিংহটিরই পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সিংহটি আগেই ধরা পড়িয়াছিল। সিংহ চিনিতে পারিয়া তাহার গা চাটিতে ও

নানাভাবে আদর দেখাইতে লাগিল। এই অদ্ভুত ব্যাপারে ক্রীতদাসের মনিব অবাক্ হইয়া গেল এবং ক্রীতদাসও ক্ষমা পাইয়া গেল।

আজকাল আফ্রিকার জঙ্গলই সিংহের বাসস্থল। ভারতবর্ষে এক সময়ে অনেক সিংহ ছিল, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য তাহার সাক্ষী।

হস্তী

(ইহাকে বাড়াইয়া পূর্ণাঙ্গ রচনায় রূপান্তরিত করিতে হইবে)

চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পাহাড় ও বনে দলে দলে ভ্রমণ করে, মানুষ বুদ্ধিকৌশলে বশীভূত করিয়া কাজে লাগায়।

মস্তক দেহের তুলনায় ছোট। গায়ের চামড়া খসখসে, চক্ষু দুটি খুব ছোট; কাণ দুটি কুলার মত, ঘাড় ছোট, পা চারিটি থামের মত। হাতীর নাকটি বড় হইয়া শুঁড়ে দাঁড়াইয়াছে। শুঁড়ের সাহায্যে ডাল ভাঙ্গে,—খাবার তোলে, জল শুষিয়া লইয়া সে জল মুখের মধ্যে ঢালে, গায়ে ছিটায়, শুঁড়ের সাহায্যে হাতী যুদ্ধ করে, যাহার উপর রাগ হয় তাহাকে আছড়াইয়া মারে।

পালিত হস্তিনীর সাহায্যে হাতীর দলকে-দল ভুলাইয়া কাঠড়া বা খেদার মধ্যে আনিয়া ধরিয়া ফেলা হয়। হস্তিনী দুই বৎসর গর্ভ ধারণ করিয়া একটি সন্তান প্রসব করে। প্রায় শত বর্ষ বাঁচে।

পূর্ব্বে হাতী রাজাদের বাহন, প্রধান সম্পত্তি ও যুদ্ধের প্রধান অঙ্গ ছিল, অতি ভারী জিনিষ উঠাইতে, নামাইতে ও টানিতে ব্যবহৃত হইত। আজকাল শোভাযাত্রা ও সার্কাসে উহাকে দেখা যায়। কোথাও কোথাও যান হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। শিকারের সময়ই হাতীর সব চেয়ে বেশি দরকার হয়। হাতীর দাঁত ও হাড় অনেক কাজে লাগে।

হাতীর যথেষ্ট বুদ্ধি আছে,—প্রতিশোধ লইতে জানে। শোনা যায়,—

একজন দর্জ্জি একটি হাতীর শুঁড়ে স্বচ বিঁধিয়া দিয়াছিল। হাতী তাহার শুঁড়ে জল ভরিয়া আনিয়া তাহার দোকান ভাসাইয়া দিয়াছিল। একটি মাহুত তাহার হাতীর মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়া খাইয়াছিল,—হাতীটিও মাহুতের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়াছিল।

কুকুর (সংক্ষিপ্ত)

নানা আকারের কুকুর দেখা যায়। বাছুরের মত বড়ও হয়—বিড়ালের মত ছোটও হয়। নানা রঙেরও দেখা যায়। কাহারও গা লোম-ভরা, কাহারও গায়ে লোম ছোট-ছোট। কাহারও মুখ গোল ও চেপ্টা, কাহাও মুখ স্থচালো। কাহারও লেজ ছোট,—কাহারও বড়। কুকুরকে তেজী করবার জন্য তাহার লেজ কাটিয়া দেওয়া হয়। কুকুরের পায়ের তলায় নরম গদির মত মাংসপিণ্ড আছে—তাহাতে সে নিঃশব্দে দৌড়াইতে পারে। জিভ কর্কশ ও লম্বা। গরম লাগিলে ঝুলিয়া পড়ে,—জল চাটিয়া খায়। বন্য কুকুর হিংস্র, পোষ মানিলে শান্ত ও প্রভুভক্ত হয়। ঘ্রাণশক্তি প্রবল, দূর হইতে গন্ধের দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ চিনিতে পারে। খাদ্য—মাংস, হাড়, মাছ, দুধ, ভাত ইত্যাদি। কুকুরী দুইমাস আড়াই মাস গর্ভ ধারণ করে এবং একসঙ্গে অনেকগুলি বাচ্চা প্রসব করে। হিন্দুগৃহে অনাদৃত, ইউরোপে কুকুরদের আদর অতিরিক্ত। বাড়ীঘর, গৃহপালিত জীবজন্তু ও ফসল পাহারা দিবার জন্য কাজে লাগে। শিকারে সহায়, প্রভুর জীবন রক্ষা করে। দূতের কাজ করে, সার্কাসে খেলা দেখায়। প্রভুভক্ত, বুদ্ধিমান্ ও বিশ্বস্ত। সেণ্টবার্নার্ড কুকুর আল্পস পর্ব্বতে বহুলোকের জীবন রক্ষা করে। নিদ্রিত শিশুকে সর্পদংশন হইতে রক্ষা করিয়াছে, অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক প্রভুকে বাঁচাইয়াছে এরূপ গল্পও শোনা যায়।

উষ্ট্র (সংক্ষিপ্ত)

কুৎসিত জন্তু। গলা লম্বা ও বাঁকা,—চোখ ও কাণ ছোট, পা লম্বা—পিঠে কুঁজ। পায়ের তলা চটলা ও নরম, চোখের উপরে লোম।

মরোক্কা, আবিসিনিয়া, মিসর, আরব, তুরস্ক ও পারস্য অর্থাৎ যেখানে যেখানে মরুভূমি আছে, সেখানে সেখানে উট দেখিতে পাওয়া যায়।

মরুভূমির জন্যই যেন ইহার সৃষ্টি। ভীষণ উত্তাপ সহ্য করিতে পারে, বালুকার উপর দ্রুত চলিতে পারে, প্রচুর ভার বহন করিতে পারে, সহজে ক্লান্ত হয় না, দূর হইতে জলের ঘ্রাণ পায়—পেটে জল সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে—খাদ্য না খাইলেও চর্ব্বিতেই ইহার ৮।১০ দিন বেশ চলিয়া যায়—মরুভূমিতে বহু ক্রোশ পথ অক্লেশে পার হইয়া চলিয়া যায়, অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়, বালুকায় পা বসিয়া যায় না। খাদ্য—বাবলার ডালপালা ও খেজুরের কাঁটা পাতা ও কাঁটা-ঘাস।

উটের দুধ ও মাংস আরববাসীর প্রিয় খাদ্য। উটের লোমেও কাপড় হয়। ৫০।৬০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। উষ্ট্রী বৎসরকাল গর্ভ ধারণ করিয়া এককালে একটি সন্তান প্রসব করে।

উট না থাকিলে মরুপ্রদেশে কোন মানুষ বাস করিতে পারিত না। উট মরুময় প্রদেশে সভ্যতাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছে। আমাদের দেশে যেমন গোরু আরব দেশে তেমনি উট পবিত্র জন্তু।

অনুশীলনী—সংক্ষিপ্ত আকারে লিখিত রচনাগুলিকে সম্পূর্ণাঙ্গ কর। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বিড়াল, ছাগল, ভেড়া, বানর সম্বন্ধে রচনা লিখ। যে রচনাগুলি লিখিয়া দেওয়া হইল এবং যেগুলিতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল—সেগুলিতে যে যে অঙ্গ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—জীবজন্তু সম্বন্ধে রচনা লিখিতে সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হও।

গো ও মহিষ

মহিষ—দেখ, আমি অনেক দিন হ'তে ভাবছি—লোকে তোমাকে এত বেশি খাতির করে, মা ভগবতী ব'লে পূজা করে, তোমাকে বেশি বেশি যত্ন করে, আর আমাকে অযত্ন, অশ্রদ্ধা করে কেন? আমাকে ত 'যমের বাহন' বলে 'মহিষাসুরের বংশধর' বলে, পুজোর সময় আমাদের মধ্যে দুই চার জনকে ধ'রে বলিদানও দেয়। আর তোমাকে দেবতাই ক'রে তুলেছে—তোমার গায়ে সামান্য আঘাত করাও মহাপাপ। লোকে আমাদের মধ্যে তফাৎ করে কেন?

গোরু—এ-ত খুবই সোজা কথা। আমার গুণের জন্য লোকে আমাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। আমার দ্বারা অনেক বেশি উপকার পায় তাই যত্ন করে। তা ছাড়া আমি সুশ্রী, তুমি কদাকার।

মহিষ—তোমার আকারে আর আমার আকারে বিশেষ কি তফাৎ আছে? আমার রঙ্‌টা কালো, তা কালো গোরুও ত আছে, তারও ত সমানই আদর। তা ছাড়া—চোখ, দাঁত, মুখ, পা, ক্ষুর, ল্যাজ,—মোটা-মুটি দেহের গঠনে কোন তফাৎ ত দেখি না। আমার ঘাড়টা একটু ছোট, গায়ে লোম কম আছে, আর শিঙ দুটো একটু মোটা, বড় ও বাঁকা। এই সামান্য তফাতের জন্য আদর যত্ন এত তফাৎ? তুমি যা খাও আমিও তাই খাই, আমিও তোমার মত আমিষ বা নোংরা জিনিস খাই না। তুমিও জাবর কাট, আমিও জাবর কাটি।

গোরু—তুমি বুনো, গোঁয়ার, অসভ্য। এখনও তোমার বন্য ভাব যায় নি। তুমি এখনও নিজের জাতের জীবের সঙ্গে লড়াই কর। আমি সেই আদিকাল হ'তে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আছি। মানুষ যখন তোমার নামও শোনে নি, তখন হ'তে আমি তার পরিবারের মধ্যেই ঠাঁই পেয়েছি।

—চাষ ক'রে তাদের মুখে অন্ন যুগিয়েছি, দুধ দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করেছি, পিঠে ক'রে তাদের এক দেশ হ'তে অন্য দেশে নিয়ে গিয়েছি। আর তুমি ছিলে বনে। তোমাকে শিকার ক'রতে হ'ত। তুমি সহজে মানুষের বশ মান'নি—অনেক লড়াই ক'রে তবে তোমাকে বশ মানিয়ে কাজে লাগাতে হ'য়েছে। সাধে তোমাকে মহিষাসুরের বংশধর বলে? তুমি যে এখনও বুনো আছ, তা তোমার বেয়াড়া চেহারা আর স্বভাব দেখেই বোঝা যায়। এখনও জল-কাদা দেখলেই নেমে পড়, শুয়রের মত কাদায় গড়াগড়ি দাও। তুমি কতকটা জলজন্তুর মত, সেজন্য তোমার গায়ে লোম কম: আর তোমার চামড়াও জলচর জন্তুরই মত।

মহিষ—স্বীকার করি, তুমি অনেক আগে থেকে মানুষের সংসারে বশ মেনে পোষ মেনে ঢুকেছ। তুমিও ত একদিন বুনো ছিলে, সহজে 'কুণো' হওনি, সহজে পোষ মাননি। তোমাদের ষাঁড়গুলো এখনও বুনো গোঁ ছাড়েনি। ষাঁড়ে ষাঁড়ে দেখা হলেই এখনও লড়াই বাধে। একদিন ষাঁড়গুলোকেও শিকার করতে হয়েছে। যখন বুনো ছিলাম তখন ছিলাম; অনেকদিন হ'তেই ত আমরাও বশ মেনেছি—তোমার মতন সমান কাজই করেছি—শিষ্ট শান্ত হয়েছি। তবু আমার বুনো অপবাদ গেল না। তোমার মতই আমাকে আদর-যত্ন করা উচিত নয় কি? অকৃতজ্ঞ হিন্দুরা তোমার তুলনায় আমাকে এত ছোট ভাববে কেন? তুমি দেবতা হবে, হও, আমি দৈত্যদানব হ'লাম কিসে?

গোরু—তোমার চেয়ে আমি তাদের অনেক বেশি উপকার করি—অনেক বেশি কাজে লাগি, অনেক বেশি অনুগত।

মহিষ—একটুও বেশি নয়। তুমি চাষ কর, আমিও চাষ করি। তোমার চেয়ে আমি বরং বেশি কাজ করি। বর্ষার কাদায় তুমি অল্পেই

কাতর হ'য়ে পড়, আমি সহজে কাতর হই না। তুমি ভার বও,—আমি তোমার চেয়ে বেশি ভার বই। তুমি গাড়ী টান—আমিও গাড়ী টানি। একটু আস্তে চলি বটে,—কিন্তু অনেক বেশি মাল টেনে নিয়ে যাই। জল-কাদার পথে তুমি গাড়ী টেনে তুলতে পার না, আমি সহজেই পারি। তোমরা দুধ দাও,—আমরা তোমাদের চেয়ে ঢের বেশি দুধ দিই। আমার দুধেও ছানা, মাখন, ঘি, দই ইত্যাদি হয়

গোরু আমার দুধের গুণ আর তোমার দুধের গুণ কি এক? জিজ্ঞাসা ক রো দেখি কব্‌রেজ ম'শায়কে।

মহিষ—সামান্য কিছু তফাৎ আছে। তোমার দুধের যেমন কতকগুলি গুণ আছে,—আমার দুধেরও তেমনি পৃথক্ কতকগুলি গুণ আছে। যারা আমাদের দুধ খাওয়া অভ্যাস করেছে, তারা সমানই ফল পায়। গাওয়া ঘিয়ের আদর আছে সত্য, কিন্তু তা'ত পাওয়া কঠিন, —সবার ভাগ্যে জুটে না। আমার দুধের ঘিয়ে লোকের নিরামিষ সুখাদ্য খাওয়ার লালসা মিটেছে। আর দই? কে না জানে আমার দুধের দই-ই গোরুর দুধের দই হ'তে ঢের ভাল? আমার দুধ বাদ দিলে অতি অল্প লোকেই সুখাদ্য খেতে পাও।

গোরু—আমার গোবর পবিত্র,—গোবরে অনেক কাজ হয়। আমার মৃতদেহটা হ'তেও লোকে অনেক উপকার পায়।

মহিষ শেষে গোবরে আর ভাগাড়ে নামলে! ভাল, তারও জবাব আছে। তোমার গোবর যে পবিত্র,—সেটা হিন্দুদের ভক্তির বাড়াবাড়ি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে গোবরে আর 'ম'হষবরে' বিশেষ কোন' তফাৎ নেই। আমার গোবরেও জ্বালানি ঘুঁটে হয়, জমির সার হয়। আমার মৃতদেহও সমানই কাজে লাগে। আমারও হাড়ের গুঁড়ায় সার হয়, হাড়ের কয়লায় চিনি-লবণ পরিষ্কার হয়। ক্ষুর গলিয়ে শিরিস হয়,

আমার চামড়ার জুতা, ব্যাগ, বই-এর মলাট ইত্যাদি হয়। উপরন্ত আমার শিঙে চিরুনী, বোতাম, কলম, ছুরির বাঁট, খেলনা ইত্যাদি অনেক জিনিস তৈয়ারী হয়। মোটের উপর, লোকে আমার কাছে ঢের বেশি ঋণী। কিন্তু আশ্চর্য্য! হিন্দুরা ভাবে, আমাকে বলিদান দিলে হয় পুণ্য, আর তোমার অঙ্গে আঘাত করলেও হয় পাপ। ষাঁড় হ'ল শিবের বাহন, আর আমি যমের বাহন!

অনুশীলনী—[চলতি ভাষায় লিখিত এই কাল্পনিক কথাবার্ত্তা অবলম্বন করিয়া গোরু ও মহিষ সম্বন্ধে মার্জ্জিত ভাষায় দুইটি রচনা লিখ]।

একটি অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা

গতকল্য আমাদের গ্রামে একটি ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। বেলা তিনটার সময় হঠাৎ একটা কোলাহল উঠিল। তারপর দেখি পশ্চিমদিক্ হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উঠিতেছে এবং ঐ দিকে দলে-দলে ছেলেবুড়ো সকলে ছুটিতেছে। আমিও তাহাদের সঙ্গে ছুটিলাম।

আমি যখন পৌঁছিলাম, তখন দেখি চার-পাঁচখানি ঘরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, আর কাঠ ও বাঁশ ফাটার জন্য ফটফট শব্দ হইতেছে—ছয়খানি ঘর নিঃশেষে পুড়িয়া গিয়াছে। চারিপাশে ভয়ানক ভিড়। বিকট চীৎকার করিয়া লোকে ছুটাছুটি করিতেছে। নিকটে জল নাই। অনেক দূর হইতে জল বহিয়া আনিতে হইতেছে। লোকে কলসী, ঘড়া, গামলা, গাড়ু, হাঁড়ি ও বালতি লইয়া হাতাহাতি জল বহিয়া চালের উপর তুলিয়া দিতেছে; কিন্তু তাহাতেও আগুন নিভানো কঠিন।

সমস্তই খড়ের চাল,—একখানার গায়ে আর একখানা। চৈত্রমাসের খরানিতে খড় এমনি খরাইয়া আছে যে, সামান্য একটু আঁচ পাইবামাত্র দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে আর তিন চার

খানা ঘরে আগুন ছড়াইয়া পড়িল। নিকটের একটি পুকুরেও জল নাই, শুধু পাঁক আছে, কেহ কেহ সেই পাঁকই তুলিয়া আগুনে দিতে লাগিল। অনেকে জলের অভাবে আপন আপন বাড়ীর চালে ঐ পাঁকই লেপিতে লাগিল।

যে সকল ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে ঘরগুলির আগুন নিভানো যখন অসাধ্য ব'লে মনে হইল, তখন লোকে আশপাশের ঘরের চালে যথাসাধ্য জল ঢালিয়া ভিজাইতে লাগিল,—সেগুলিতে যেন সহজে আগুন না লাগে। কিন্তু তাহাতেও চারিপাশের ঘর বাঁচিল না। খড়ের পালা ও মরাইগুলিতে আগুন ধরিয়া সে আগুন ঘরের নীচের দিকের চালেই ধরিতে লাগিল। লোকে চালাঘরের চালগুলি আগে হইতেই ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল, গোয়াল হইতে গোরুগুলি ছাড়িয়া দিল, খড়ের পালা ভাঙ্গিয়া খড় ও পোয়াল রাস্তায় জড়ো করিতে লাগিল, আর মরাইগুলি সব ভাঙ্গিয়া উঠানে ধান রাশীকৃত করিয়া ফেলিল; পুরুষেরা যখন জল ও পাঁকের সাহায্যে আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছিল, স্ত্রীলোকেরা তখন ঘরের জিনিসপত্র বাহির করিতেছিল।

যাহাদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল, তাহাদের দুইখানি ঘরের জিনিসপত্র বাঁচে নাই, বাকি সবই বাঁচিয়াছে, কিন্তু একখানি ঘর বা একটি মরাইও রক্ষা পায় নাই। যাহাদের ঘর পুড়িল তাহাদের স্ত্রীলোকেরা ও বালকেরা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুরুষেরা ছাই মাখিয়া পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

৩।৪ ঘণ্টা অনবরত জ্বলিয়া আগুন নিভিল। ২২।২৩ খানা ঘর পুড়িয়া গেল। একটি পুকুর, খানিক প'ড়ো জমি এবং অনেকগুলি গাছপালা মাঝে পড়ায় আগুন আমাদের পাড়ার দিকে আসিতে পারে নাই। গ্রামের সমস্ত লোকের চেষ্টায় আগুন বেশি দূর আগাইতে পারে

নাই। গ্রামের দুই জন যুবকের হাত পা পুড়িয়া গিয়াছে, পড়িয়া এক-জনের পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। জিনিষপত্র কাহারও চুরি যায় নাই।

জল ঢালা সত্ত্বেও রান্নার পর উনুনে আগুন থাকিয়া গিয়াছিল, উনুনের পাশে কতকগুলি পাটখড়ি ছিল, সেই পাটখড়িতে কিরূপে যেন আগুন ধরিয়া কেরোসিনের বোতল জ্বলিয়া তারপর শিকেয় লাগিয়া চালে ধরে।

বাড়ীর লোকেরা অন্য ঘরে ঘুমাইতেছিল,—জানিতে পারে নাই।

৮।১০টি পরিবার একদিনেই নিরাশ্রয় হইয়া গেল। তাহারা নানা জনের বাড়ীতে আশ্রয় লইল। লোকগুলির বড়ই কষ্ট হইয়াছে। গোরু-বাছুরের কষ্ট আরও বেশি হইয়াছে। কত দিনে আবার তাহারা ঘর বাঁধিতে পারিবে জানি না। তবে গ্রামের লোক তাহাদিগকে নানাভাবে সহায়তা করিতেছে।

একটি দুর্ঘটনা (শহরের)

কোথায় কখন্ কিরূপে দুর্ঘটনা ঘটিল। কাহার দোষে ঘটিল? যাহারা বিপন্ন হইল বা আঘাত পাইল তাহাদের অবস্থা। কত লোক জমিয়া গেল? দুর্ঘটনা ঘটিবামাত্র বিপন্ন ব্যক্তিগণকে কিরূপে সাহায্য দান করা হইয়াছিল? হাসপাতালে প্রেরণ, পুলিশের সাহায্য-গ্রহণ, বিপন্নদের আত্মীয়স্বজনদের ব্যস্ততার কথা, বিপন্নগণের পরবর্ত্তী অবস্থা।

একটি গ্রাম্য মেলার বর্ণনা

স্থান। কি উপলক্ষে মেলা? মেলায় সমবেত লোকসংখ্যা—আমোদ-প্রমোদ—সঙ্গীতাদি। কি কি জিনিস বিক্রয়ের জন্য আসিল? কোন্ কোন্ নগর বা জেলায় ঐ সকল দ্রব্যাদি নির্ম্মিত? সেগুলির গুণাগুণ-বিচার। কয় দিন মেলা স্থায়ী হইল? স্বাস্থ্যরক্ষার ও সমবেত লোক-গণের অন্যান্য সুবিধার কি ব্যবস্থা? কাহারা মেলা বসাইয়াছে? এই

উপলক্ষে তাহাদের আয়-ব্যয় ও লাভালাভের কথা। ঐ মেলার দ্বারা গ্রামের কি সুবিধা অসুবিধা হয়?

নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি বর্ণনা কর—

(বিষয়গুলি নিজের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত হইতে পারে। এজন্য কেহ এইরূপ ঘটনার গল্প বলিলে মন দিয়া শোনা উচিত।)

১। একটি নৌকাডুবি। ২। গ্রামে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আগমন। ৩। সূর্য্যগ্রহণ। ৪। অর্দ্ধোদয়-যোগ। ৫। একটি ডাকাতি। ৬। একটি শোভাযাত্রা। ৭। বিদ্যালয়ে পরিদর্শকের আগমন।

বাঁশ

আমি বাঁশ, আমি তোমাদের প্রধান বন্ধু,—সূতিকাগার হ'তে শ্মশান পর্য্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গী। হিন্দুদের তো অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ কোনটাতেই আমাকে বাদ দিলে চলে না, আমার কঞ্চিতেই ছাদনাতলা তৈরী, আর আমারই দণ্ড হাতে ক'রে পৈতের সময় বামুনের ছেলেরা হয় দণ্ডী।

এ সকল তুচ্ছ কথা। আমাকে বাদ দিলে তোমাদের জীবন-যাত্রাই চলে না। তোমরা বাঙ্গালী, বাস কর বেঁশো ঘরে। কোঠাঘরে থাক্‌লেও তোমরা আমার কাছে ঋণী। আমারই 'ভারায়' চ'ড়ে রাজ-মিস্ত্রীরা কোঠাবাড়ী তৈরী করে। তোমাদের চাষের ও মাছ ধরার যন্ত্র-পাতি সবই আমারই তৈরী। তোমাদের যে সনাতন যানটি আদিমকাল হ'তে চ'লে আসছে,—সেই গোরুর গাড়ীটি আমারই রচনা। উপরে উঠতে গেলে আমার সাহায্য চাই, শুধু মানুষের নয়, বৃক্ষ-লতাদেরও। তোমাদের বাড়ী-ঘর সবই আমি ঘিরে রেখেছি,—তোমাদের জিনিসপত্র আগলাই,—আবার নিশানও ওড়াই,—আকাশবাতিও জ্বালি।

মজুরের মাথালি, কৃষাণের তেলের চোঙা, গোয়ালার বাঁক. ধুনুরীর তাঁত, পাড়াগাঁয়ের আল্‌সেদের মাছ ধরার ছিপ, ছেলেদের খেলনা, রাখালের পাঁচনবাড়ী, বাবুদের হাতের ছড়ি—সবই আমার ভাণ্ডার হ'তে সরবরাহ করি।—আমার সাহায্য ভিন্ন পল্লীগৃহের একদিনও চলে না। ঝুড়ি, কুলা, ধুচুনী, ঝাঁঝুরি, চালুনি, টোকা,—এগুলি কেড়ে নিলে সংসারের অর্দ্ধেক কাজ বন্ধ।

শহরের বাবুরা বড় বড় কোঠা বাড়ীতে বাস করেন, আমার ধার বড় ধারেন না। কিন্তু উৎসবের দিনে আমাকে ডাকতে হয়। তাঁদের বাড়ীর ছাদের উপর ছাপ্‌পর ধরে থাকি,—তবে লোকে খাবার জায়গা পায়, নইলে রাস্তায় দাঁড়িয়েই শহুরে বাবুদের লুচি-পোলাও খেতে হ'ত। তাঁদের জন্য আমাকে দু-চারটা জিনিব তৈরী করতে হয়েছে,—যেমন টেবিল, চেয়ার, ফুলদানী, ছিন্নপত্রধানী ইত্যাদি।

আমি শুধু কাজেই সাহায্য করি না,—আনন্দও দিই। বাঁশের বাঁশীর গান শুনেছ—দূর মাঠ হ'তে যখন ভেসে আসে—চাঁদনী রাতে? এক সময়ে আমার দ্বারা ধনুক তৈরী হ'ত। তাই নিয়ে বীর পুরুষেরা যুদ্ধ করত—শিকার করত। ধনুক অচল হ'লেও আমার কাজ বন্ধ হ'ল না—লাঠি জোগাতে হ'ল। বহুকাল সেই লাঠির জোরেই এ দেশের মাটির দখলদারি ঠিক হয়ে এসেছে। বাঙ্গালীর হাতে ঐ এক মাত্র হাতিয়ারই সম্বল ছিল। বাঙ্গালী যত দূর পেরেছে ঐ লাঠির জোরেই আত্মরক্ষা করেছে,—একথা তোমাদের বঙ্কিমচন্দ্র বেশ রসান দিয়েই ব'লে গেছেন। বড় হয়ে দেবী চৌধুরাণীতে লাঠির গুণগান প'ড়ে দেখো।

বাঙ্গালাদেশে পাট ধানের পরেই বোধ হয় আমার ঠাঁই। আমার জন্য কাউকে কিছু খরচ করতে হয় না—আকাশ পানে চেয়ে থাকতে হয় না,—বন্যাভয় নেই,—জমি চষতে হয় না, সার দিতে হয় না—

হেফাজৎ কর্‌তে হয় না। আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করি। হেলায় শ্রদ্ধায় তোমরা আমার একটা কোঁড় কিংবা একটা গোঁড় পুতে দাও,—তারপর আমি ঝাড় বেঁধে বেড়ে উঠি। এত অল্প জায়গার মধ্যে এত বেশি সম্পত্তি তোমাদের আর কি আছে?

আমি গ্রামের শোভা বাড়াই—চারিপাশ ঘিরে থাকি,—বাড়ীর আবরু রক্ষা করি,—গ্রামপথে ছায়া দিই, অনাবৃষ্টিতে মরি না,—অতিবৃষ্টিতে পচি না—ঝড়ে টলমল করি, কিন্তু ভাঙ্গি না—ঝড়কে ভয় করি না, তার সঙ্গে মেতে উঠি।

আমার পাতা প'চে ম্যালেরিয়া হয় এমন কথা শুনতে পাই। সেটার তোমাদেরই দোষে। জলের ধারে আমাকে জায়গা দাও কেন? পাতা ত জলে পড়বেই। আমার পাতা জলে পচ্‌তেই বা দাও কেন? আমার গোড়ায় আগুন দিয়ে শুক্‌না পাতা পুড়িয়ে ফেললে আমারও ত লাভ কম হয় না। আগুনের তাপকে আমি ভয় করি না।

[উপরে বাঁশের জবানীতে যাহা বলা হইল তাহা অবলম্বন করিয়া ছাত্রগণ 'বংশ' সম্বন্ধে একটি রচনা লিখুক,—ইহাই অভিপ্রেত। ঠিক এইভাবে আত্মচরিত বিবৃতির পদ্ধতিতে যে কোন বস্তু বা স্থান সম্বন্ধে রচনা করা যায়।]

অনুশীলনী

আম্র—ফলের রাজা। ইহার বৃক্ষ বৃহৎ ও সুদৃশ্য। বসন্তের প্রারম্ভে গাছে মুকুল ধরে। মুকুলিত আম্রবৃক্ষের শোভা। বসন্তকালে গুটি ধরে—গ্রীষ্মকালে আম পাকে। মুকুলের শত্রু কুয়াসা, কাঁচা ফলের শত্রু শিলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখীর ঝড়। আম্রশাখা পুণ্যঘটের শোভা।

আম্রের স্বাদ অম্ল, অম্লমধুর কিংবা মধুর। পাকিলে—পীত-বা লোহিত বর্ণ। পুষ্টিকর উপাদেয় খাদ্য। গন্ধ রুচিকর। রস—প্রচুর একটি নাম রসাল। কোথায় প্রচুর জন্মে?

নেংড়া, বোম্বাই, ফজলী, গোপালভোগ, বড়শাহী ইত্যাদি আম্র উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। মালদহী ফজ্‌লী আকারে খুব বড় হয়।

আম হইতে আচার, আমসত্ব, কাসুন্দি, আমচুর ইত্যাদি নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হয়। কেমন করিয়া আমের কলম তৈরী হয়?

নারিকেল—তালজাতীয় বৃক্ষ—দীর্ঘাকার—শাখা-প্রশাখা নাই—গৃহের শোভা—পাতাগুলি লম্বা-লম্বা, মাথায় ফল ধরে। প্রথমে ফুল—তারপর মুচি বা গুটি—তাহাই পরিণত হইয়া ডাব। ঐ ডাব পরিণত হইয়া নারিকেল ফল। বাগ্‌ড়ার গোড়া হইতে কাঁধি নামে—এক এক কাঁধিতে অনেকগুলি ফল জন্মে—গাছ ৬০।৭০ ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হয়: ৮।১০ বৎসর ফলে।

ডাবের জল শীতল, সুপেয়, ঈষৎ লবণাক্ত ও স্নিগ্ধ। অনেক রোগে উপকারী—বিশেষতঃ অম্লরোগে। ডাবের শাঁস সুপাচ্য,—সুখাদ্য। ডাব পুণ্য-ঘটের শোভা। পরিণত হইলে ঝুনা বা দোমালা হয়। পরিণত নারিকেলের শাঁস শক্ত—জল বিস্বাদ। নারিকেলের শাঁস সুমিষ্ট—চিনি সহযোগে ইহা হইতে নানাপ্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত হয়। ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়, ঔষধে লাগে। ইহা হইতে তৈল প্রস্তুত হয়, টাট্‌কা নারিকেল তৈল ঘৃতের মত কাজ করে। পাতার শিরায় ঝাঁটা,—নারিকেল মালায় হুকা ও বোতাম,—ছোবড়ায় দড়ি, কাছি, গদি, পা-পোশ ইত্যাদি।

সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী দেশেই নারিকেল গাছ বেশি জন্মে, লবণাক্ত মাটিই নারিকেল গাছের পক্ষে উপযোগী। পূর্ব্ববঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজে অসংখ্য নারিকেল গাছ জন্মে। লাভজনক ব্যবসায়।

ধান্য—ধান্যবৃক্ষের বর্ণনা—কোন্ কোন্ জেলায় ধান্য জন্মে? ধান্যের চাষের জন্য কিরূপ মাটি, জলবায়ু ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন? ধানচাষের নিয়মাবলী। কত প্রকারের ধান্য আছে? কোন্ কোন্ ধান্য কোন

কোন্ সময় রোপণ করিয়া কোন্ কোন্ সময় কাটিতে হয়? ধান্তের সহিত বঙ্গদেশের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতির কি সম্বন্ধ? ধান্ত কিরূপে মাড়াই হয়? ধান্য হইতে কিরূপে চাউল তৈয়ারী হয়? ধান্যকে কি কি ভাবে আহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে পারা যায়? তুষ, ক্ষুদ, কুঁড়া ইত্যাদি ধান্যের বিভিন্ন অংশ কি কি কাজে লাগে? চাউল কোন্ কোন্ দেশের প্রধান খাদ্য? খড় আমাদের কি কাজে লাগে?

পাট—পাটগাছের বর্ণনা। কোথায় পাট জন্মে? পাট চাষের জন্য কিরূপ মাটি, জলবায়ু ও রৌদ্রের প্রয়োজন। কখন পাট লাগানো হয়? পাটচাষের সহিত দেশের স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ। পাটচাষের নিয়মাবলী। কত প্রকারের পাট আছে? পাটের কোন্ কোন্ অংশ কাজে লাগে? এই পাটচাষ ও পাটের ব্যবসায় কাহাদের হাতে আছে। পাট আমাদের দেশে কি কাজে লাগে? পাট বিদেশে যায় কেন? বিদেশে পাটকে কিরূপে কাজে লাগানো হয়? পাটচাষের সহিত দেশের মঙ্গলামঙ্গলের সম্পর্ক। বঙ্গদেশের পাটচাষ বন্ধ করা উচিত কিনা? পাটচাষের জন্য অন্যান্য ফসলের কি কি ক্ষতি হইতেছে। পাটের দর কিসে উঠে নামে?

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে রচনা লিখ

(১) ইক্ষু। (২) কমলানেবু। (৩) কলা। (৪) গোলাপফুল। (৫) গোধূম। (৬) আলু। (৭) চা। (৮) গ্রীষ্মের ফল। (৯) বসন্তের ফুল।

পারিবারিক উৎসব

(বালক আপন ভাষায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহানুষ্ঠানের বর্ণনা দিতেছে। দাদা সকলের না থাকিতে পারে। থাকিলেও তাহার বিবাহ হয়ত এখনো হয় নাই। যে কোন বৈবাহিক অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা থাকিলেই এইরূপ নিবন্ধ লেখা চলে। হিন্দুর অনুষ্ঠান ও মুসলমানের অনুষ্ঠান একরূপ নয়। মুসলমান বালকেরা ইহা হইতে একটা রচনার আদরা বা কাঠামো পাইবে—তাহাতে নিজেদের সমাজের আনুষ্ঠানিক অঙ্গগুলি সংযোগ করিয়া লইতে পারিবে।)

দাদার বিয়ের ব্যাপারে কয়দিন বড়ই আনন্দে কাটিয়াছে। গত ফাল্গুনের ১৩ই তারিখে দাদার বিবাহ হইয়া গেল। ১১ই গায়ে হলুদের দিন ঠিক হইয়াছিল। গায়ে-হলুদের ৩।৪ দিন আগে হইতেই নানা স্থান হইতে কুটুম্বেরা আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বহু সমবয়সী জুটিয়া গেল,—সকলে মিলিয়া বেশ উৎসব জমাইয়া তুলিলাম।

গায়ে-হলুদের দিন সকাল হইতে বাড়ীতে রোশনচৌকি বাজিতে লাগিল। নানা রকমের গোলমালে, হাঁক-ডাকে, কলরবে বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। এয়োরা হুলুধ্বনি করিয়া দাদার গায়ে হলুদ মাখাইয়া হাতে সুতা বাঁধিয়া দিল। গায়ে-হলুদের দিন অনেক লোকের নিমন্ত্রণ ছিল। আমরা পিচকারী ভরিয়া তাহাদের গায়ে রঙ দিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে খুব হাসাহাসি ও আমোদ হইতে লাগিল। সহসা দাদার আদর সম্মান অতিরিক্ত বাড়িয়া গেল। দাদা বাড়ী-বাড়ী আইবুড়-ভাতের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

১২ই ফাল্গুন খাওয়া-দাওয়ার পর বর বাড়ী হইতে যাত্রা করিল,—আমরা—বরযাত্রীর দল,—সঙ্গে চলিলাম। ট্রেনে গানবাজনা, কোলাহল ও স্ফূর্তি করিয়া বরযাত্রীর দল কাহাকেও ঘুমাইতে দিল না। পথে রাত্রিতে একটা ভোজন-পর্ব্ব ছিল। ষ্টেশনেই কয়েক ঝুড়ি খাবার কেনা হইল। এক একজনের খাওয়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম,—বাড়ীতে থাকিয়া এমন ক্ষুধার প্রকোপ কাহারও দেখি নাই।

প্রাতঃকালে আমরা বিবাহবাড়ীতে পৌঁছিলাম। বলা বাহুল্য,—কন্যাপক্ষের লোকেরা ষ্টেশন হইতেই আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বর পৌঁছিবামাত্র তাহাদের বাড়ীতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। বর বরাবর তাঁহাদের বাড়ীতেই উঠিল না। বরপক্ষের লোকের জন্য ভিন্ন একটি বাড়ী ঠিক করা ছিল, সেখানে আমাদের থাকিবার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমাদের যাওয়ামাত্র হৈচৈ পড়িয়া গেল। চা-চা, ডাব, শরবৎ, তামাক-তামাক, সিগারেট, পান ইত্যাদি চীৎকার শোনা গেল। সারা পথ যাঁহারা ছ্যাবলামি করিতেছিলেন, তাঁহারা সহসা গম্ভীর হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

এই বাড়ীতেই আমাদের দিনের বেলাকার আহারাদির ব্যবস্থা ছিল। এখানে বিবাহের নান্দীমুখ হইল এবং আমাদের পক্ষ হইত অধিবাসের ডালা পাঠানো হইল। বরযাত্রীদের মধ্যে একজন রুক্ষ মেজাজের লোক ছিলেন, একটু ত্রুটি হইলেই তিনি রাগিয়া উঠিতেছিলেন, আমাদের তাহাতে বড় লজ্জাবোধ হইতেছিল।

সন্ধ্যার সময় দাদাকে বরবেশ পরানো হইল। বরযাত্রীরাও বাবু সাজিয়া চাদর ও রুমালে 'খোস্‌বো' ছড়াইয়া ছড়ি হাতে বরের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-বাড়ীতে পৌঁছিলেন। যথাকালে কন্যা ছাদনাতলায় আসিলেন—স্ত্রীলোকদের হুলুধ্বনিতে গৃহ মুখর হইয়া উঠিল। বরযাত্রীদের সঙ্গে কন্যাযাত্রীদের কি লইয়া একটা তর্কাতর্কি হইতে লাগিল। পুরোহিতে পুরোহিতে মন্ত্রপাঠ লইয়া এবং পরে দক্ষিণা লইয়াও ঝগড়া বাধিয়া গেল। যাহাই হউক, সকল প্রকার তর্কাতর্কি ও গোলমালের মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল। রাত্রিতে প্রচুর আহারাদি যোগাড় ছিল। বিবাহান্তে বর-বধূ বাসরঘরে গেলেন, আমরা আমাদের বাসায় ফিরিলাম।

পরদিন আমরা বর-বধূকে লইয়া মহাকোলাহলে স্টেশনে আসিলাম। বৌদিদির ছোট দাদা আমাদের সঙ্গে আসিলেন।

১৫ই ফাল্গুন দাদার কুশণ্ডিকা হইল। কুশণ্ডিকাই নাকি খাঁটি বিয়ে—বিয়ের রাত্রে শুধু কন্যাসম্প্রদান। নূতন বৌ দেখিয়া সকলেই সুখী হইল। বৌএর বয়স লইয়া গভীর গবেষণা আরম্ভ হইয়া গেল। বৌদিদির স্বাস্থ্য খুব ভাল,—সে জন্য বয়স ঠিক করা একটু কঠিনই বটে। দাদার শ্বশুর কি কি গহনা দিয়াছেন, অনেকে তাহারই হিসাব লইতে লাগিল।

১৬ ফাল্গুন বৌভাত। সেই দিন আমাকে খুব খাটিতে হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতে পুষ্করিণীতে মাছ ধরাইবার জন্য মোতায়েন থাকিতে হইয়াছিল,—তারপর দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত পরিবেষণ করিতে হইয়াছিল। বৌদিদি একটি থালায় ভাত লইয়া একমুঠো করিয়া সেই ভাত কুটুম্বদের সকলের পাতে দিলেন, তাহাতেই সকলের নূতন বৌ-এর হাতে খাওয়া হইল। তাহারই নাম **বৌভাত**।

তিন দিন পরে দাদা বৌদিদিকে লইয়া শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেলেন। কুটুম্বেরাও একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। আমোদের দিন ফুরাইয়া গেল। সপ্তাহখানেক ধরিয়া মনটা কেবল অবসন্ন ও ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিল; তারপর আবার আমাকে লেখা-পড়ায় মন দিতে হইল।

দুর্গোৎসব

প্রতিমা গঠন—বোধন—উত্তেজনা ও উৎসাহ—ষষ্ঠীর ঘট ভরা—প্রতিমার সাজসজ্জা ও পূজার আয়োজন—সপ্তমী পূজা—পূজার উপকরণ—বাদ্য, বলিদান—আরতি—লোক-সমাগম—অষ্টমীপূজা—মহাষ্টমীপূজা—নবমীপূজার ধুম—বহুলোকের নিমন্ত্রণ—ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন। বিজয়াদশমী—বিসর্জ্জন—বাঁইচ—সন্ধ্যায় প্রণাম-আলিঙ্গন।

চারিদিকে শরতের শোভা—প্রবাসীদের গৃহে আগমন—সকলেরই নূতন বেশভূষা—পূজার উপহার—নানাপ্রকারের আমোদ উৎসব।

মোহর্‌রম

শিয়াশ্রেণীর মুসলমানদের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহার ইতিহাস,—[হজরত মোহাম্মদের দুই দৌহিত্র হোসেন ও হাসান। হজরত আলীর তিরোধানের পর ক্রমে মাবিয়া,—মাবিয়ার পর এজিদ, দামাস্কের খলিফাপদের অধিকারী। এজিদ অত্যাচারী, পাষণ্ড। এমাম হোসেন তাহাকে খলিফা বলিয়া মানিলেন না। ফলে যুদ্ধ বাধিল কারবালার মাঠে। জলাভাবে তৃষ্ণার অসহ্য কষ্ট। হোসেনের ভ্রাতা হাসান পূর্ব্বেই এজিদের ষড়যন্ত্রে বিষপ্রয়োগে নিহত। হোসেন একা অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করিয়া সবংশে শহীদ হইলেন।]

এই শোচনীয় ঘটনাকে বৎসর বৎসর স্মরণ করিবার জন্য ও ধর্ম্মপ্রাণ এমাম পরিবারের উদ্দেশে শোক-প্রকাশার্থ মোহর্‌রমের অনুষ্ঠান।

মোহর্‌রম মাসের ১০ই তারিখকে আশুরা বলে। ঐ দিন রোজা রাখিতে হয়,—তারপর কয়েকদিন ধরিয়া শোক-প্রকাশ। তাজিয়া গঠন—তাজিয়া লইয়া শোভাযাত্রা, বাদ্যোদ্যম—কারবালা যুদ্ধের অনুকৃতি—লাঠিখেলা—তরওয়ালখেলা,—'হায় হাসান,—হায় হোসেন,' বলিয়া আর্ত্তনাদ। এই শোকপর্ব্বে কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদ দোষাবহ।

নিম্নলিখিত উৎসবগুলির বর্ণনা লিখ—

(১) সরস্বতীপূজা। (২) দোলযাত্রা। (৩) ইদল্‌ফেতর। (৪) বড়দিন। (৫) রথযাত্রা। (৬) ঢাকার জন্মাষ্টমী। (৭) নবদ্বীপ-শান্তিপুরের বৈষ্ণব উৎসব। (৮) বেলুড় মঠের উৎসব।

আপন গ্রাম

আপন গাঁয়ের মাটি
সোনার লঙ্কা, গোলকুণ্ডা চেয়েও জানি খাঁটি।

আম-নারিকেলের বাগান ও বাঁশবনে ঘেরা আমাদের ছোট গ্রামখানি ভাগীরথীতীর হইতে ৪।৫ মাইল ও রেলের ষ্টেশন হইলে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা গ্রামের পাশ দিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে এই রাস্তা বড় দুর্গম হয়। তখন লোকের কষ্টের অবধি থাকে না। গ্রামে একটি ছোট ডাকঘর, একটি মাইনর ইস্কুল, দুইটি পাঠশালা ও একটি টোল আছে। এই গ্রামের গাম্য দেবতা দুইটি,—পূর্ব্ব-পাড়ায় আছেন চণ্ডী, পশ্চিম-পাড়ায় আছেন ধর্ম্মরাজ। মহাজ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় খুব ঘটা করিয়া ধর্ম্মরাজের বাৎসরিক পূজা হয়—এই উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে। এক সপ্তাহ ধরিয়া গ্রামে ধূমধাম চলিতে থাকে। মেলা শেষ হওয়ার পর কিন্তু তাহার ঠেলা সামলাইতে দুই তিন মাস লাগে। গ্রামে ওলাউঠা আরম্ভ হইয়া যায়।

গ্রামে ঢুকিতেই একটি ঝুরি-ঝোলা বটগাছের তলায় একটি পীরের আস্তানা আছে। গ্রামের মধ্যে একটি পাকা মসজিদ আছে।

গ্রামটিতে ৩০ ঘর ব্রাহ্মণ ও ১৫ ঘর কায়স্থ আছে। ইহা ছাড়া, অনেক গোপ, সদ্গোপ, তিলি ইত্যাদি জাতির লোক আছে। ইহা পশ্চিম বঙ্গের ছোট গ্রাম, এই গ্রামে ৮।১০ ঘরের বেশি মুসলমান নাই। বেশির ভাগ লোকের উপজীবিকা চাষ। ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাও মুনিষ-কৃষাণ রাখিয়া নিজেদের জমির চাষ আবাদ করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বিদেশে চাকুরিও করেন। ২।৪ ঘর করিয়া তাঁতী, কামার, কুমার, ছুতার, নাপিত ও শাঁখারী আছে—তাহারা আপন আপন জাত-ব্যবসা চালায়; একজন ভাল কবিরাজ আছেন। একজন ডাক্তারও (সব এসিষ্টাণ্ট

সার্জ্জন) আছেন। ইহা ছাড়া ৩।৪ জন হাতুড়ে চিকিৎসকও আছে। ধানই হইতেছে এই গ্রামের চাষের প্রধান ফসল ও চাষীর আসল সম্বল। গ্রামের মাঠে ধান ছাড়া আখ, আলু, তরিতরকারি ও নানাপ্রকার চৈতালী ফসলও জন্মে। এ গ্রামে বহুপ্রকার ফলের গাছ আছে। আম, কাঁটাল, বেল, কলা, নারিকেল, লচু, জাম ও তাল প্রচুর পরিমাণেই জন্মে। গ্রামের মাঠে ফুটি, তরমুজ, কাঁকুড় ও শাঁখ-আলুও যথেষ্ট ফলে। গ্রামের লোকেরা স্থানীয় হাটে মাঠের ফসল ও ফল-মূল কতক কতক বিক্রয় করে,—বেশির ভাগ, মহকুমার বাজারে বেচিবার জন্য লইয়া যায়।

গ্রামে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ লাগিয়াই আছে। গ্রামে ঘটা করিয়াই দুর্গোৎসব হয়। গ্রামে কুমাররাই প্রতিমাগুলি গড়ে। শিবচতুর্দ্দশীর দিন ধর্ম্মরাজের মন্দিরে উৎসব হয়,—গাজনেও খুব ধুম হয়। প্রত্যেক অমাবস্যায় চণ্ডীর মন্দিরে পূজা হয়। কালীপূজাতেও ঘটা কম হয় না। মনসাপূজায় অনেক বলিদান হয়। গোস্বামী-পাড়ায় দোল, ঝুলন, রাস ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে উৎসব হয়। মোহর্‌রমেও কম ঘটা হয় না। হিন্দুরাও এই অনুষ্ঠানে দলে দলে যোগদান করে। গ্রামে কবিগানের চর্চ্চা আছে, সখের যাত্রার দল আছে, একটি সংকীর্ত্তনের দলও আছে। পূজা-পার্ব্বণে ঐ সব দলের গান হয়। ভিন্ন গ্রামের লোকেরাও শুনিতে আসে। এই গ্রামের রায়বেঁশের নাচও খুব প্রসিদ্ধ। বাগ্দীদের মধ্যে কয়েকজন নামজাদা রায়বেঁশে আছে।

গ্রামে দুইটি ভাল পুষ্করিণী আছে, একটি দীঘিও আছে। দীঘিটি চণ্ডী-তলার নিকটেই। সেজন্য উহাকে 'চণ্ডীর দীঘি' বলে। এই দীঘিটিতে প্রচুর পদ্ম ফোটে। গ্রামে ফলের গাছের মত ফুলের গাছও অজস্র। কামিনী, শিউলী, আউচ, বকুল, মালতী ও কাঠমল্লিকা

ফুলের গাছের সংখ্যাই বেশি। গ্রামের পথগুলি ছায়াশীতল। শরৎ ও হেমন্তে গ্রামের মাঠে ধানের ক্ষেতের শোভা হয় চমৎকার। শীতের মাঠে সরিষা ফুলে তেল-হলুদের উৎসব লাগিয়া যায়।

গ্রামে কতকগুলি অসুবিধাও আছে। গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি পচা ডোবা আছে,—মাঝে মাঝে ঝোপ-জঙ্গলও আছে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে লোকে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। গ্রীষ্মকালে সাপের ভয় হয়। তিন মাইল দূরে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়,—অত দূরে ছেলেদের হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হয়। গ্রীষ্মকালে পানীয় জলেরও অভাব হয়।

গ্রামবাসীরা স্বল্পে সন্তুষ্ট। সেইজন্য তাহারা মনে করে, তাহারা যথেষ্ট সুখেই আছে। কিন্তু মানুষ যে কত বেশি সুখে থাকিতে পারে—তাহা তাহারা জানেও না। কেহই উন্নতির জন্য কোন চেষ্টাই করে না,—উন্নতি যে হইতে পারে, স্বপ্নেও ভাবে না।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে রচনা লিখ—

১। বঙ্গদেশ, ২। আপন জেলা, ৩। আপন গৃহ-পরিবার, ৪। আপন বিদ্যালয়, ৫। আপন জেলার প্রধান নগর। [নিজের অভিজ্ঞতা ও ভূগোলের সাহায্যে লিখ।]

গ্রামের খেলাধুলা

ব্যায়ামের যে প্রয়োজন আছে, আমাদের পাড়াগাঁয়ের লোকেরাও তাহা বেশ বুঝে; সেজন্য যে সব খেলায় যথেষ্ট ব্যায়াম হয়, সেইরূপ অনেক প্রকারের খেলা পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে। সব দেশেই যেমন ছেলেদের আমোদের জন্য খেলার ব্যবস্থা আছে, আমাদের দেশের পল্লীগ্রামেও তেমনই আছে।

আজকাল এ দেশে বিদেশী খেলার আমদানী হওয়ার পর দেশী খেলাগুলির আর তেমন আদর নাই। বিদেশী খেলার সরঞ্জামের দাম বড় বেশি। পাড়াগাঁয়ে খেলাগুলিতে সাজসরঞ্জামের দরকার হয় না—সে-জন্য খরচ একেবারেই নাই।

পাড়াগাঁয়ের খেলার মাঠে ভদ্র-ইতর—সকলে একসঙ্গে যোগ দিতে পারে। খেলার মাঠে জাতিভেদ নাই। ব্রাহ্মণবাগ্দী সকলেই একই খেলায় মাতিতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রামে গিয়া গ্রামের চাষী লোকদের সঙ্গে কপাটি খেলিতেন।

গ্রামের খেলাধূলার মধ্যে **কপাটি** বা হাডু-ডুডু, **দাঁড়িবাঁধা, গোল্লাছুট, কানামাছি, চোর-চোর, গুলিদাণ্ডা** ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে কপাটি খেলাই প্রধান। এই খেলায় সর্ব্ব শরীরের যথেষ্ট ব্যায়াম হয়। **দম বন্ধ রাখার** জন্য ফুসফুসের ব্যায়াম হয়, তাহাতে ফুস্‌ফুস্ দৃঢ় হয়। শরীরে যাহার যত বল—আর যে যত দম বন্ধ রাখিতে পারে—এই খেলায় তাহার ততই কৃতিত্ব।

গুলিদাণ্ডা (দেশী] ক্রিকেট) খেলায় 'দাণ্ডার' সাহায্যে কাঠের গুলি ছুড়িতে হয়। যে যত বেশি দূরে গুলি ছুড়িতে পারে, সে তত ভাল খেলোয়াড়। এ খেলায় দৌড়ের শক্তি ও কব্জির জোর বাড়ে।

ছিয়াদাঁড়ি বা দাঁড়ি-বাঁধাও দুইটি দলের খেলা। অনেকগুলি ঘর কাটিয়া এই খেলা আরম্ভ হয়। দলের একজনকে ছুঁইতে পারিলেই সমস্ত দলই পরাজিত হয়। পল্লীর অধিকাংশ খেলায় দৌড়ের শক্তি বাড়ে, ক্ষিপ্রতা ও সতর্কতার অভ্যাস হয়।

ঝুলঝাঁপি নামে একটি খেলা আছে। গাছে চড়িয়া এই খেলা খেলিতে হয়। ইহাতে তাড়াতাড়ি গাছে চড়া ও গাছের ডাল হইতে

লাফ দেওয়া অভ্যাস হয়। স্নানের ঘাটে সন্তরণের বৈচিত্র্য ও প্রতিযোগিতাও পল্লীবালকদের একপ্রকারের খেলা।

এই সকল খেলায় কোন খরচ নাই, অথচ এইগুলিতে শারীরিক উন্নতি যথেষ্ট হয়। তাহা ছাড়া, এ সকল খেলায় ছেলেদের চরিত্রগঠন হয়, সকলের মধ্যে বন্ধুতাও জন্মে। আমাদের পল্লীগ্রাম হইতে, এই সকল খেলা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে এবং তাহাদের বদলে বিলাতী খেলা ঢুকিতেছে,—দেখিয়া দুঃখ হয়। তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেরাও যাহারা ইংরাজী ইস্কুলে পড়ে, তাহারা বিলাতী খেলাই খেলে। কেবল নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত বালক যুবকদের মধ্যেই দেশী খেলাগুলি চলিতেছে। ইহাতে গ্রামের শিক্ষিত লোকের ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের আত্মীয়ভাব একেবারেই চলিয়া যাইতেছে। নিম্ন সমাজের বালকগণ ভদ্রশ্রেণীর বালকগণের সঙ্গে মিশিয়া যে কতকটা সভ্যতা শিখিত, তাহার পথও রুদ্ধ হইতেছে।

অনুশীলনী

১। গ্রাম্য পাঠশালার বর্ণনা কর। ২। একটি গ্রাম্য দীঘির বর্ণনা কর। ৩। নগরের একটি প্রদর্শনীর বর্ণনা লিখ। ৪। নদীদৃশ্যের বর্ণনা কর। ৫। গ্রাম্য দেবালয়ের উৎসবাদি বর্ণনা কর। ৬। গ্রামের হাটের বর্ণনা কর। ৭। একটি রেলওয়ে ষ্টেশনের বর্ণনা কর। ৮। একটি নগরের বাজারের বর্ণনা দাও। [নিজের অভিজ্ঞতা হইতে লিখ।]

স্বর্ণ

দাদা—আচ্ছা নরেন, তুমি সোনা দেখেছ?

নরেন—হাঁ দেখেছি, মা, দিদি ও পিসীমার গায়ের গয়নাগুলোই ত-সোনার তৈরী।

দাদা—গয়না ছাড়া আর কিছুতে সোনা দেখ নি ?

নরেন—দেখেছি, সোনার মোহর দেখেছি। বাবার জামার বোতাম, জামাইবাবুর ঘড়ি, দিদির সিঁদুরের কৌটা, কাকার একটা দাঁত, তোমার ফাউণ্টেন পেনের নিব,—এ সমস্তই সোনার তৈরী।

দাদা—এ সোনা কোথা হ'তে পাওয়া যায় ?

নরেন—সোনা খনিতে পাওয়া যায়! তাই নয় কি ?

দাদা—হাঁ তাই, কিন্তু খাঁটি সোনা কোথাও পাওয়া যায় না। তার সঙ্গে অনেক খাদ মিশানো থাকে, পারার সঙ্গে গলিয়ে খাদ বাদ দিতে হয়। আচ্ছা, সোনার সাধারণ পরিচয় কিছু জান ?

নরেন—না, তা'ত জানি না।

দাদা—সোনা একটি **মূলধাতু**। জলের চেয়েও উনিশ গুণ ভারী।

নরেন—তার মানে কি বুঝলাম না, বুঝিয়ে বল।

দাদা—যে পাত্রে জল এক সের ধরে, তাতে সোনা গলিয়ে ঢাললে তার ওজন হবে উনিশ সের। এক শুধু **প্লাটিনাম** ছাড়া সোনার মতন এত ভারী আর কিছু নেই। এক সরিষা-প্রমাণ সোনার ৯ ইঞ্চি × ৬ ইঞ্চি পাত হয় কিংবা ২৩৫ হাত লম্বা তার তৈরী হয়। সোনায় মরচে ধরে না। সোনা সহজে ক্ষয় পায় না,—এর চেক্‌নাই-জৌলুস সহজে নষ্ট হয় না। সোনাকে সহজে গলানো যায় এবং এর উপর অনেক কারু-কার্য্য ফলানো চলে। আচ্ছা, এখন বল দেখি, সোনার দামই এত বেশি কেন ?

নরেন—দেখ্‌তে সুন্দর ব'লে, আর সহজে ক্ষয় পায় না ব'লে।

দাদা—হাঁ, তা বটে। কিন্তু আরও কারণ আছে। খনিতে খুঁড়লেই ত সোনা কয়লার মত রাশ-রাশ পাওয়া যায় না, অনেক চোঁড়াচুঁড়ি, অনেক খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে কিছু মেলে। তাল-তাল সোনা পাতালে

ঢুকলেও পাওয়া যায় না ; তিল-তিল ক'রে সংগ্রহ করলে তবে তালে দাঁড়ায়। অনেক সন্ধানের পর অনেক আয়াসে মিলে, সে জন্য এর এত আদর। এই জন্য এবং আগে যে যে গুণের কথা বল্‌লাম সে জন্য সোনা দুর্মূল্য ; আচ্ছা, সোনা সব থেকে কোন্ কাজে বেশি লাগে, বল ত ?

নরেন—গয়না তৈরী করতে বোধ হয়।

দাদা—না, গয়না গড়ানো হয় শোভার জন্য। আগে আমাদের দেশে লোক ধনসম্পত্তি কি ক'রে নির্ব্বিঘ্নে রাখবে—ঠিক করতে না পেরে গয়না গড়িয়ে রাখত। সোনার প্রধান কাজ কি, বল। ২২ ভাগ সোনার ২ ভাগ তামা মিশিয়ে গিনি তৈরী হয়। এই গিনি এ দেশে না চল্‌লেও অনেক দেশে চলে। সোনা দিয়েই দুনিয়ার ধন-দৌলতের দাম ঠিক করা হয়। ধন-দৌলতকে নিরাপদে রাখতে হ'লে বা এক ঠাঁই হ'তে অন্য ঠাঁয়ে নিয়ে যেতে হ'লে মুঠোর মধ্যে অথবা ছোট আকারের মধ্যে আনা দরকার। সোনার দ্বারা সে কাজ সহজে হয়, কাগজের নোট ও ব্যাঙ্কের চেকের দ্বারা সে কাজ আরও সহজে হচ্ছে। কিন্তু এক দেশের টাকা বা চেক অন্য দেশে ত চলে না,—সে ক্ষেত্রে সোনা ছাড়া উপায় কি ? দেশবিদেশে কারবারের লেন-দেন সোনার সাহায্যেই চল্‌ছে। স্বর্ণ-শিল্প কাকে বলে, বলত ?

নরেন—স্বর্ণকাররা সোনার উপর নানা রকম কারুকার্য্য কলায়, মণিমাণিক্য খচিত করে—একেই বলে স্বর্ণশিল্প। ধনিলোকদের অনেক বিলাসদ্রব্য স্বর্ণ-শিল্পের সৃষ্টি।

দাদা—হাঁ, তা ছাড়া, সোনার পাত ও পারার সাহায্যে অন্য ধাতুতে গিল্‌টি করা যায়। সোনার সাহায্যে রূপার জরিকে উজ্জ্বল করা যায়। আচ্ছা, সোনার খনি কোথায় আছে ?

নরেন—ব্রেজিল, পেরু, মেক্সিকো, সাইবেরিয়া, কালিফোর্নিয়া,

অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, মহীশূর ইত্যাদি। তা ছাড়া, আফ্রিকার কোন' কোন' নদীর বালুতে—

দাদা—থাক, আর বল্‌তে হবে না। এইবার স্বর্ণ সম্বন্ধে প্রবন্ধটা লেখ।

লৌহ

সাধারণ পরিচয়। ধাতু, খনিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না, গলাইয়া ময়লা মাটি বাহির করিয়া লইতে হয়। আগুনের অতিরিক্ত তাপে লাল হইয়া তরল হয়। পিটাইয়া পাত ও সরু তার তৈয়ারী করা যায়। লৌহে শীঘ্র মরিচা ধরে।

লৌহের ব্যবহার। লৌহের নানাপ্রকারের ব্যবহার করিতে শিখিয়াই মানুষ সভ্য হইয়াছে। মানুষের সমস্ত উন্নতি লৌহের উপর নির্ভর করিতেছে। রেল, ইঞ্জিন, সাঁকো, জাহাজ, যুদ্ধের সরঞ্জাম ও সব রকমের কলকজা লৌহের তৈয়ারী। বর্ত্তমান সভ্যতা যেন লৌহরূপেই অবস্থিত।

লৌহ তিন প্রকার—ঢালা, পেটা, ইস্পাত। **ঢালা লোহায়**—গ্যাস বা জলের নল, রেলিং, বড় বড় চাকা, **পেটা লোহায়**—কড়া, বেড়ী, হাতা, দা, কুড়ুল, ইত্যাদি; **ইস্পাতে**—ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর ও অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী হয়। কোন কোন ঔষধেও লৌহের প্রয়োজন হয়।

প্রাপ্তিস্থান। নরওয়ে, সুইডেন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে লৌহের খনি আছে। আমাদের দেশে আসানসোল মহকুমা ও জামসেদপুরে লৌহের কারখানা আছে। ইংলণ্ডে লোহার জিনিস সব চেয়ে বেশি তৈয়ারী হয়।

আজকালকার ইমারত লৌহের উপর নির্ভর করে।

কাচ

বালুকা, ক্ষার ও আগুন এই তিনের মিলনে কাচ। স্বচ্ছ, চিক্কণ, উজ্জ্বল, শীতল। খুব শক্ত, কিন্তু সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। হীরা ছাড়া

কাটা যায় না। আগুনের প্রখর তাপে গলিয়া যায়। তখন যে কোন' রঙ মিশানো যায়, যে কোন' ছাঁচে ঢালা যায়।

কাচের মধ্য দিয়া আলো যাতায়াত করিতে পারে, তাপ ও বিদ্যুৎ যাতায়াত করিতে পারে না। কাচ ধাতুর মত বিকৃত হয় না।

কাচে শিশি, বোতল, আলোর ডোম, গেলাস, সার্সী, নল, ঝাড়লণ্ঠন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অনেক জিনিস তৈয়ারী হয়। কাচের এক পিঠে পারা মাখাইলে তাহাতে সকল জিনিসের স্পষ্ট অবিকল প্রতিবিম্ব পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় কাচের দ্বারা দর্পণ তৈয়ারী হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক সভ্যতা-বিস্তারে কাচ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

কয়লা

কৃষ্ণবর্ণ খনিজ পদার্থ। ইহাতে সহজে আগুন ধরে এবং সে আগুনের তেজ খুব বেশি। এক-একটি গোটা বনভাগ মাটির তলায় চাপা পড়িয়া হাজার হাজার বৎসর পরে কয়লার খনিতে পরিণত হয়।

ভারতবর্ষ, চীন, ব্রিটেন, জার্ম্মানী, কানাডা ইত্যাদি দেশে কয়লার খনি আছে। ভারতবর্ষে—মানভূম, হাজারিবাগ, বর্দ্ধমান, পালামৌ ইত্যাদি জেলা উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর কয়লা সরবরাহ করে।

কয়লায় জাহাজ, রেলগাড়ী ও সর্ব্বপ্রকারের কল চলে। কয়লার সাহায্য ব্যতীত লৌহ কাজে লাগে না। কয়লার দ্বারা শহরের লোকের রন্ধন চলে, কয়লা হইতে উৎপন্ন গ্যাসে আলো জ্বলে, কয়লার ক্বাথ হইতে নানাপ্রকারের রং, তার্পিন তৈল ও নানা প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উহাতে রাজপথ তৈয়ারী হয়। কয়লার ব্যবহার যে দেশে যত বেশি, সে দেশ তত সভ্য।

জল

তরল—স্বচ্ছ—স্বাদহীন—গন্ধহীন—বর্ণহীন—শীতল—চঞ্চল। জমিয়া বরফ হয়, তাপ পাইলে বাষ্প হয়। বাষ্প হইতে মেঘ—মেঘ হইতে বৃষ্টি। সাগর, নদ, পুকুর, কূপ, ঝরণা—ইহাদের জলের মধ্যে পার্থক্য। পানীয় জল,—তাহার শোধন, ব্যবহার—কৃষিকার্য্যে, রন্ধনে, ইঞ্জিনে, বৃক্ষরক্ষায়, নৌকাজাহাজ-চালনায়, স্নানে, ময়লা পরিষ্কারে। পৃথিবীর তিনভাগ জলময়। জলজন্তু—জলের গাছপালা। জলে বিপদ্ ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত বস্তুগুলি সম্বন্ধে যাহা জান রচনার আকারে লিখ :—

(১) চিনি। (২) কাষ্ঠ। (৩) রেশম। (৪) তৈল। (৫) কেরোসিন। (৬) মণিমুক্তা। (৭) চামড়া। (৮) কাগজ।

নিম্নলিখিত নিবন্ধটির বাক্যগুলিকে বিশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া দেওয়া হইল—যথাক্রমে সাজাও—

আমাদের দেশে গোদুগ্ধ ও মহিষদুগ্ধেরই আদর। আমেরিকা ও ইউরোপের লোক গো-পালন জানে,—দুগ্ধের মর্য্যাদা বোঝে। আমাদের দেহধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে যে উপাদানের প্রয়োজন, দুগ্ধে তাহাদের সমস্তই আছে। মেরুদেশে বল্লাহরিণীর, মরুদেশে উষ্ট্রীর, তিব্বতে ছাগীর ও মধ্য এশিয়ায় ঘোটকীর দুগ্ধ পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। দুগ্ধ কেবল স্বাস্থ্যের ও দেহপুষ্টির জন্য হিতকর নয়, খাদ্যপানীয় হিসাবেও অতি উপাদেয়।

পশুমাতা আমাদের ধাত্রীমাতা। আমরা গোজাতির যথাসাধ্য যত্ন করিতে জানি না। দুগ্ধ কেবল রোগীর পথ্য নয়—ভোগীরও পরম ভোগ্য,—যোগীরও আদরের বস্তু। শৈশবে আমরা পশু-দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করি। তাহাদের উপযুক্ত খাদ্যপানীয়েরও ব্যবস্থা করি না। এক ভাগ দুগ্ধে তিন ভাগ জল মিশাইয়া দুধের তৃষ্ণা আমরা জলে

বা ঘোলে মিটাইতেছি। ঐ দুই মহাদেশের একটি গাভী সচরাচর যে পরিমাণ দুধ দেয়—তাহা আমাদের এক গোয়াল গাভীতেও দেয় না। এদেশে গো-পালন ও গো-চিকিৎসা সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। মানুষ যে যে পশুর দুগ্ধ পান করে, তাহাদের মধ্যে গো, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ ও অশ্বের নাম উল্লেখযোগ্য। তাহাদের বাসগৃহের দুর্দ্দশার অবধি নাই।

আজকাল নির্জ্জলা দুধ একটা দুর্লভ সামগ্রী। বৃদ্ধের পক্ষে দুগ্ধই প্রধান খাদ্য। আরও নানা কারণে এদেশে গোরুগুলি দলে দলে ভাগাড়ের দিকেই চলিয়াছে। গোচর মাঠকেও আমরা আবাদী জমিতে পরিণত করিয়াছি। দুগ্ধ হইতে ঘোল, দধি, ক্ষীর, সর, মাখন, পনীর, ঘৃত, রাবড়ি ইত্যাদি এবং অন্যান্য বহু রাজভোগ্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত হয়। হিন্দুরা গাভীকে দেবতার মত ভক্তি করে। পানের জন্য গোদুগ্ধই প্রশস্ত। যে দেশের লোক জীবনে বিশেষতঃ শৈশবে, প্রচুর দুগ্ধ পান করিতে পায় না, সে দেশের লোক দুর্ব্বল ও অলস হয়। সেজন্য আর কোন খাদ্য না খাইয়া কেবল দুগ্ধের উপর নির্ভর করিয়াই মানুষ দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। মহিষদুগ্ধ হইতে উৎকৃষ্ট দধি ও ঘৃত জন্মে। পশুর দুগ্ধ না হইলে চলে না। দুগ্ধকে নানাভাবেই সুখাদ্যরূপে ব্যবহার করা চলে। যাহারা কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকে, তাহারা ক্রমে ছাগলের দলভুক্ত হয়। পয়স্বিনী গাভী এদেশে যেমন দুর্লভ—তেমনি দুর্ম্মূল্য। দুগ্ধ কিসে বৃদ্ধি পায় তাহাও আমরা জানি না। দুগ্ধ লঘুপাচ্য খাদ্য, সেজন্য রোগী ও দুর্ব্বল লোকের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর। যে সকল শিশু দুগ্ধ খাইতে পায় না, তাহাদের দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি হয় না।

সীতা

ভারতের আদর্শ পতিব্রতা সাধ্বী সতী সীতার মত ভাগ্যবতী কে? তাঁহার মত অভাগিনীই বা কে? রাজন্যগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহা-

পুরুষ **রাজর্ষি জনক** তাঁহার প্রতিপালক। রাজর্ষির কত আদরের কন্যা এই সীতা। এই সীতাকে বিবাহ করিবার জন্য বড় বড় রাজারা জনকের বাড়ীতে হরধনু ভাঙ্গিতে আসিয়াছিলেন। শেষে সীতা যাঁহাকে স্বামিরূপে লাভ করিলেন—তাঁহার মত সর্ব্বগুণের আকর, মহাবীর যুবরাজ সেকালে ভারতবর্ষে কেহ ছিলেন না। এমন পতিভাগ্য কাহার হয়? **দশরথের** মত শ্বশুর, **কৌশল্যার** মত শাশুড়ী, **লক্ষ্মণ-ভরতের** মত দেবর, **হনুমানের** মত আজ্ঞাবহ অনুচর, **কোশল**-রাজ-সংসারের মত আদর্শ পতি-সংসার কাহার ভাগ্যে ঘটে? **রামচন্দ্রের** পত্নীপ্রেমের কি তুলনা আছে? সীতাকে হারাইয়া রামচন্দ্র বনে বনে বালকের মত কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সেকালে একমাত্র রামচন্দ্র ছাড়া সকল রাজারই একের বেশি পত্নী ছিল। রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াও দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নাই। ইহা কি সীতার পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা? **লবকুশের** মত বরেণ্য পুত্র, এবং কুলপতি **বাল্মীকির** মত শরণ্যই বা কাহার ভাগ্যে ঘটে। তাই বলি সীতার মত ভাগ্যবতী কে?

সীতার মত **অভাগিনীই** বা কে? এমন সুখের রাজসংসার তাঁহার ভাগ্যে সহিল না। রাজার আদরের নন্দিনী, রাজপুত্রবধূ গেলেন বনবাস করিতে। সেখানে গিয়াও নিস্তার নাই। রাক্ষসে লইয়া গেল হরণ করিয়া সমুদ্রপারে। সেখানে অশোকবনে বন্দিনী, চেড়ীগণের দ্বারা লাঞ্ছিত। রাবণের খড়্গ সর্ব্বদাই উদ্যত। রামচন্দ্র বড় কষ্টে সীতাকে উদ্ধার করিলেন। তারপর **অগ্নিপরীক্ষা**। সে কি দুঃসহ অবমাননা। পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া সীতা রাজপুরীতে রাণী হইয়া ফিরিলেন। কিন্তু রাণীর সুখ ও স্বামিসুখ তাঁহার সহিল না। সাধ্বী সীতার নামে পাষণ্ডেরা মিথ্যা অপবাদ রটাইল এবং বড় অঘটন

ঘটাইল। তাঁহার সসত্ত্বা অবস্থাতেই বনে যাইতে হইল। তাপসী হইয়াই তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কাটিল। আবার পরীক্ষা!—এবার অযোধ্যার রাজসভায় তেজস্বিনী সীতা অবমাননা সহ্য করিতে না পারিয়া পরম সুখের রাজসংসার ফেলিয়া চিরবিদায় লইলেন। তাই বলি, সীতার মত হতভাগিনীই বা কে? সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দুই-এ মিলিয়া সীতাকে নারী-জগতে আদর্শ মহিলা করিয়া তুলিয়াছে।

নিম্নলিখিত পৌরাণিক চরিত্রগুলির সম্বন্ধে যাহা জান লিখ :—

(১) কর্ণ। (২) অর্জুন। (৩) ভীষ্ম। (৪) লক্ষ্মণ। (৫) ভক্ত হনুমান। (৬) সুভদ্রা। (৭) সতী। (৮) শ্রীকৃষ্ণ। (৯) বাল্মীকি। (১০) বশিষ্ঠ।

[কৃত্তিবাস ও কাশীরামের কাব্য ঘরে ঘরেই ত আছে। এ নিবন্ধগুলি ঐ বই দুইখানির সাহায্যেই লেখা চলে]।

নিম্নলিখিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিখ্যাত পুরুষ সম্বন্ধে রচনা লিখ :—

(ক)—(১) অশোক। (২) হর্ষবর্দ্ধন। (৩) শিবাজী। (৪) রাণাপ্রতাপ। (৫) আকবর। (৬) আওরঙ্গজেব। (৭) রাণা সংগ্রামসিংহ। (৮) শ্রীচৈতন্য।

(খ)—(১) নানক। (২) কবীর। (৩) শঙ্করাচার্য্য। (৪) গুরু রামদাস।

[এই সকল রচনা অনায়াসে ইতিহাসের সাহায্যে লেখা চলে।]

হজরত মোহাম্মদ

মহাত্মা আব্রাহামের বংশধর ইস্‌মাইলের প্রতিষ্ঠিত কোরেশ-কুলে মক্কানগরে জন্ম (৫৭০ খৃঃ অঃ)—পিতার নাম আবদুল্লাহ্—জন্মের পূর্ব্বেই পিতৃহীন—শৈশবে মাতৃহীন—পিতামহ ও পিতৃব্যের দ্বারা প্রতিপালিত—সাধারণ পুঁথিগত শিক্ষার অভাব—ধ্যানের দ্বারা জ্ঞানলাভ—দারুণ দৈন্য—কঠোর শ্রম—২৬ বৎসর বয়সে ধনবতী মহিলা খাদিজাবিবির সহিত বিবাহ—হের-পর্ব্বতে গিয়া সাধনা—ভগবানের প্রত্যাদেশ—সিদ্ধি—একেশ্বরবাদ-প্রচার।

সেকালের আরবজাতির বর্ব্বরতা—নূতন ধর্ম্ম প্রচারে বাধা—নির্য্যাতনের জন্য মক্কা হইতে মদিনায় গমন—আবুবকর, ওমর ও হজরত আলির সহায়তা লাভ—মদিনায় রাজশক্তিলাভ—দলে দলে আরবজাতির নবধর্ম্ম গ্রহণ—দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার—রাজ্যবিস্তার—৬৩২ খৃষ্টাব্দে তিরোধান।

মহাত্মা আবুবকর

আরবদেশে কোরেশকুলে জন্ম। সিদ্দিক বা সত্যপ্রিয় আবুবকরের উপাধি। মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ। মক্কার একজন ধনী বস্ত্রব্যবসায়ী। হজরৎ মোহাম্মদ ইঁহার কন্যা আয়েশা বিবিকে বিবাহ করেন। ইস্‌লামপ্রচারে মহানবীর প্রধান সহায়। ইসলামের জন্য বহু লাঞ্ছনা ভোগ করেন এবং নিজের সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন। মোহাম্মদের দেহত্যাগের পর ইস্‌লামসমাজের নেতৃত্ব লইয়া বিবাদ। মোহাজের ও আনসার নামে দুইটি দল। একদল মহাত্মা ওমরকে নেতৃত্বে বরণ করিতে চাহিল। ওমর আবুবকরের হাত ধরিয়া নেতার আসনে বসাইয়া দিলেন। খলিফাপদ পাইয়া আবুবকর আদর্শ রাজধর্ম্ম পালন করেন এবং ইসলাম-গৌরব, দেশবিদেশে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। খলিফা হইয়াও আবুবকর কোর্ত্তা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন—শেষে ওমরের অনুরোধে গৃহত্যাগী (মুহাজেরান) মুসলমানের নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিমাত্র রাজকোষ হইতে গ্রহণ করেন। বহু ক্রীতদাসকে অর্থ দ্বারা মুক্তিদান করিয়া ইসলামে দীক্ষিত করেন। লোকহিত সাধন, আর্ত্তসেবা, ন্যায়বিচার, অনাসক্তি, সংসারে রহিয়াও সন্ন্যাসী।

সাধক মৈনুদ্দিন চিশ্‌তি

আফগানিস্তানের দক্ষিণাংশে সিস্তান নামক স্থানে ১১৪২ খৃষ্টাব্দে জন্ম। ১৫ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগের পর বৈরাগ্য। নিশাপুরে সাধনা ও দীক্ষা। গুরুর গদিলাভ। জ্ঞানলাভের জন্য পারস্য, আরব, ইরাক ইত্যাদি দেশে ভ্রমণ। সুফীগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা—মদিনায় তীর্থযাত্রা। প্রত্যাদেশ লাভ। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষে আগমন। আজমিরে আশ্রমরচনা। ভারতের শেষ হিন্দু-সম্রাট পৃথ্বীরাজ তাঁহার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ। এই মহা পুরুষের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের নাম চিশ্‌তি সম্প্রদায়। আজমিরকে ইনি মুসলমানতীর্থে পরিণত করিয়াছেন। এখানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দরগা আছে। বৎসরে ছয়দিন এখানে ধর্ম্মমেলা বসে। বহু সাধু, দরবেশ ফকিরের সমাবেশে ধর্ম্মসম্মেলন হয়। এই মহাপুরুষ ভারতবর্ষের বহু নরনারীকে ইস্‌লামে দীক্ষিত করেন।

অনুশীলনী

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় অবলম্বন করিয়া এই সকল মহাপুরুষদের সম্বন্ধে রচনা লিখ এবং খলিফা ওমর, তাপসী রাবেয়া, মহাত্মা নিজামুদ্দিন আউলিয়া, মহাকবি ফেরদৌসি ও তাপস কবি শেখ সাদীর জীবনী সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এক একটি নিবন্ধ লিখ।

মোহম্মদ মোহ্সীন

আগা মোতাহের নামে একজন হুগলী-নিবাসী ধনী সওদাগর তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার শিশুকন্যা মন্নুজান খাতুনকে দিয়া যা'ন। হাজি ফৈজুল্লা নামক এক সওদাগরের সঙ্গে মন্নুজানের মাতার দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে মোহাম্মদ মোহ্সিনের জন্ম।

মোহ্সিন মন্নুজানের চেয়ে আট বছরের ছোট ছিলেন। মোহ্সিন তাঁহার বড় বোনের সঙ্গেই প্রতিপালিত হ'ন। পারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষার পর তিনি কোরান পড়িবার জন্য মুর্শিদাবাদে যা'ন।

কোরান পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে,—সংসারের প্রতি সকল মমতা লোপ পায়—বিবাহ না করিয়া তিনি ফকিরী লইয়া দেশে দেশে ঘুরিবেন, ইহাই সঙ্কল্প করেন।

মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া দেখেন, কতগুলি লোক সম্পত্তির লোভে তাঁহার ভগিনীকে হত্যা করিবার মতলব করিয়াছে। জানিতে পারিয়া তিনি কৌশলে ভগিনীর জীবন রক্ষা করেন। ভগিনীর অনুরোধে মোহ্সিনকে সম্পত্তি তদারক করিবার জন্য হুগলীতেই থাকিতে হইল।

কিছুদিনের পর মন্নুজানের বিবাহ হইলে মোহ্সিন দেশভ্রমণে ও তীর্থদর্শনে রওনা হইলেন। তৎপরে ত্রিশবৎসর কাল ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, তুরস্ক ও আফ্রিকার বহুস্থলে ঘুরিয়া বেড়ান।

প্রায় ৬০ বৎসর বয়সের সময় দেশে ফিরিয়া দেখিলেন,—ভগিনী বিধবা হইয়াছেন, বিষয়-সম্পত্তি লইয়া তিনি বিব্রত, তাঁহার, পুত্রকন্যা

কিছুই হয় নাই, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সম্পত্তি উইল করিয়া ভ্রাতাকে দান করিয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

মোহ্সিন সংসারী হ'ন নাই—কাজেই তাঁহারও পুত্রকন্যা ছিল না। ভগিনীর বিশাল সম্পত্তি তিনি এখন লোকহিতের জন্য নিয়োগ করিলেন। তাঁহার নিজের ত ভোগ করিবার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না,—দরবেশের মত উপাসনা করিয়া, কোরান পড়িয়া কাল কাটাইয়া দিতেন। দিনান্তে দুই মুঠা অন্ন ছাড়া তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না।

তিনি দেখিলেন, মুসলমান-সমাজে লেখাপড়া শিখিবার জন্য কোন আগ্রহ নাই। যাহারা লেখা পড়া শিখিতে চায়, তাহাদের অর্থের অভাব। সেজন্য তিনি সম্পত্তির অধিকাংশ তাহাদের শিক্ষার উন্নতি সাধনে নিয়োগ করিলেন।—বাকী সম্পত্তি তিনি দীনদুঃখীদের সেবার জন্য বিতরণ করিলেন। জীবনের শেষ কয় বৎসর তিনি কেবল অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। হুগলীর ইমামবাড়া তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

মোহ্সিনের মহত্ত্বের সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক চোর তাঁহার বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়ে। মোহ্সিন তাহার চুরির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে—সে বড় দুঃখী, তাহাকে অনেকগুলি মুখে অন্ন যোগাইতে হয়, পেটের দায়ে সে চুরি করিতে আসিয়াছে। মোহ্সিন তাহাকে টাকাকড়ি দিয়া বলিলেন,—আর যেন সে চুরি না করে, অভাব হইলেই যেন তাঁহার কাছে আসে।

এই ধার্ম্মিক জ্ঞানী মহাপুরুষের মহত্ত্বের কথা অফুরন্ত। কোন ধর্ম্মের প্রতি ইঁহার বিদ্বেষ ছিল না। জীবনে কখনও মাছমাংস পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই। প্রাতে ইঁহার নাম করিলে সুখে কাটে।

নবাব আবদুল লতিফ

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার রাজপুরে জন্ম, কলিকাতা মাদ্রাসার কৃতী ছাত্র। প্রথমে শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ। তৎপরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সুবিচারে খ্যাতি। বিচারে মহানুভবতা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। মুসলমান সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। মুসলমানসমাজে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নবাব, তৎপর C. I. E. উপাধি লাভ। ৩৩ বৎসর রাজকার্য্যের পর অবসর গ্রহণ। শেষজীবনে ভূপাল রাজ্যের মন্ত্রিত্ব। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়াইবার চেষ্টা। ভূদেববাবু ও মাইকেল পরম বন্ধু ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক-গমন। উদার, বন্ধুবৎসল, দেশহিতৈষী, তেজস্বী, শিক্ষাব্রতী কৃতী পুরুষ।

ডেভিড হেয়ার

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে জন্ম। ঘড়ির ব্যবসা করিতে এদেশে আসেন। এদেশে শিক্ষার দুর্দ্দশা দেখিয়া শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হ'ন। রাজা রামমোহন সহায় হ'ন। ইঁহার চেষ্টায় ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি শিক্ষাবিস্তারের জন্য হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র কাহারা? (জানিয়া লও)। নিজের সমস্ত অর্থ শিক্ষাবিস্তারের জন্য দান। হেয়ার বিবাহ করেন নাই। অতি দীনভাবে জীবন যাপন করিতেন। পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের জন্য স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপন। সার রাধাকান্ত দেবের সাহায্যে কলিকাতার নানা স্থানে ইংরাজি বিদ্যালয়স্থাপন। বিদ্যালয়ের বালকরাই তাঁহার সঙ্গী ছিল,

সঙ্গী ছিল, তাহাদের সঙ্গে খেলিতেন। তিনি সর্ব্বদাই ছেলেদের সর্ব্ববিধ সুখ সুবিধার জন্য চেষ্টা করিতেন, ছেলেদের বাড়ী-বাড়ী ঘুরতেন, রোগের সময় শুশ্রূষা করিতেন। ক্ষুধা পাইলে আহার দিতেন, মায়ের মত ভালবাসিতেন ও আদরযত্ন করিতেন। অনেক ছেলেকে তিনি কোলে পিঠে করিয়াও মানুষ করিয়াছেন। এদেশের শিক্ষা, চরিত্র ও জীবনধারণের আদর্শের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলেরায় মৃত্যু। তাঁহার সমাধি ও প্রস্তরমূর্ত্তি কোথায়? তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন কি আছে?

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

১৮৬১ খৃস্টাব্দে নদীয়া জেলার নাথপুরে জন্ম। ভবনীপুর লণ্ডন মিশন স্কুলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছাত্র। ব্যায়ামপটুতা। ক্রীড়াদক্ষতা। ১৩ বৎসর বয়সে খ্রীস্টধর্ম্মে দীক্ষা। আত্মীয়গণের দ্বারা বর্জ্জিত। বিলাতী হোটেলে, গাইডের চাকরি। রেঙ্গুন যাত্রা। রেঙ্গুন হইতে মান্দ্রাজ। কলিকাতায় ফিরিয়া জাহাজে চাকরি লইয়া বিলাত যাত্রা। বিলাতে খবরের কাগজ বিক্রয় ও ভারতবর্ষের জিনিসপত্র ফেরি করিয়া অন্নার্জ্জন। সার্কাস-পার্টিতে যোগ দিয়া ইউরোপ ভ্রমণ। সিংহের সঙ্গে খেলা। সার্কাসপার্টির সঙ্গে আমেরিকা গমন। ব্রেজিলে অবস্থান। সেখানে চিড়িয়াখানার তদারককার। তারপর সমরবিভাগে প্রবেশ। ক্রমে সেনাপতিত্ব ও কর্ণেল উপাধি লাভ। বিদ্রোহ দমনে বীরত্ব-প্রদর্শন—বীর-গৌরব লাভ। তেজস্বী, দৃঢ়চরিত্র, অধ্যবসায়ী, দুঃসাহসী বীর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(১২২৭—১২৯৮)

জন্মস্থান—মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম। **পিতা**—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা—ভগবতী দেবী। বাল্যকাল। নিজ গৃহে ভৃত্য ও পাচকের কাজ করিয়া বহু কষ্টে বিদ্যাভ্যাস করেন। **বাল্যকালে** এক-গুঁয়ে। **সংস্কৃত কলেজে** পাঠ। অসাধারণ বুদ্ধি, মেধা ও কষ্টসহিষ্ণুতা।

বিদ্যা—২১ বৎসর বয়সেই কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন ইত্যাদির শাস্ত্রের পাঠ সমাধা করেন—পরে ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন

কর্ম্মজীবন—(১) প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত.—তার পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, শেষে অধ্যক্ষ ও বিদ্যালয়-পরিদর্শক।

(২) বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ লেখেন—তাহাদের মধ্যে ছাত্রগণের পাঠ্য-পুস্তকই বেশি। অনেক সংস্কৃত পুস্তকের টীকা রচনা করেন।

(৩) অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করেন, **মেট্রোপলিটান্ কলেজ** তাঁহারই কীর্ত্তি। শিক্ষাবিস্তারের জন্য অনেক চেষ্টা করেন।

(৪) **বিধবাবিবাহপ্রথা**-প্রচলন ও **স্ত্রীশিক্ষা**-বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেন। বহু বিবাহ উঠাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন করেন—সুরাপান-নিবারণের চেষ্টা করেন। অনাথ, দরিদ্র ও দুঃখীদের সেবা জীবনের ব্রত।

চরিত্র—দীন-দুঃখীদের জন্য সর্বস্ব দান। দয়ার সাগর—মাতৃভক্ত, দেশভক্ত—নির্ভীক—তেজস্বী—কষ্টসহিষ্ণু—নিরহঙ্কার।

(এই সকল গুণের দৃষ্টান্তস্বরূপ অনেক গল্প আছে—সেগুলি জানিয়া লইতে হইবে।

রামমোহন

১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম। খানাকুল রাধানগরের এক ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর সন্তান। বাল্যকাল হইতে জ্ঞানানুরাগী। পারসী, আরবী, সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত। প্রথম জীবনে সরকারী চাকরী ও অর্থসঞ্চয়। সমাজ-সংস্কার, হিন্দুপণ্ডিতগণের সহিত বাদানুবাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? ব্রাহ্মসমাজ-স্থাপন। বাঙ্গালা গদ্যরচনা-প্রবর্ত্তন। সমাজ সংস্কারে ও ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারে সরকারকে সহায়তা দান। মোগল বাদশাহের দূত ও প্রতিনিধি হইয়া ইংলণ্ড গমন. সেইখানেই মৃত্যু ও সমাধি। রামমোহনই নবযুগের জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার প্রবর্ত্তক।

রাণী ভবানী

পরিচয়—নবাব-সরকারের অমাত্য রঘুনন্দন উত্তরবঙ্গে বিপুল ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তাঁহার ভ্রাতা রামজীবন ও তাঁহার পুত্র রামকান্ত—অকালে মৃত্যু। রামকান্তের পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী।

শোকদুঃখ—অকালবৈধব্য। দুই পুত্র শৈশবে মৃত। দত্তক-পুত্র রামকৃষ্ণের সন্ন্যাস-গ্রহণ। একমাত্র কন্যা তারাসুন্দরীর বাল-বৈধব্য।

কার্য্যদক্ষতা—অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা—সেকালে বঙ্গের ভূস্বামিগণ রাণীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। অমাত্য দয়ারামের সাহায্যে রাণী নিজেই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন।

সদনুষ্ঠান—জলদান, অন্নদান, ভূমিদান। তীর্থে তীর্থে মঠমন্দির ও অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মশালা, পথঘাট, চতুষ্পাঠী ইত্যাদির জন্য মুক্তহস্তে দান, কাঙ্গালী বিদায়, ব্রাহ্মণ-সজ্জন-প্রতিপালন, দুর্ভিক্ষ-নিবারণ।

পাখী

'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।' ভোরবেলায় যাহাদের কলরব শুনিয়া আমাদের ঘুম ভাঙে, তাহারাই পাখী। বড়ই অদ্ভুত জীব ইহারা; পায়ে হাঁটিতেও পারে, আবার পাখার জোরে আকাশেও উড়িতে পারে। ভগবান এ শক্তি আর কোন জীবকে দেন নাই। মানুষ আজ তাহার বুদ্ধিবলে উড়িতে শিখিয়াছে,—তাহার স্বাভাবিক শক্তিতে নয়।

ফুলের মতন পাখীও কত রঙেরই না হয়! এক একটি পাখীর রূপ দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। কাহারও লাবণ্য পালখে, কাহারও গলায়, কাহারও ডানায়, কাহারও ঠোঁটে। এক একটি পাখীর গলার স্বর এমনই মধুর যে, মানুষের কণ্ঠের সঙ্গীতও তাহার কাছে কুণ্ঠিত। পাখী নিরীহ জীব, তাহার সুকুমার কোমল অঙ্গে রূপের ছটা, কণ্ঠে মাধুরী, স্বভাবতই পাখীকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়। আমাদের এই ভালবাসাই পাখীর পক্ষে কাল হইয়াছে। আমরা অনেক ফন্দি খাটাইয়া তাহাকে খাঁচায় বন্দী করিয়া ভালবাসার কি নিষ্ঠুর পরিচয়ই না দিই!

কোন কোন পাখী আমাদের বড় উপকার করে। যেমন,—**কাক, চিল, শকুনি**। ইহারা কুৎসিত,—কিন্তু ইহারা দূষিত আবর্জ্জনা দূর করিয়া আমাদের লোকালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। কোন কোন পাখী আমাদের ঘরের কোন-না-কোন অংশে বাসা বাঁধে। যেমন,—**চড়ুই, পায়রা** ইত্যাদি। কোন কোন পাখীর পালখ আমাদের কাজে লাগে। যেমন—**ময়ূর, হাঁস**। কোন কোন পাখী মানুষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিতে পারে। যেমন—**টিয়া, ময়না**। মানুষের হাতে ইহাদেরই লাঞ্ছনা হয় বেশি। নিষ্ঠুর মানুষ কতকগুলি নিরীহ পাখীকে শিকার করিয়া তাহাদের মাংস খায়; কতকগুলিকে ডিম ও মাংসের জন্য বাড়ীতে পোষে।

অধিকাংশ পাখীই গাছের ডালে বাসা বাঁধে। বাবুই এমন সুন্দর বাসা বাঁধে যে, তাহাকে পাখীদের মধ্যে কারিগর বলা যাইতে পারে। অনেক পাখী দল বাঁধিয়া বাস করে এবং আকাশপথে যাতায়াত করে। কতকগুলি পাখী জলচর। কতকগুলি জঙ্গল-পাহাড়েই থাকে, লোকালয়ের দিকে আসে না। কোন কোন পাখী আমাদের ফসল তসরূপ করিয়া কিছু-কিছু অনিষ্টও করে।

পাখীর দুইবার জন্ম হয়। একবার জন্ম হয় ডিমের রূপে মাতৃগর্ভ হইতে—আর একবার ডিম হইতে শাবকরূপে। ডিমে তা দেওয়ার জন্য পাখীর বাসা না বাঁধিলে চলে না। পক্ষিমাতা ডিমে তা দিয়া ডিম ফুটায় এবং ঠোঁট দিয়া শাবকের মুখে তরল খাদ্য ঢালিয়া তাহাকে প্রতিপালন করে। পাখীর মা-ই পাখীকে উড়িতে শিখায়। শাবক উড়িতে পারিলেই মায়ের দায়িত্ব শেষ হয়। সকল দেশের সাহিত্যেই পক্ষীর বড় আদর।

[নিম্নলিখিত পক্ষীগুলির সামান্য সামান্য পরিচয় দাও—

উটপাখী, ঈগল, ময়ূর, রাজহাঁস, কোকিল, চকাচকী, মাছ-রাঙা, পেঁচা, শালিখ, চাতক, মোরগ, টিয়া, পাপিয়া ও পায়রা।]

[বিজ্ঞানের পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্য লও]

অনুশীলনী

ময়ূর—কি সুন্দর পাখীটি। ইহার পালখ, পুচ্ছ, ঝুঁটি, গলা—সবই সুন্দর। ইহার পুচ্ছে কি বাহারের ঘটা, সাত রঙের ছটা। মেঘোদয়ে ইহার নৃত্য। সবই চমৎকার,—কেবল গলার স্বরটি (কেকা) কর্কশ, রূপের জন্যই বনের ময়ূর ধনিলোকের বাগানে বন্দী। ময়ূরীর কিন্তু

রূপের ছটা নাই। [ময়ূর কি খায়? ময়ূর কেন নাচে? ময়ূরের পালক কি কাজে লাগে? ময়ূর কি সাপ খায়?]

কোকিল—কোকিলের রূপ নাই—কণ্ঠস্বরের মাধুরীর জন্যই তাহার আদর। বসন্তের দূত কোকিল বাসা বাঁধে না—কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া আসে। কাক নিজের মনে করিয়া সে ডিম ফোটায়—শাবক ডাকিয়া উঠিলেই তাড়াইয়া দেয়। কোকিলের গলার স্বর মিঠে।

[কোকিল কি খায়? বসন্তকাল ছাড়া অন্যকালে কোথায় থাকে?]

প্রজাপতি—প্রজাপতিকে 'দিনের জোনাকি' বলা হয়। ইহার ডানা যেমন নরম, তেমনি সুন্দর। প্রজাপতি কীড়া অবস্থায় থাকে—শুঁয়াপোকা খোলস ছাড়িতে ছাড়িতে হয় কাঁচপোকা, তারপর কাঁচপোকা হইতে উড়ন্ত রঙিন প্রজাপতির জন্ম হয়। প্রজাপতি দল বাঁধে না, ঘর বাঁধে না—ফুলে ফুলে মধুপান করিয়া বেড়ায়। প্রজাপতির ঘটকালির কথা কে না জানে? প্রজাপতি ফুলে ফুলে বিয়ে দেয়। [বিজ্ঞানের বই দেখ।]

মধুমক্ষী—মধুমক্ষীও প্রজাপতির মত ফুলে ফুলে বিয়ে দেয় এবং ঘটক বিদায় পায় মধু। এই মধু দিয়া সে মৌচাক রচনা করে। আমরা চাক ভাঙিয়া মধু হরণ করি। মধুমক্ষীর মুখে মধু কিন্তু পুচ্ছে আছে হুল ও বিষের থলি। হুলই তাহার আত্মরক্ষার ও গৃহরক্ষার অস্ত্র। প্রত্যেক চাকে একটি করিয়া রাণী মক্ষিকা, ৫৫ হাজার দাসী মক্ষিকা, ৪।৫ শত পুরুষ মক্ষী থাকে। দাসীরাই সব কাজ করে—রাণী কেবল ডিম পাড়ে—পুরুষগুলি অলস, নিষ্কর্মা। [বিজ্ঞানের বই দেখ।]

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুবাদ

ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে লক্ষ্য করিতে হইবে,—ইংরাজী বাক্যের বাঁধুনি ও গাঁথুনি, আর বাঙ্গালা বাক্যের বাঁধুনি ও গাঁথুনি এক নহে। ইংরাজী বাক্যে সাধারণতঃ প্রথমে কর্ত্তা, তাহার পর ক্রিয়া, তাহার পর কর্ম্ম ও ক্রিয়াবিশেষণ থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় কর্ত্তা প্রথমেই থাকে বটে, কিন্তু তাহার পরই কর্ম্ম ও ক্রিয়াবিশেষণ,—সব শেষে থাকে ক্রিয়া। যেমন,—

You may learn it very easily—বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইলে বলিতে হইবে,—তুমি ইহা অতি সহজেই শিখিতে পার। ইংরাজীর ক্রিয়া May learn মাঝখানে আছে, বাঙ্গালার ক্রিয়া 'শিখিতে পার' শেষে বসিল। ইংরাজীর কোন কোন বাক্যকে কথায় কথায় অনুবাদ করিলেই চলে; কিন্তু অধিকাংশ বাক্যের কথায় কথায় অনুবাদ করিলে খাঁটি বাঙ্গালা হইবে না। যাহাতে ভাবটির ঠিকমত প্রকাশ হয়, সেই দিকে আগে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(1) I am up. (2) He is in. (3) How old are you? (4) It is I who did this. (5) How do you do? (6) You look sad. (7) Flowers smell sweet. (8) It is of no use to you. *

* শৈশবে অক্ষর পরিচয়ের পর অনেকে এই শ্রেণীর বাক্যের আক্ষরিক অনুবাদই শিখে। তাহার ফলে ইংরাজি শিক্ষার ভিত্তিই অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

—ইত্যাদ বাক্যের কথায় কথায় অনুবাদ করিতে খাঁটি বাঙ্গালাও হইবে না, ভাবটিকে ঠিকমত প্রকাশ করাও হইবে না।

যে সকল ইংরাজী বাক্যের গঠন তদনুরূপ বাঙ্গালা বাক্যের সঙ্গে বর্ণে বর্ণে মিলে না—সেই সকলের কতকগুলি উদাহরণ ও তাহাদের অনুবাদের নিদর্শন বা নমুনা দেওয়া হইল।

১। **There**-এর অর্থ 'সেখানে' না হইলে অনুবাদের সময় Thereটিকে বাদ দিতে হইবে। যেমন,—

(ক) There is a beggar standing at the door.
দ্বারে একজন ভিক্ষুক দাঁড়াইয়া আছে।

(খ) There was a king named Rama in Ayodhya.
অযোধ্যায় রাম নামে একজন রাজা ছিলেন।

২। **It** দিয়া আরব্ধ অনেক বাক্যের It-এর কোন অর্থ নাই। অনুবাদে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। যেমন—

(ক) It may rain—বৃষ্টি হইতে পারে।

(খ) It is a great crime to steal—চুরি করা বড় পাপ।

৩। 'পাওয়া' না বুঝাইলে **Have** verb-এর কর্তা বাঙ্গালায় সম্বন্ধ পদ হইয়া যায়। যেমন—

I have no money—আমার টাকা নাই। এখানে Iএর অনুবাদ 'আমি' না হইয়া হইবে 'আমার'।

Have you no time?—তোমার কি সময় নাই?

৪। **May**এর বাঙ্গালা 'পারা'। কিন্তু শুভ ইচ্ছা বা আশীর্ব্বাদ বুঝাইতে যখন ইংরাজী May ব্যবহৃত হয়, তখন অনুবাদ কিরূপ হইবে তাহার নমুনা দেওয়া হইল:—

May you be happy—তুমি সুখে থাক ! May God grant you a long life—ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন ।

৫। Letএর বাঙ্গালা সাধারণতঃ 'দাও', কিন্তু নিম্নের বাক্যগুলিতে 'দাও' কথাটি চলিবে না, দেওয়ার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই।

Let us go home—চল, আমরা বাড়ী যাই ।

Let Ram go out for a walk—রাম বেড়াইতে যাক্ ।

৬। বাঙ্গালায় **Passive Voice**এর ব্যবহার খুব কম। সে জন্য ইংরাজী passive voiceএর বাক্যের অনেক সময় বাঙ্গালায় Active voiceএ অনুবাদ করিলেই ভাল শুনাইবে।

I am told—আমি শুনিয়াছি। The book is stolen—বইখানি চুরি গিয়াছে। The watch is lost—ঘড়িটি হারাইয়া গিয়াছে। He has been beaten—সে মার খাইয়াছে।

Quasi-passive (কর্ম্মকর্তৃবাচ্যে) ক্রিয়ার অনুবাদ বাঙ্গালায় কর্ম্ম কিংবা কর্ম্মকর্তৃবাচ্যেই হইবে। Rice sells cheap here—চাল সস্তা দরে বিকায়। Quinine tastes bitter—কুইনিন খাইতে তিক্ত লাগে। It does not sound sweet—ইহা শুনিতে মিষ্ট লাগে না।

৭। বাঙ্গালার অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার বেশি, ইংরাজিতে কম। ইংরাজি বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়া একটির বেশি থাকিলে প্রধানটিকে রাখিয়া বাকিগুলিকে অসমাপিকা করাই উচিত।

Go home, take a little rest and come back as quickly as you can—বাড়ী গিয়া একটু বিশ্রামের পর যত সত্বর পার ফিরিয়া আসিও।

He will come on Monday and go away on Thursday—সোমবারে আসিয়া সে বৃহস্পতিবারে ফিরিয়া যাইবে।

৮। বাঙ্গালার তুলনায় ইংরাজিতে মিশ্রবাক্যের সংখ্যা বেশি। বহু ইংরাজি মিশ্রবাক্যকে বাঙ্গালায় সরল বাক্যে সহজে অনুবাদ করা যাইতে পারে।

You may come if you like—ইচ্ছা করিলে আসিতে পার।

Do not talk when you read—পড়িতে পড়িতে কথা বলিও না।

You cannot get this unless you speak the truth—সত্য কথা না বলিলে ইহা পাইতে পার না।

৯। আবার ইংরাজি অনেক সরল বাক্যকেও বাঙ্গালায় মিশ্র-বাক্যে অনুবাদ করিতে হয়।

He is too weak to move—সে এত দুর্ব্বল যে নড়িতে পারে না।

He seems to be wise for his age—তাহার যে বয়স তাহাতে (সে বিবেচনায়) তাহাকে বিজ্ঞ বলিয়াই মনে হয়।

১০। ইংরাজী বাক্যে **not** বা **no** না থাকিলেও বাক্যের উদ্দিষ্ট ভাবটি বজায় রাখার জন্য বাঙ্গালা বাক্যে অনেক সময় 'না বা নয়' ব্যবহার করিতে হয়।

You will fail unless you work—না খাটিলে কৃতকার্য্য হইবে না। Wait here till he comes—যতক্ষণ তিনি না আসেন, এখানে অপেক্ষা কর। He is hardly asked any question—তাহাকে প্রায়ই কোন প্রশ্ন করা হয় না। He is the most wicked man alive—তাহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। He failed to reach at the proper time—সে ঠিক সময় পৌছিতে পারে নাই।

১১। অনেক সময় ইংরাজিতে বাক্যের অনুবাদ শেষ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম দিকে আসিতে পারে।

I am going to tell you something about the life of Thomas Alva Edison, the famous inventor of Phonograph.

ফোনোগ্রাফের সুপ্রসিদ্ধ আবিষ্কারক টমাস এল্‌ভা এডিসনের জীবনী সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু ব'লতে যাইতেছি।

১২। Ask, be, do, use, grow, get, feel, have ইত্যাদি ক্রিয়া সর্ব্বত্রই একটিমাত্র অর্থে বসে না, কোন' কোন' স্থলে বিভিন্ন অর্থেও বসে। অনুবাদের উদ্দিষ্ট অর্থটি ঠিক থাকা চাই। অনুবাদের সময় কোন-কোনটিকে উপেক্ষা করিলেও চলে।

Be—I have been to Calcutta—আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম। He is a clever man—সে চতুর লোক। এখানে Isএর অনুবাদের প্রয়োজন নাই।

Ask—He asked me to do this—তিনি আমাকে ইহা করিতে বলিয়াছিলেন। I have asked him to come to my house—আমার বাড়ীতে আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি।

Do—Where do you go? কোথায় যাও? I do not know how to swim—আমি সাঁতার দিতে জানি না। I do want this money—আমার এই টাকা চাই-ই চাই।

১৩। It যেখানে জোর দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়, বাঙ্গালায় সেখানে ই-যোগে অনুবাদ করিতে হইবে। যেমন,—

It is I who have done this—আমিই ইহা করিয়াছি।

It is you who are responsible for this—তুমিই এজন্য দায়ী।

(1)

Horse—Yes, I love him, I work for him. I draw heavy loads, I carry him on my back. Sometimes he beats me. Sometimes he is cruel to me. But yet I love him. You do not draw loads. You do not carry him on your back. He does not beat you. He feeds you. He gives you a house to live in. Why do you not love him?

Goat—It is true that I do not draw loads. It is true that he does not ride on my back. It is true that he doos not beat me. But I know that some day he will kill me and eat me. So I do not love him.

অশ্ব—হাঁ, আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমি তাঁহার জন্য খাটি,—ভারি বোঝা টানি—আমি তাঁহাকে পিঠে বহিয়া লইয়া যাই। কখনও কখনও তিনি আমাকে মারেন, কখনও কখনও আমার প্রতি নিষ্ঠুর হ'ন, কিন্তু তবু আমি তাঁহাকে ভালবাসি। তুমি বোঝা টান না,—তুমি তাঁহাকে পিঠে বহন কর না। তিনি তোমাকে মারেন না,—তোমাকে তিনি খ'ইতে দেন, থাকিবার জন্য একটি ঘর দিয়াছেন। তবে কেন তুমি তাঁহাকে ভালবাস না?

ছাগ—সত্য বটে, আমি বোঝা টানি না। সত্য বটে, তিনি আমার পিঠে চড়েন না। ইহাও সত্য যে, তিনি আমাকে মারেন না। কিন্তু আমি জানি, একদিন তিনি আমাকে বধ করিয়া আমাকে (আমার মাংস) খাইবেন। সেইজন্য আমি তাঁহাকে ভালবাসি না।

(2)

A man had a horse and an ass. He treated the horse kindly, but he treated the ass unkindly. He put light

loads on the horse, but he put heavy loads on the ass. One day the ass fell sick. He could not carry his load. He asked the horse to help him. The horse laughed at him and called him lazy beast. He would not help him.

একটি লোকের একটি ঘোড়া ও একটি গাধা ছিল। সে ঘোড়াটির প্রতি সদয় ব্যবহার করিত, কিন্তু গাধাটির প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। ঘোড়ার উপরে (পিঠে) হালকা বোঝা চাপাইত,—কিন্তু গাধার পিঠে চাপাইত ভারী বোঝা। একদিন গাধাটি অসুস্থ হইয়া পড়িল। সে তাহার বোঝা বহিতে পারিল না, ঘোড়াটিকে সাহায্য করিবার জন্য বলিল (অনুরোধ করিল)। ঘোড়াটি তাহাকে কুঁড়ে জানোয়ার (অলস পশু) বলিয়া ব্যঙ্গ করিল,—সাহায্য করিল না।

[এখানে Put, laugh at, asked ও called এই কয়টি ক্রিয়ার অনুবাদ লক্ষ্য করিতে হইবে।]

(3)

One day a wolf was looking for something to eat, when he came to a stream. A little below, he saw a lamb. The lamb was having a drink of water. The wolf said to himself, "That is a nice fat lamb ; it will make me a good dinner." Then he said to the lamb—"How dare you spoil the water that I am going to drink ? You are making it all muddy with your feet."

একটি নেকড়ে বাঘ আহার খুঁজিতে খুঁজিতে একটি ছোট নদীর ধারে আসিল। সে দেখিল, একটু নীচে একটি ভেড়ার ছানা জল পান করিতেছে। নেকড়ে বাঘ মনে মনে বলিল,—'বাঃ, বেশ মোটাসোটা সুন্দর ভেড়ার ছানাটি ত ! ইহাতে আমার বেশ ভোজন চলিবে।"

তারপর সে ভেড়ার বাচ্চাটিকে—"ওরে দুষ্ট ভেড়ার ছানা, আমি যে জল পান করতে যাচ্ছি, সেই জল তুই নষ্ট করছিস্—এত সাহস তোর (এত আস্পর্দ্ধা তোর)? পা দিয়ে সব জলটা ঘোলা ক'রে দিচ্ছিস্।"

[এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে—১ম বাক্যটি মিশ্র। উহাকে একটি বাক্যে অনুবাদ করিতে হইয়াছে। ২য় ও ৩য় বাক্যকে একটি সরল বাক্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইয়াছে। বাঘের মুখের কথাগুলির জন্য চলতি ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। অনুবাদে How.......dare drink—আগাগোড়াই কথায় কথায় অনুবাদ করা হয় নাই।]

(4)

The cow eats grass. When she has swallowed some grass, she lies down. She brings the grass again into her mouth. She lies in the shade of a tree and chews the grass with her teeth. This is called chewing the cud. Other animals besides the cow, chew the cud. The goat and the camel chew the cud. The young cow is called a calf. A calf has no horns, when it is born. The horns grow later.

গোরুতে ঘাস খায়। কতকটা ঘাস গিলিয়া ফেলিয়া সে শুইয়া পড়ে। সেই ঘাসকে আবার মুখের ভিতরে আনে। গাছের ছায়ায় শুইয়া দাঁতে করিয়া সেই ঘাস চিবাইতে থাকে। ইহাকে জাবরকাটা (রোমন্থন) বলে। গোরু ছাড়া অন্যান্য জন্তুও, যেমন—ছাগল ও উট,—জাবর কাটিয়া থাকে। অল্পবয়সের গোরুকে বলে বাছুর। জন্মের সময় বাছুরের শিঙ থাকে না—পরে গজায়।

[এখানে দুইবার When আছে এবং দুইবার Is called আছে। এই দুইটি অনুবাদ লক্ষ্য করিতে হইবে। Other animals.......

chew the cud—এই দুইটি বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করিতে হইয়াছে—নতুবা জাবরকাটা কথাটিকে দুইবার পর পর বসাইতে হয়।]

(5)

"Dear mother, forgive me ! I have told a lie and I have hidden it from you. I was playing with my play-mates ; I won the game through a mistake which they did not find out and I was so much pleased at being the winner that I told them what was not true. I have been very unhappy ever since.

"মা, আমায় মাফ কর। একটি মিছে কথা বলেছি,—সে কথা আবার তোমার কাছে লুকিয়েছি। আমি আমার খেলার সাথীদের সঙ্গে খেলা করছিলাম। একটা ভুলের জন্য খেলায় জিতে গিয়েছি,—সে ভুল তারা ধরতে পারে নি। খেলায় জিতে আমি এত খুশী হয়েছিলাম যে, যা সত্য নয় তাই আমি তাদের বলেছি। সেই হ'তে আমি অসুখী হয়ে আছি (আমার মন বড় খারাপ হ'য়ে আছে)।

এখানে চল্‌তি ভাষায় ছোট ছেলের মুখের কথার অনুবাদ করিতে হইয়াছে, নতুবা অস্বাভাবিক শুনাইবে। Dear mother-কে প্রিয় মা বা প্রিয় মাতা বলিয়া অনুবাদ করিলে চলিবে না,—শুধু 'মা' লিখিলেই চলিবে।]

অনুশীলনী

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ কর :—

1. At last one frog jumped on a large stone near the edge (কিনারা, ধার) of the water and cried out, "Dear boys, why are you throwing stones ?' (ঢিল ছুড়িতেছ কেন ?) "We are only playing," said one of the boys. "Perhaps

it is play to you," said the old frog, "but is pain to us (হয়ত তোমাদের কাছে ইহা ক্রীড়া, কিন্তু আমাদের কাছে পীড়া) and even (এমন কি) death to us. Please stop your sport with stones (শিলা লইয়া লীলাখেলা)।

2. What does little birdie say
In her nest at peep of day ?
"Let me fly" says little birdie.
"Mother, let me fly away.
"Birdie, rest a little longer.
Till the little wings are stronger."

3. Once an old Judge found in a book at night whoever has a small head and a long beard is a fool; and he himself (তাহার নিজেরই) had a small head and a long beard. So he said to himseif (মনে মনে বলিল) 'I' cannot enlarge (বাড়াইতে) my head, hut I can shorten (কমাইতে) my beard. So he sought for scissors, but did not find them. He then held half his beard in his hand and put the other half on the lamp and burnt it. And the beard was entirely cansumed (আগাগোড়া সমস্ত দাড়িটাই পুড়িয়া গেল).

4. Donkeys are very lazy (অলস). They never walk fast (দ্রুত). Their skin is very thick. So they do not feel pain easily (সহজে কষ্ট অনুভব করে না)। It is not a good habit to whip a donkey very much. We should always

be kind to dumb animals (অবোলা জীব). It is hard task to make a donkey do something which she does not wish to do (যাহা সে করিতে চায় না, তাহাকে দিয়া তাহা করানো বড় কঠিন ব্যাপার).

5. In time these bees grow too many to live together in the same hive. Then the queen bee flies away to seek a new home. A swarm of bees must go with her. If they do not find a hive, they build a new one on the branch of a tree or below the cornice of a house.

[In time—কালক্রমে। Bee ·...hive—মৌমাছিদের সংখ্যা এত বাড়িয়া যায় যে, একটি চাকে সকলে বাস করিতে পারে না]।

6. In a forest there was a large tree. An old vulture (গৃধ্র, শকুনি) lived in the tree. He was too old to seize his prey (এত বৃদ্ধ হইয়াছিল যে—). He had lost his wings and talons (নখর). Other birds lived on that tree. They pitied him and gave hime each day something to eat (তাহারা দয়া করিয়া). The vulture took care of the young birds (পক্ষিশাবকগণের তত্ত্বাবধান)।

7. God is the great giver of all things. He made the blue sky where (সেই আকাশে) the birds fly about. He made the sun to give us light by day (দিনের বেলায়) and the moon to give us light by night. He made stars also that glitter in the sky like so many diamonds

(হীরকখণ্ডের মত ঝলমল করে). He made the trees that yield fruits and flowers.

৮. The desert is a very dangerous place. There is no water in the desert. It is all covered with sand. At noon the sand becomes hot as fire. No one can then walk upon it. Only the camel can walk upon it. He has very long legs which do not sink under it.

9. The prince did not know how to climb a tree. He could not run off, for there was the jungle all around. He could not fight the bear, for it was too strong for him. He thought out a good plan. He had heard that bears do not touch a dead body. So he laid himself flat and held in his breath so as to look like a dead man.

10. Once a horse and an ass went on the high road, side by side, and the man who kept them went on foot. The poor ass had told the horse that if he would share the load with him, he could soon get well, but he did not lend him some help, the weight of it would kill him.

11. One dark night a thief came to a man's house to rob it and when the dog heard him, he gave a loud bark. At this, the man sprang from his bed to look out, but saw no one. He did not hear the least sound. So he bade the dog be still and went back to sleep.

12. Do not go out now. It will rain soon. Look how black the sky is! Rain comes from the clouds. There has not been any rain for a very long time. The ground is very dry and hard and the grass is no more green. If it does not rain soon, we must water the plants in the graden. Otherwise, they will die.

13. The lion is a grateful animal. He does not forget the good once done to him. Once a culprit was thrown before a lion. The lion did not kill the man but licked his hands. Being asked the reason of it, the man said that he had sometime before removed a thorn from the lion's paw and cured his foot of the sore, it had caused.

14. A lamb was drinking in a stream.

Farther up the stream was a wolf. The wolf said to himself, "I should like to have the lamb."

The wolf came down the stream and said to the lamb, "You are making the stream muddy for me."

"How could I?" said the lamb. "You are farther up the stream than I am."

15. "That may be," said the wolf, "but a year ago you called me bad names."

"Oh no." said the lamb. "A year ago I was not born."

"Well," said the wolf, "if it was not you it was your mother." And with that the wolf fell on the poor lamb and ate him up.

16. A man had a little dog, and he was very fond of it. He would pat its head, and take it on his knee, and talk to it. Then he would give it little bits of food from his own plate. A donkey looked in at the window and saw the man and the dog.

"Why does he not make a pet of me?" said the donkey. "It is not fair. I work hard, and the dog only wags its tail, and barks, and jumps on its master's knee. It is not fair."

17. Then the donkey said to himself, "If I do what the dog does, he may make a pet of me."

So the donkey ran into the room. It brayed as loudly as it could. It wagged its tail so hard that it knocked over a jar on the table. Then it tried to jump on to its master's knee.

18. The master thought the donkey was mad, and he shouted, "Help ! Help !" Men came running in with sticks, and they beat the donkey till it ran out of the house and they drove it back to field.

"I only did what the dog does," said the donkey, "and yet they make a pet of the dog, and they beat me with sticks. It is not fair."

19. A man hired an ass from another man. He paid him two shillings to lend him the ass for the day.

It was a very hot day, and both men wanted to stand in the ass's shadow, so that they might be cool. But there was only room for one of them.

20. "Go away," said the man who had hired the ass. "It is my shadow to-day. I have hired the ass."

"You hired the ass," said the owner, "but you did not hire his shadow."

21. They went on, the hirer saying one thing and the owner saying the other. Then they began to fight, and while they were fighting one of them happened to hit the ass. Then the ass ran away. And it took its shadow with it!

22. Two men were going through the woods. "If a bear comes," said one man, "I will not run away. I will stick to you, and then we can drive it away."

"Yes," said the other man, "we will stick to each other, and we can drive the bear away."

By and by they met a bear.

23. As soon as he saw the bear, one of the men climbed up a tree. When he saw this, the other man lay down as if he were dead.

The bear came along, and it sniffed at the man who lay on the ground. The bear thought he was dead, and so after sniffing round him it went on.

24. When the bear was gone, the man in the tree came down. "The bear seemed to be talking to you," he said to the other man. "What did he say to you?"

"He told me," said the man who had lain on the ground, "never to trust a man who said he would stick to me, and then run away."

25. A wolf was trotting along a road. He was very thin and hungry. He could find no food.

The wolf met a large dog. "Hullo, wolf!" said the dog. "You look very thin and hungry."

"Hullo, dog!" said the wolf. "You look well-fed. Where do you get such good food? I spend all my time looking for food, and yet I get very little."

26. "I take care of the house," said the dog, "and so I am given plenty of food. If you will come with me, and help to take care of the house, there will be plenty of food for you too."

"Thank you," said the wolf. "I should like that."

So the wolf and the dog trotted off side by side.

27. As they were trotting along, the wolf saw a mark on the dog's neck. "What is that mark?" said the wolf.

"My collar made that mark," said the dog. "In the daytime I am chained up, but at night I run where I like. Come on, wolf, we are nearly at the house."

"I am not coming," said the wolf. "Good night, dog, I would rather be free and hungry."

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্ণাশুদ্ধি-সংশোধন

বর্ণাশুদ্ধি কত প্রকারের ঘটিয়া থাকে এবং বর্ণাশুদ্ধি নিবারণের উপায় কি, সে সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডে অনেক কথা হইয়াছে, তাহাদের মোটামুটি একটা তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। বর্ণাশুদ্ধি-নিবারণের জন্য কি কি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে এই কয়েকটি কথা বলা হইল।

১। অনেক সময় **উচ্চারণের দোষেই** অনেক বর্ণাশুদ্ধি ঘটে। অদৃষ্ট, সাহায্য, ব্যাবধান, লক্ষা, ব্রাহ্মণ, গর্দ্ধব, বিষ্টু, মধ্যান্ন ইত্যাদি বর্ণাশুদ্ধি উচ্চারণ-দোষেই ঘটে। বাঙ্গালা ভাষায় স-ষ-শ, ণ-ন, ই-ঈ, উ-ঊ, য-জ ইত্যাদির বৈচিত্র্যের জন্য ছাত্রগণের পক্ষে ঠিকমত বানান লেখা কঠিন। এই সকল ক্ষেত্রে ছাত্রগণের কর্ত্তব্য, বানানের অঙ্গগুলির উপর খর দৃষ্টি রাখা এবং যে সকল শব্দের সম্বন্ধে গোলমালের সম্ভাবনা তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া মাঝে মাঝে পাঠ করা।

২। একই উচ্চারণে, ভিন্নভিন্ন অর্থের দুই বা ততোধিক শব্দ থাকিতে পারে। যেমন,—সত্ত্ব, স্বত্ব। দীপ, দ্বীপ। দারা, দ্বারা। বলি, বলী। অর্থের প্রভেদই এই শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন শব্দের বানান নির্ণয় করিবার সাহায্য করে। এক্ষেত্রে বেশি গোলযোগের সম্ভাবনা নাই।

যুক্তাক্ষরের একটি অক্ষর বাদ দিয়াও অনেক সময় উচ্চারণ ঠিকই থাকে। সেখানে ভুল হইবার সম্ভাবনা খুব বেশি। যেমন—তদ্বারা (তদ্দ্বারা), মহত্ব (মহত্ত্ব), উত্যক্ত (উত্ত্যক্ত), দন্দ (দ্বন্দ্ব), ঊর্দ্ধ (ঊর্দ্ধ্ব),

পার্শ (পার্শ্ব)। এই সকল ভুল বানান নিবারণ করিতে হইলে পৃথক্ ভাবে শুদ্ধ বানানগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে।

৩। একটি বানানের **অনুবৃত্তিতেও** একটি ভুল বানান আসিয়া পড়ে। যেমন—স্বার্থের অনুবৃত্তিতে স্বার্থক, উজ্জ্বলের অনুবৃত্তিতে প্রজ্জ্বলিত, বিদ্যা বা উদ্যানের অনুবৃত্তিতে বিদ্যান।

৪। র ও ড়-এর গোল সহজেই মিটিতে পারে। ঠিকমত উচ্চারণ করিতে শিখিলেই আর এ ভুল হইবে না।

৫। **ব্যাকরণের জ্ঞান** না থাকিলে কেবল তালিকা মুখস্থ করিয়া বর্ণ বিশুদ্ধি আয়ত্ত হয় না। ষষ্ঠ শ্রেণীতে বিসর্গসন্ধি ও কৃদন্ত, তদ্ধিত ব্যাকরণে পড়ানো হয়, সেজন্য ২।৪টি নিয়মের কথা এখানে বলি।

(ক) **ইন্-ভাগান্ত** শব্দের (যেমন—যোগিন, গুণিন, জ্ঞানিন্) সহিত অন্য শব্দের সমাস হইলে ঈকার ইকার হইয়া যাইবে। যেমন—জ্ঞানিগণ, পক্ষিকুল, গুণিজন ইত্যাদি। স্ত্রীলিঙ্গের ঈকারের পরিবর্ত্তন হইবে না। যেমন—পল্লীবাসিনীগণ, সতীলক্ষ্মীগণ।

ইন্‌ভাগান্ত শব্দের পর তা বা প্রত্যয় হইলেও ঈকার, ইকার হইবে। যেমন উপকারী+তা=উপকারিতা, স্বামী+ত্ব=স্বামিত্ব।

(খ) **বিসর্গান্ত শব্দের** সহিত অন্য শব্দের সন্ধি হইলে, সন্ধান লওয়া উচিত বিসর্গটি গেল কোথায়?

(১) বিসর্গটি ও-কার হইয়া যাইতে পারে, (২) রেফ হইয়া যাইতে পারে, (৩) লোপ পাইতে পারে, (৪) পূর্ব্বস্বরকে দীর্ঘ করিতে পারে, (৫) থাকিয়াও যাইতে পারে, (৬) স, ষ বা শ হইয়া যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়ম ব্যাকরণে দ্রষ্টব্য। বিসর্গান্ত শব্দের একটা তালিকাও আয়ত্ত থাকা চাই। ক্রমিক উদাহরণ।

(১) সদ্যঃ+জাত=সদ্যোজাত ('সদ্যজাত' নয়)। (২) জ্যোতি+

ইন্দ্র=জ্যোতিরিন্দ্র (জ্যোতীন্দ্র নয়)। বহিঃ+দেশ=বহির্দেশ (বহিদেশ নয়)। (৩) শিরঃ+উপরি=শির-উপরি (শিরোপরি নয়)। (৪) নিঃ+রোগ=নীরোগ (নিরোগ নয়)। (৫) শিরঃ+পীড়া=শিরঃপীড়া (শিরোপীড়া নয়)। (৬) মনঃ+কামনা—মনস্কামনা (মনোকামনা নয়)। শিরঃ+ছেদ=শিরশ্ছেদ (শিরচ্ছেদ নয়)। ধনুঃ+টঙ্কার—ধনুষ্টঙ্কার। নভঃ+তল=নভস্তল (নভোতল নয়)।

যে শব্দে **দুইটি বিসর্গ** আছে, তাহার একটিকে স্বীকার করিয়া অন্যটিকে ত্যাগ করা উচিত নয়। যেমন—ইতঃ+ততঃ=ইতস্ততঃ (ইতস্তত নয়)। অহঃ+অহঃ=অহরহঃ (অহরহ নয়)। মুহুঃ+মুহুঃ=মুহুর্মুহুঃ।

(গ) Superlative বুঝাইতে যত **ইষ্ঠ** সবই ষ+ঠ (ষ+ট নয়)। যেমন— বশিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠ, পাপিষ্ঠ, লঘিষ্ঠ।

(ঘ) **ণত্ব** ও **ষত্বের** দুইটি নিয়ম মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে,—

(১) **ঋ, র, ষ** এই তিন বর্ণের পর এবং **স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ য, ব, হ** ব্যবধান থাকিলে দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হইবে। যেমন—ঋণ, সংক্রমণ, রামায়ণ, আরোহণ. ক্ষেপণ, শোষণ, ম্রিয়মাণ ইত্যাদি।

(২) **অ আ** ভিন্ন স্বর এবং **ক্** ও **র্**এর পরস্থিত প্রত্যয়াদির স্ ষ. হইবে। যেমন—পরিষ্কার, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বানান লক্ষ্য কর :—

—কটূক্তি (কটু+উক্তি), মরূদ্যান (মরু+উদ্যান), যুধিষ্ঠির (যুধি+স্থির), উত্যক্ত (উৎ+ত্যক্ত), তদ্দ্বারা (তদ্+দ্বারা), ভৌগোলিক (ভূগোল হইতে), পৌরোহিত্য (পুরোহিত হইতে), ইয়ত্তা (ইয়ৎ+তা)- ধ্বসে যাওয়া (ধ্বংস হইতে), সম্বন্ধ (সম্+বন্ধ), অনসূয়া (ন+অসূয়া), অপোগণ্ড (অ+পোগণ্ড), কামাখ্যা (কাম+আখ্যা), জগদিন্দ্র

(জগৎ+ইন্দ্র), জগদীশ (জগৎ+ঈশ), সত্তা (সৎ+তা), সত্ত্ব (সৎ+ত্ব), স্বত্ব (স্ব+ত্ব), সম্মিলনী (সম্+মিলনী), চক্ষুরোগ (চক্ষুঃ+রোগ), প্রজ্বলিত (প্র+জ্বলিত), প্রোজ্জ্বল (প্র+উৎ+জ্বল), স্বচ্ছ (সু+অচ্ছ), কৈশোর (কিশোর হইতে), বানপ্রস্থ (বনপ্রস্থ্যা হইতে), শুদ্ধাশুদ্ধি (শুদ্ধি +অশুদ্ধি), প্রত্যুত (প্রতি+উত), ব্যুৎপন্ন (বি+উৎপন্ন)।

৭। সংস্কৃত শব্দের বানান সম্বন্ধে যেরূপ, আরবী ফারসী শব্দের বানান সম্বন্ধেও সেইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন।

নিম্নে কয়েকটি শব্দের বিশুদ্ধ বানান দেখানো হইল—

নামাজ, খোদাতা'লা, আল্লাহ্, সওদাগর, আহ্মক, বাদ্শাহ, তখ্ত, মোহাম্মদ, মোহর্‌রম, ফেরেশতা, রওয়ানা, বদমায়েশ, সুপারেশ, শর্‌বৎ, আওরঙ্গজেব, ফেরদৌসী, আতশ্‌বাজি, শায়েস্তা, জওহর, খলিফা, সোহ্‌রাব, মাহ্‌মুদ, বখশিশ্, পসন্দ, খামাখা, দেমাগ, নাবালগ, জাদুঘর, কারিগর, ভিশ্‌তি, খুশী, লশ্‌কর, রশদ, দুশমন, ইস্তাফা, রকমওয়ারি, গেরেফ্‌তার, বাজেয়াফত্।

৮। সম্পূর্ণ দেশজ—শব্দের বানানে কিছু স্বাধীনতা আছে। যেমন—মাথম—মাখন, মাদুর—মাদুর, দেয়াল—দেওয়াল, কাশুন্দি—কাসুন্দী, ধন্না—ধর্না, গরু—গোরু. দুইটা—দুইটি, ফাঁকি—ফাঁকী।

যে সকল শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে জন্মিয়াছে—মূল শব্দের সহিত তাহাদের আক্ষরিক মিল রাখাই উচিত। যেমন—

৯। চুণ (চূর্ণ), পাণ (পর্ণ), কুমীর (কুম্ভীর), শাঁস (শস্য), শাশুরী (শ্বশ্রূ), শীষ (শীর্ষ), আরশি (আদর্শিকা), কাঁটাল (কণ্টফল), কাজ (কজ্জ,প্রাঃ), সিঁদুর (সিন্দুর) ইত্যাদি।

১০। যেখানে দুইটি শব্দের উচ্চারণে ধ্বনির মিল আছে, সেখানে

একটি বানানের আনুরূপ্যে আর একটির বানান ভুল হয়। নিম্নে সেই ভ্রমনিবারণের জন্য একটি তালিকা দেওয়া হইল—

পরিত্যক্ত	কিন্তু পরিত্যাজ্য	অধ্যয়ন	কিন্তু অধ্যাপক
শম্ভু	„ স্বয়ম্ভূ	পর্য্যটন	„ পর্য্যাটক
মহত্ত্ব	„ মাহাত্ম্য	সূর্য্য	„ শৌর্য্য
উর্ব্বশী	„ ঊর্ম্মিলা	আকুল	„ অকূল
উক্ত	„ ঊহ্য	উত্থান	„ বিদ্বান্
ভূত	„ ভুক্ত	গোঁয়ার	„ গোসাঁই
সঙ্গিগণ	„ সুধীগণ	বিশিষ্ট	„ বশিষ্ঠ
মুষল	„ মূষিক	বিকিরণ	„ বিকীর্ণ
বিষদৃষ্টি	„ বিসদৃশ	উদ্গিরণ	„ উদ্গীর্ণ
দাশরথি	„ ভাগীরথী	বিকৃত	„ বিক্রীত
রথী	„ সারথি	দুঃসহ	„ দুর্ব্বিষহ
কল্যাণীয়েষু	„ কল্যাণীয়াসু	সূক্ষ্ম	„ রুক্ষ
কৌতুক	„ কৌতূহল	বিষাদ	„ বিশদ
ক্রিয়া	„ ক্রীড়া	সাহিত্য	„ দায়িত্ব
বিঘ্ন	„ উদ্বিগ্ন	পূর্ব্বাহ্ণ	„ মধ্যাহ্ন
ভিষক্	„ ভীষণ	বিষাণ	„ ঈশান
কৃত্তিবাস	„ কীর্ত্তিনাশা	শিকার	„ স্বীকার
সার্থক	„ স্বার্থ	ভিক্ষুক	„ শিক্ষক
সন্ধান	„ সন্ধ্যা	প্রার্থনীয়	„ স্পৃহণীয়
শ্বশ্রূ	„ শ্মশ্রু	আরম্ভ	„ আড়ম্বর
পুরস্কার	„ পরিষ্কার	দুর্গত	„ দূরগত
মৃন্ময়	„ মৃণাল	খীরোচিত	„ বিরচিত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাক্য-প্রকরণ

বাক্য-শুদ্ধি

বর্ণাশুদ্ধি ছাড়া বাক্যগঠনের অন্যান্য অশুদ্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলার প্রয়োজন মনে করি।

১। **উদয়** হও হে হৃদয় মাঝে। আমি বড় **অপমান** হইলাম। ইহা **নিশ্চয়** যে, সে আর ফিরিবে না। তুমি **আরোগ্য** হইয়াছ। জানিয়া **সন্তোষ** হইলাম। তিনি **মৌন** হইয়া রহিলেন।

আয়ত অক্ষরের শব্দগুলি বিশেষ্য। ঐগুলির স্থলে যথাক্রমে বিশেষণ—**উদিত, অপমানিত, নিশ্চিত, রোগমুক্ত, সন্তুষ্ট** ও **মৌনী** হইবে।

বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান জন্মিলে এই ভুল দূর হইবে।

২। মনোকষ্ট, শিরচ্ছেদ, উপর্য্যোপরি অত্যান্ত, জাত্যাভিমান, ভূম্যাধিকারী, বাগেশ্বরী, দিগেন্দ্র, পৃথকান্ন, হৃদ্‌পদ্ম, পশ্চাদ্‌পদ, বণিকগণ, ভড়িতালোকে, শিরোপরি, শিরোপীড়া, মহতাশ্রয় ইত্যাদি শব্দে যে অশুদ্ধি তাহা **সন্ধিজ্ঞানের অভাবে** ঘটে।

সন্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলেই ইহা দূর হইবে।

আপনাপন, চিন্তিতাছি, তাহাপেক্ষা, কতকাংশ, চাষাবাদ, বরফাচ্ছন্ন, ফুলাসন, পছন্দানুযায়ী, আইনানুসারে ইত্যাদি শব্দে যে ভুল, **চলিত** বাঙ্গালা শব্দের সহিত কোন শব্দের সন্ধি হয় না, তাহা না জানার জন্য।

কোন্‌গুলি চলিত বাঙ্গালার শব্দ, কোন্‌গুলি সংস্কৃত শব্দ, তাহা জানিলেই এ ভুল আর হইবে না।

৩। বিদ্বান্ সমাজ (বিদ্বৎসমাজ), মহারাজা (মহারাজ), পথমধ্যে (পথিমধ্যে), নীরোগী (নীরোগ), সাবধানী (সাবধান), ভ্রাতাগণ

(ভ্রাতৃগণ) ইত্যাদি শব্দের যে ভুল, তাহা সমাস সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়িলেই ক্রমে দূরীভূত হইবে।

কয়েকটি বাক্যগঠনগত অশুদ্ধির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

অশুদ্ধ—সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়া পথ পিচ্ছল হইয়াছে।

শুদ্ধ—সারারাত্রি বৃষ্টি হওয়ায় পথ পিছল

অশুদ্ধ—অহল্যাবাঈ ভক্তি ও দয়াবতী মেয়ে ছিলেন।

শুদ্ধ—অহল্যাবাঈ ভক্তিমতী ও দয়াবতী মহিলা ছিলেন।

অশুদ্ধ—জটায়ুকে শোণিত ও কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় রাম দেখিলেন।

শুদ্ধ—রাম জটায়ুকে শোণিতসিক্ত ও কর্দ্দমাক্ত অবস্থায় দেখিলেন।

অশুদ্ধ—আকবর মানসিংহকে ঈসাখাঁকে দমন করিতে পাঠাইলেন।

শুদ্ধ—আকবর ঈসাখাঁকে দমন করিবার জন্য মানসিংহকে পাঠাইলেন।

অশুদ্ধ—আমি আগে কভু এখানে আসিয়াছিলাম না।

শুদ্ধ—আমি আগে কখনো এখানে আসি নাই।

অশুদ্ধ—তিনি আসিলেন পরে সভা আরম্ভ হইল।

শুদ্ধ—তাঁহার আসার পরে সভার কার্য্যারম্ভ হইল।

অশুদ্ধ—ওনার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল জন্য উনি ছুটি লইয়াছিল।

শুদ্ধ—উঁহার পিতৃবিয়োগের জন্য উনি ছুটি লইয়াছিলেন।

অশুদ্ধ—যদিও তিনি খঞ্জ, কিন্তু দ্রুত চলিতে পারেন।

শুদ্ধ—যদিও তিনি খঞ্জ তথাপি (তবুও) তিনি দ্রুত চলিতে পারেন।

অশুদ্ধ—যেমন কর্ম্ম করিবে, তেমনিই ফল পাইবে।

শুদ্ধ—যেমন কর্ম্ম করিবে, সেইরূপ ফল পাইবে।

অশুদ্ধ—যে আমাদের শিক্ষক ছিল—সে ব্যক্তি ইনিই।

শুদ্ধ—যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন—তিনিই এই ব্যক্তি।

অশুদ্ধ—প্রজারা জমিদারকে তাহাদের দুঃখ নিবেদন দিল।

শুদ্ধ—প্রজারা জমিদারের কাছে তাহাদের দুঃখ নিবেদন করিল।

অশুদ্ধ—তাহাকে ছাড়া আমার এক চরণও আগাইবার যো নেই।

শুদ্ধ—সে ছাড়া আমার এক পা-ও আগানোর যো নেই।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে ভুল থাকিলে সংশোধন কর ; ভুল না থাকিলে কেন নির্দোষ তাহা বুঝাও ঃ—

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আটদিকে অন্ধকার হইল। মেঘ করিলেই স্বতই অন্তমন ও বিমর্ষ হইয়া পড়েন। পরশ্ব এখানে শকুন্তলা অভিনয় হইয়াছিল। বাজি দেখানো আরম্ভ হইলে আমি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম। এখানে ভ্রমণ ও খাদ্যসুখ দারুণ—কিছুদিন থাকিলে রোগ আরাম হইবে। তাঁহার ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছে—তত্রাচ তিনি দমিত হয় নাই। এই ছাগীটি মা-কালীকে উচ্ছর্গ করা। দিনরাত্রি তাহার চক্ষে অশ্রুজল ঝরিতেছে। সে হামাগুড়ি খাইয়া খাটের নীচে যাইতেছিল। যদি বা চাকুরী পাইলাম—তবে মাহিয়ানা পাইলাম না। যদিই বা ঝড় আসিয়া পড়ে, তবু কি হইবে? ১লা পর্য্যন্ত ৫ই অবধি আমাদের স্বরোস্বত-পূজা বশত ছুটী আছে তিনি জ্বর হইয়া বাটী আসিয়াছেন। স্বীকার করি, সে সুবুদ্ধিমান অথচ সে বড় অলস, অধ্যাবসায় নাই। স্বর্গীয় পিতাঠাকুর এই পুষ্করণী কর্ত্তন করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত শব্দযুগ্মকগুলির মধ্যে অর্থের কি পার্থক্য আছে নির্ণয় কর ঃ—

গোলক—গোলোক, অণু—অনু, কুল—কূল, কাস—কাশ, পরশ্ব—পরস্ব, তদীয়—ত্বদীয়, বিক্রত—বিক্রীত, নীর—নীড়, সজাতি—

—স্বজাতি; স্বত্ব—সত্ব, লক্ষ—লক্ষ্য, লক্ষ্মণ—লক্ষণ, সর্গ—স্বর্গ, পরিচ্ছদ—পরিচ্ছেদ, উপাদান—উপাধান, সর—স্বর, প্রণতা—প্রণেতা, শ্বশ্রু—শ্মশ্রু, উন্নত—উদ্ধত, কাট—কাঠ, ক্রোড়—ক্রোর, কোটি—কটি, কোন্—কোণ, বিনীত—বিনত, চির—চীর, শাপ—সাপ, শাল—সাল।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির বর্ণাশুদ্ধি থাকিলে দূর কর :—

কৃতীত্ব, যশোপ্রভা, লাবন্য, বাস্পিয়, মূর্দ্ধণ্য, শুর্পনখা, জটীল, সুসুপ্তি, স্পৃহনীয়, শরিসৃপ, দুর্ণাম, চব্যচুষ্য, প্রজ্জ্বলিত, প্রশস্থ, বিগ্যান, সংজ্ঞ, সংখ্যা, মুহ্যমান, কৃত্তিম, ভিষ্ম, বধু, দুষিত, অরন্যাণী, পানিণী, পৌড়, বাণপ্রস্থ, স্বাক্ষর, দ্বিতীয়, তৃতীয়, দুরিভূত, পরান্মুখ, দুরন্ত, উদ্বিগ্ন, ভগ্নি, ··· স্থিত, ব্যাপ্ত, অসৌচ, একাধিক্রমে, অধীরাজ, পঙ্কত্ব, ভ্রখ্যেপ, বিখ্যাত, ব্যাখ্যা, টিকা, স্বাপদ, অদ্রি, বিন্ধ্যাচল, বন্দ্যোপাধ্যায়, দন্দ, উত্তির্ণ, আমাবশ্যা, ভাগ্যমানী, পক্ষীজাতী, মিমাংসা, ইদৃশ, আল্হাদিত, স্বহায়, মধুসুধন, বিদুষী, কমণ্ডুল, উৎপাত, পারাবৎ, ভাগবৎ, উর্ম্মিলা, শান্তনা, বাগ্মীতা, কথকতা, সিমন্ত, সিন্দুর।

বিপরীতার্থক শব্দ

একটি শব্দের বিপরীত অর্থ যে শব্দে প্রকাশিত হয়, সে শব্দটিও জানিয়া রাখিলে অথবা কোন্ দুইটি শব্দ পরস্পর **বিপরীতার্থক** তাহা জানিলে ভাব-প্রকাশের যথেষ্ট সুবিধা হয়। পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দগুলি অনেক সময় **এক সঙ্গেই** প্রযুক্ত হয়। যেমন—লাভক্ষতি, জমা-খরচ, উত্থানপতন, শুকোহাজা, আয়ব্যয়, সুখদুঃখ ইত্যাদি।

কখন কখন দুইএর মিলনে **তৃতীয়** একটি অর্থের প্রকাশ হয়। যেমন—উত্তমমধ্যম, আকাশপাতাল, ওলাউঠা, চরাচর, জীবন্মৃত, ক্ষতিবৃদ্ধি, মিঠে কড়া, পণ্ডিত মূর্খ, ব্যস্তসমস্ত ইত্যাদি।

কয়েকটি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দের তালিকা দেওয়া হইল :
রুষ্ট—**তুষ্ট**। নবীন—**প্রবীণ**। সুশীল—**দুঃশীল**। উত্তমর্ণ—**অধমর্ণ**।
সহযোগী—**প্রতিযোগী**। সাম্য—**বৈষম্য**। দ্রুত—**মন্থর**। সাবালগ
—**নাবালগ**। সোজা—**বাঁকা**। বোকা—**সেয়ানা**। স্থাবর—**জঙ্গম**।
সরু—**মোটা**। কাঁচা—**পাকা**। জাগন্ত—**ঘুমন্ত**। পুণ্য—**পাপ**।
শূন্য—**পূর্ণ**। বৃদ্ধি—**হ্রাস**। সফল—**বিফল**। দক্ষিণ—**বাম**। অনুকূল
—**প্রতিকূল**। সধবা—**বিধবা**। আস্তিক—**নাস্তিক**।

প্রয়োগ—আমার **আহ্বান**ও নাই, **বিসর্জন**ও নাই। শালগ্রামের **উঠা-বসা**, অন্ধের **দিনরাত**, মজুরের **হাসি-কান্না** দুইই সমান। **আগা** কেটে গোড়ায় জল ঢেলে ফল কি? **তিরস্কার-পুরস্কার**, **মান-অপমান**, **স্তুতিনিন্দা**, **লাভক্ষতি** দুইই সমান। সাত **নকলে আসল** খাস্তা। **ছেলের** মুখে **বুড়োর** কথা। বড় হবিত **ছোট** হ'। বজ্র **আঁটুনি ফস্কা** গেরো।

বাক্যাঙ্গের সংহতি

পূর্ণ বাক্যকে অথবা বাক্যের অনেক অঙ্গকে এককথায় প্রকাশ করা যাইতে পারে: যেমন—গুরুর আদেশ শিরে ধারণ করিবার যোগ্য,—এই বাক্যের একটি অঙ্গ—**শিরে ধারণ করিবার যোগ্য**। ইহাকে সংহত করিয়া **শিরোধার্য্য** বলা যাইতে পারে। যে প্রদীপ নিভিয়া যাইতেছে এই বাক্যটির বদলে **নিভন্ত**—শব্দটি প্রয়োগে করা যাইতে পারে।

বাক্যাঙ্গের সঙ্কোচন করিতে হইলে ব্যাকরণের **সমাস**, **তদ্ধিত** ও **কৃদন্তের** জ্ঞান যথেষ্টরূপে থাকা চাই। সেজন্য ইহা উচ্চতর শ্রেণীর পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। এ পুস্তকে মাত্র দুইচারিটির উদাহরণ দেখানো যাইতেছে। **ভাবার্থ-রচনায়** ইহা বড় কাজে লাগে।

যাহা দেখা যাইতেছে—**দৃশ্যমান**। যাহা কাঁপিতেছে—**কম্পমান**। তিনি বন্দনার যোগ্য—**বন্দনীয়**। যিনি নমস্কার পাইবার যোগ্য—**নমস্য**। জয় করিবার ইচ্ছা—**জিগীষা**। যাহা ধূম উদ্গিরণ করিতেছে—**ধূমায়মান**। দক্ষের কন্যা—**দাক্ষায়ণী**। রঘুর সন্তান—**রাঘব**। শক্তির উপাসক—**শাক্ত**। সর্ব্বাপেক্ষা লঘু—**লঘিষ্ঠ**। প্রায় পিতার মতন—**পিতৃকল্প**। ঈশ্বরে বা পরলোকে যাহার বিশ্বাস নাই—**নাস্তিক**। সমস্ত জীবন ধরিয়া—**যাবজ্জীবন**। যাহার কিছুই নাই—**অকিঞ্চন**। যাহা নিবারণ করা যায় না—**অনিবার্য্য**। পুরোহিতের—**পৌরোহিত্য**। জজের কাজ—**জজিয়তি**। উকিলের কাজ—**ওকালতি**। যাহা ন্যায়ের অনুগত—**ন্যায্য**। বয়সে তুল্য—**বয়স্য**। ভস্মে পরিণত—**ভস্মীভূত**।

উচ্চারণ-সাম্যে অর্থ ভ্রান্তি

দুইটি শব্দের মধ্যে যদি উচ্চারণের মিল থাকে, তাহা হইলে অনেক সময় তাহাদের মধ্যে গোলমাল ঘটে। যে সকল শব্দের মধ্যে এই গোলযোগ ঘটে—তাহাদের কয়েকটির তালিকা এখানে দেওয়া হইল। **উদ্দেশ্য**—লক্ষ্য, **উদ্দেশ**—অভিমুখ। **পটল**—সমূহ, **পটোল**—খাদ্য বিশেষ। **ক্রীড়া**—খেলা, **ক্রিয়া**—কার্য্য। **পরিচ্ছদ**—পোশাক, **পরিচ্ছেদ**—অধ্যায়; **গৃহিণী**—গৃহলক্ষ্মী, **গ্রহণী**—রোগবিশেষ। **পরিষদ্**—সভা, **পারিষদ**—সভ্য। **নীড়**—কুলায়, **নীর**—জল। **আবরণ**—আচ্ছাদন, **আভরণ**—অলঙ্কার। **গোলক**—গোল, **গোলোক**—বিষ্ণুলোক। **আহূত**—যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে, **আহুত**—যাহা হোমানলে সমর্পিত। **উপরন্তু**—অধিকন্তু, **পরন্তু**—বরং। **কপাল**—ললাট, **কপোল**—গাল। **চুরি**—হরণ, **চুড়ি**—

গহনা বিশেষ। এইরূপ দেশ—দ্বেষ, স্বর—শূর, দুল—কূল, দূত—দ্যুত, চূত—চ্যুত, বলি—বলী, ধনী—ধুনী, মণি—মুনি, জাতি—জাতী, দ্বীপ—দ্বিপ, স্বত্ব—সত্ত্ব, দিন—দীন, তির—তীর, টিকা—টীকা, মরা—মড়া, চরা—চড়া, পাট—পাঠ, কুড়ে—কুঁড়ে, পার—পাড়, বার—বাড়, চাল—চা'ল, দ্বার—দার, গুড়—গূঢ় ইত্যাদির অর্থ-পার্থক্য জানিতে হইবে।

বাক্যের রূপ-পরিবর্ত্তন

(১) পদপরিবর্ত্তন দ্বারা

বিশেষ্য হইতে বিশেষণ ও **বিশেষণ** হইতে বিশেষ্যপদ গঠন ব্যাকরণের গণ্ডীর অধীন। দুই ভাবে ইহা নিষ্পন্ন হইতে পারে।

(১) শব্দের উত্তর প্রত্যয়যোগে অর্থাৎ **তদ্ধিতের** নিয়মানুসারে যথা—(ক) লোক (বি), লোক+ষ্ণিক—**লৌকিক** (বিণ)। **পঙ্ক** (বি) পঙ্ক+ইল—**পঙ্কিল** (বিণ)। **হেম** (বি), হেম+ষ্ণ—**হৈম** (বিণ)।

(খ) **শীত** (বিণ), শীত+ষ্ণ্য—**শৈত্য** (বি)। **মহৎ** (বিণ), মহৎ+ত্ব—**মহত্ত্ব** (বি)। **নীল** (বিণ), নীল+ইমন্—**নীলিমা** (বি)।

(২) শব্দটি যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, সেই ধাতুর উত্তর প্রত্যয়যোগে অর্থাৎ **কৃদন্তের** নিয়মানুসারে। যথা—(ক) **দান** (বি), দা+তব্য—**দাতব্য** (বিণ), দা+ক্ত—**দত্ত** (বিণ), দা+যৎ—**দেয়** (বিণ)।

(গ) **মুক্ত** (বিণ), মুচ+ক্তি—**মুক্তি**, মুচ্+অনট্—**মোচন**। **হত** (বিণ), হন্+অল্—**বধ**, হন+ঘঞ্—**ঘাত**, হন্+অনট্—**হনন**।

বাক্যের রূপ-পরিবর্ত্তনে এই জ্ঞানে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া এই পুস্তকে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

বালকটির **মেধা** আছে বলিয়া জানিতাম।

মেঘগর্জ্জনে **ভয়** করিও না।

এই বাক্য দুইটিকে অন্যভাবেও প্রকাশ করা যায়। যেমন—

বালকটিকে **মেধাবী** বলিয়া জানিতাম।

মেঘগর্জ্জনে **ভীত** হইও না।

মেধা হইতে বিশেষণ **মেধাবী**, **ভয়** হইতে বিশেষণ **ভীত**—ইহা জানিলে বাক্য দুইটির এইরূপ পরিবর্ত্ত। সম্ভবপর হইবে। আবার—**বুদ্ধিমান্** বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র **সমাদৃত** হন,—এই বাক্যটির ভাব অন্যরূপেও ব্যক্ত করা যায়। যেমন—**বুদ্ধিমত্তার** জন্য তিনি সর্ব্বত্র **সমাদর** পা'ন। এখানে **বুদ্ধিমান্** ও **সমাদৃত** হইতে বিশেষ্যপদ যথাক্রমে **বুদ্ধিমত্তা** ও **সমাদর**—ইহা জানিলে বাক্যটির এই প্রকার রূপান্তর সাধন সম্ভবপর হইবে।

(ক) বিশেষণ হইতে বিশেষ্য—

গুরু—**গরিমা, গুরুত্ব, গৌরব**। দীর্ঘ—**দৈর্ঘ্য**। সুরভি—**সৌরভ**। সুপ্ত—**সুপ্তি**। ভীত—**ভয়, ভীতি**। তরল—**তারল্য**। বিহিত—**বিধান**। শিথিল—**শৈথিল্য**। আর্ত্ত—**আর্ত্তি**। অভ্যস্ত—**অভ্যাস**। ধ্বস্ত—**ধ্বংস**। কৃতী—**কৃতিত্ব**। চঞ্চল—**চাঞ্চল্য**। সুকুমার—**সৌকুমার্য্য**। মধুর—**মাধুরী, মধুরতা, মাধুর্য্য, মধুরিমা**। কুল—**কুলীন**। দস্ত—**দস্তুর**। অগ্নি—**আগ্নেয়**। বিধি—**বৈধ**।

(খ) বিশেষ্য হইতে বিশেষণ—

কর্ম্ম—**কর্ম্মঠ**। নিশা—**নৈশ**। বাত—**বাতুল**। বন—**বন্য**। লোম—**লোমশ**। জটা—**জটিল**। স্মরণ—**স্মৃত, স্মরণীয়**। অধিকার—**অধিকৃত**। বিজয়—**বিজিত**। প্রণাম—**প্রণম্য**। উদ্বেগ—**উদ্বিগ্ন**। অপচয়—**অপচিত**। ন্যায়—**ন্যায্য**। সন্ধ্যা—**সান্ধ্য**।

(ক)

বিশেষণ—এই পথ পাঁচ ক্রোশ **দীর্ঘ**।

বিশেষ্য—এই পথের **দৈর্ঘ্য** পাঁচ ক্রোশ।

বিশেষণ—শৈশবে আমাদের জীবন ছিল **সুকুমার** ও **মধুর**।

বিশেষ্য—শৈশবে আমাদের জীবনে ছিল **মাধুর্য্য** (**মাধুরী**) ও **সৌকুমার্য্য**।

বিশেষণ—বৃদ্ধ বয়সে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ **শিথিল** হইয়া পড়ে।

বিশেষ্য বার্দ্ধক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে **শৈথিল্য** বাড়ে অথবা বার্দ্ধক্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ **শিথিলতা** প্রাপ্ত হয়।

বিশেষণ—তোমার গান শুনিয়া **আনন্দিত** হইলাম।

বিশেষ্য—তোমার গান শুনিয়া **আনন্দ** পাইলাম।

বিশেষণ—বঙ্গদেশ তখন আকবরের **অধিকৃত**।

বিশেষ্য—বঙ্গদেশ তখন আকবরের **অধিকারে**।

বিশেষণ—মাতাপিতা আমাদের **প্রণম্য**।

বিশেষ্য—মাতাপিতাকে আমাদের **প্রণাম** করা উচিত।

বিশেষণ—কন্যাও সযত্নে **পালনীয়** ও **শিক্ষণীয়**।

বিশেষ্য—কন্যাকেও সযত্নে **পালন** করা ও **শিক্ষা** দান করা উচিত।

বিশেষণ—আপনার আচরণে **সন্তুষ্ট** ও **প্রীত** হইলাম।

বিশেষ্য—আপনার আচরণে **সন্তোষ** ও **প্রীতি** লাভ করিলাম।

(খ)

বিশেষ্য—**দারিদ্র্যের** জন্য কাহাকেও অবহেলা উচিত নয়।

বিশেষণ—**দরিদ্র** বলিয়া কাহাকেও অবহেলা করা উচিত নয়।

বিশেষ্য—ইহাতে তাঁহার **মহত্ত্বেরই** প্রমাণ হয়।

বিশেষণ—তিনি যে **মহৎ** (মহান্), ইহাতে তাহাই **প্রমাণিত** হয় ।

বিশেষ্য—আকাশের **নীলিমা** সমুদ্রের **নীলিমার** হেতু ।

বিশেষণ—আকাশ **নীল** বলিয়াই সমুদ্রও **নীল** ।

বিশেষ্য—আমার **পুরস্কার** ও **প্রশংসা** পাইবার কথা, ভাগ্য-দোষে পাইলাম **তিরস্কার** ও **ধিক্‌কার** ।

বিশেষণ—আমার **পুরস্কৃত** ও **প্রশংসিত** হইবার কথা, ভাগ্যদোষে হইলাম **তিরস্কৃত** ও **ধিক্‌কৃত** ।

বিশেষ্য—এই অর্থ আমি বহুকষ্টে **সঞ্চয়** করিয়াছি, ইহার **অপচয়** হইলে বড় **ব্যথা** পাইব ।

বিশেষণ—আমার এই অর্থ বহু কষ্টে **সঞ্চিত**, ইহা **অপচিত হইলে ব্যথিত** হইবে ।

বিশেষ্য—ইহাতে **উদ্বেগ, শঙ্কা** ও **চাঞ্চল্যের** কারণ কি ?

বিশেষণ—ইহাতে **উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত** ও **চঞ্চল** হইবার কারণ কি ?

(৪) অন্যান্য বিবিধ উপায়ে

বাক্যের রূপ নানাভাবেই পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে ।

১। কর্ম্মবাচ্যের বাক্যকে **কর্ত্তৃবাচ্যে** ও কর্ত্তৃবাচ্যের বাক্যকে **কর্ম্মবাচ্যে** বা **ভাববাচ্যে** পরিণত করা যাইতে পারে । যেমন—

আমি তাহাকে দণ্ড দিয়াছি । সে আমার দ্বারা দণ্ডিত হইয়াছে ।

মেয়েটি আমার দেখা হইয়াছে—আমি মেয়েটিকে দেখিয়াছি ।

এখন আপনি স্নান করুন ।—এখন আপনার স্নান হউক ।

ভিতরে আসিয়া বসা হউক—ভিতরে আসিয়া বসুন ।

২। সরলবাক্যকে **মিশ্রবাক্যে** এবং মিশ্রবাক্যকে **সরলবাক্যে** পরিণত করা যায় । যথা—

(ক) সুবৃষ্টি হইতে ফসল অবশ্য ভালই হইবে।

যদি সুবৃষ্টি হয়, তবে ফসল অবশ্য ভালই হইবে।

(খ) তাহার নাম করিবামাত্র সে আসিয়া হাজির।

যেমনি তাহার নাম করা গেল, অমনি সে আসিয়া হাজির।

(গ) যদিও তিনি খঞ্জ, তবুও তিনি দ্রুত চলিতে পারেন।

খঞ্জ হইলেও তিনি দ্রুত চলিতে পারেন।

৩। প্রশ্নাত্মক বাক্যকে **নিষেধাত্মক** ও নিষেধাত্মক বাক্যকে **প্রশ্নাত্মক বাক্যে** পরিণত করা যায়। যেমন—

(ক) যত্ন বিনা কি রত্ন মিলে? যত্ন বিনা কখনও রত্ন মিলে না।

(খ) সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। সোজা আঙুলে কি ঘি ওঠে?

৪। প্রশ্নাত্মক বাক্যকে **সাধারণ** বাক্যেও পরিণত করা যায়—

কে না জানে সুরাপানই বিষপান?

সকলেই জানে সুরাপানই বিষপান।

৫। সাধারণ বাক্যকে **নিষেধাত্মক** ও নিষেধাত্মক বাক্যকে **সাধারণবাক্যে** পরিণত করা যায়। যেমন—

(ক) তিনি এতক্ষণে নিঃসংশয় হইলেন।

এত ক্ষণে তাঁহার মনে আর কোন সংশয় রহিল না।

(খ) এই ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার বর্ণনা দেওয়া চলে না।

এই ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা বর্ণনাতীত।

৬। **বিপরীতার্থক** শব্দের দ্বারাও বাক্যের রূপ পরিবর্তন হইতে পারে।

(ক) রাজার ছেলেটি এখনও সাবালক হয় নাই।

রাজার ছেলেটি এখনও নাবালক।

(খ) তিনি জীবিত নাই।—তিনি মৃত।

৭। কোন কোন বাক্যাঙ্গকে **একপদে** বা এক—একটি পদকে **বাক্যাঙ্গে** (Clause of Phrase) পরিণত করিয়াও রূপপরিবর্ত্তন চলে।

(ক) আমার যাহা সাধ্যে কুলায়, তাহা করিব।
আমি যথাসাধ্য করিব।

(খ) তুমি এই রোগে যাবজ্জীবন কষ্ট পাইবে।
যত দিন বাঁচিবে (ততদিন এই রোগে কষ্ট পাইবে।

৮। পরোক্ষ বাক্যকে **অপরোক্ষ বাক্যে** (Indirect Narration) ও অপরোক্ষ বাক্যকে **পরোক্ষ বাক্যে** (Direct Narration) পরিণত করা যায়। যেমন,—

(ক) তিনি আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলিলেন।
তিনি আমাকে বলিলেন "চুপ করিয়া থাক।"

(খ) প্রতাপ বলিলেন—"কিছুতেই মাথা নোয়াইব না।"
প্রতাপ বলিলেন, তিনি কিছুতেই মাথা নোয়াইবেন না।

৯। বাক্যের **কারকের পরিবর্ত্তনেও** বাক্যের রূপ বদলায়।

(ক) তোমার সঙ্গীত চিরদিনই আমাকে আনন্দ দেয়।
তোমার সঙ্গীতে চিরদিনই আমি আনন্দ পাই।

খ) বাষ্প হইতেই মেঘের জন্ম হয়। বাষ্পই মেঘের জন্মদাতা।

১০। এক বাক্যকে পৃথক্ পৃথক্ **সরলবাক্যে** ভাঙ্গিয়া প্রকাশ করা যায় এবং অনেকগুলি বাক্যকে এক **বাক্যে** পরিণত করা যায়।

(ক) আষাঢ়ের প্রথমে একেবারে বৃষ্টি না পড়ায়, আষাঢ়ের শেষে অতিবৃষ্টি হওয়ায়, ব্রহ্মাণী নদীতে বন্যা আসায় ও বীচনের অভাবে শ্রাবণেও আবাদ করিতে না পারায়, এ অঞ্চলে এবার ধান্য জন্মে নাই। আষাঢ়ের প্রথমে একেবারে বৃষ্টি পড়িল না। আষাঢ়ের শেষে আবার আবার অতিবৃষ্টি হইল। তাহাতে ব্রহ্মাণী নদীতে। বন্যা আসিল। বীচনের

অভাবে শ্রাবণেও আবাদ করিতে পারা গেল না। এই সকল কারণে এবার এ অঞ্চলে ধান্য জন্মে নাই

(খ) রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৎপরে তিনি সযত্নে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। পুত্র ও প্রজার মধ্যে তাঁহার বিশেষ-জ্ঞান (ভেদজ্ঞান) ছিল না।

রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে এক পদে পরিণত কর :—

(১) যিনি প্রণামের যোগ্য। (২) যাহা ভস্মে পরিণত। (৩) পান করিতে ইচ্ছুক। (৪) কুন্তীর নন্দন। (৫) যাহা উড়িতেছে। (৬) যাহা উদিত হইতেছে। (৭) গুরুর কাজ। (৮) যাহারা একসঙ্গে পড়ে। (৯) জন্ম হইতে। (১০) আট প্রহর যাহা চলে। (১২) চারিটি রাস্তা যেখানে মিলিয়াছে। (১২) যাহা সহজে নিবারণ করা যায় না। (১৩) অতিথির সৎকার। (১৪) পশ্চিম দেশীয়। (১৫) দক্ষিণ দেশীয়। (১৬) যাহা খণ্ডন করা যায় না। (১৭) যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, সীমা নাই। যাঁহাকে জানা যায় না।

অর্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যে কোন ভাবে পরিবর্ত্তিত কর :—

(ক) যিনি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তিনিই প্রকাশ করিয়াছেন। (খ) যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে। (গ) বিপদ্ ঘটিলে কি করা যাইবে ? (ঘ) তোমার আচরণ সকলেরই প্রীতি উৎপাদন করে। (ঙ) যতটা শক্তি চেষ্টা করিব, তারপরভাগ্যে থাকিতে হইবে। (চ) বসিতে জানিলে

উঠিতে হয় না। (ছ) তাহার খাওয়া হয় নাই, যাওয়া হইবে কি করিয়া? (জ) তিনি যেখানেই যান সেখানেই বিজয়ী হ'ন। (ঝ) বরং ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবু তোমার ভাত খাইব না। (ঞ) ধনীরা ভিখারীর ভয়ে দুয়ারে দারোয়ান রাখে। (ট) তাহার পরিণাম ভাবিয়া কাজ করার শক্তি নাই। (ঠ) যত্ন কর, রত্ন পাইবে।

লক্ষ্যার্থক বাক্যাঙ্গ

(Idioms and Idiomatic Phrases)

দুই বা ততোধিক শব্দের মিলনে একশ্রেণীর বাক্যাঙ্গ গঠিত হয়, যাহাদের অর্থ ঐ শব্দগুলির অর্থ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। এইগুলিকে ইংরাজীতে idiom, ভূদেববাবু ইহাকে বলিতেন চলিৎ গৎ। ভাষা সরস করিবার জন্য এবং বাক্যালঙ্কার-সৃষ্টির জন্য এইগুলি প্রযুক্ত হয়। ইহাদের কতকগুলি মার্জ্জিত ভাষার পক্ষে উপযোগী, কতকগুলি চলতি ভাষার উপযোগী। 'কোমর বেঁধে লাগা'—একটি বাঙ্গাল চলতি গৎ। ইহার অর্থ 'কটিবন্ধন করিয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়া' নয়—ইহার অর্থ 'আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত কার্য্যে ব্রতী হওয়া'। কোমর বাঁধিয়া লাগা-কে মার্জ্জিত করিয়া 'কটিবন্ধন করিয়া লগ্ন হওয়া'—এই প্রকার বলা চলে না। তাহাতে উহার বিশিষ্ট অর্থ নষ্ট হইয়া যাইবে এবং ভাষাই অশুদ্ধ হইয়া পড়িবে। 'চলতি গৎ'কে মার্জ্জিত ভাষায় রূপান্তরিত করিলে ভাষা কিরূপ বিশ্রী এবং কিরূপ অশুদ্ধ হয়, নিম্নলিখিত অংশ হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইবে।

'ফটিক, তুমি আমাদের গৃহের সন্তান, তোমাকে আমরা স্নেহের নেত্রে দর্শন করি। পিতৃদেব অর্থ সাহায্য করিয়া তোমাকে মনুষ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তোমার সমীপে কোন বাক্য লুক্কায়িত করিব না আমরা অধুনা বৃহৎ অর্থসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি; ঋণে আমাদের

মস্তকের কেশসকল পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া আছে—দুই বেলা উদর-পরিচালনাও সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। যখন সুদিন ছিল তখন দুই হস্তে অর্থ উড্ডয়ন করিয়াছি, তখন স্বপ্নাবস্থাতেও চিন্তা করি নাই যে, এইরূপ দিবস আগমন করিবে। তুমি যদি এই সময় কিঞ্চিৎ সাহায্য কর, তবে আমাদের বদন রক্ষা হয়।"

ব্যাকরণ-দোষ না থাকিলেও এই ভাষা বিশুদ্ধ নয়।

ইহার বিশুদ্ধরূপ এই—'ফটিক, তুমি আমাদের ঘরের ছেলে, তোমাকে আমরা স্নেহের চোখে দেখি। পিতাঠাকুর টাকাকড়ি সাহায্য ক'রে তোমাকে মানুষ ক'রে তুলেছেন। তোমার কাছে কোন কথা লুকাব না। আমরা আজকাল বড় পয়সা-কড়ির টানাটানিতে পড়েছি। দেনায় আমার মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত বিকিয়ে গেছে—দুবেলা পেট-চালানোও শক্ত হয়ে পড়েছে। যখন সুসময় ছিল দু-হাতে টাকপয়সা উড়িয়েছি। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এমন দিন আসবে। তুমি যদি এ সময় কিছু সাহায্য কর, তবে আমাদের মুখ রক্ষা হয়।"

বাঙলা ভাষার এই চলতি গৎ মার্জ্জিত ভাষার পক্ষে উপযোগী নয়, চলতি ভাষার পক্ষেই উপযোগী। তবে মার্জ্জিত ভাষাতেও চলতি গৎ আছে। যেমন—কালনেমির লঙ্কাভাগ, ছত্রভঙ্গ হওয়া, পৃষ্ঠ-প্রদর্শন, অরণ্যে রোদন, অর্দ্ধচন্দ্রদান, জলাঞ্জলি দেওয়া, চর্ব্বিতচর্ব্বণ করা, উভয়-সঙ্কটে পড়া, শশব্যস্ত হওয়া, ব্যস্তসমস্ত হওয়া, গলবস্ত্রে নিবেদন করা, উত্তমমধ্যম দেওয়া, ইন্দ্রপাত হওয়া, চক্ষুঃশূল হওয়া, বদ্ধপরিকর হওয়া ইত্যাদি।

চলতি ভাষার কতকগুলি গৎ—কানভারী করা, মুখ চুণ করা, গা মাথায় করা, তোলপাড় করা, মন কেমন করা, হাল ছাড়িয়া দেওয়া, ধরাকে সরা জ্ঞান করা, স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া অকুল, পাথারে পড়া,

কেঁচে গণ্ডুষ করা, নাম কেনা, হাত করা, ভাতে মারা, তাক লাগানো, হাতসানি দেওয়া, গায়ে কাঁটা দেওয়া, হাততালি দেওয়া, বিষম খাওয়া, দোহাই দেওয়া, নাকে খৎ দেওয়া, পিঠটান দেওয়া, কানে তালা ধরা, চোখে ধূলো দেওয়া।

এই সকল চলিত গৎগুলিকে ব্যবহার করিতে হইলে বাক্যের ভাষার সহিত আগাগোড়া সামঞ্জস্য থাকা চাই। সভাভঙ্গের পরই সভাপতি মহাশয় 'চম্পট দিলেন' বা 'লম্বা দিলেন' অথবা দারুণ পুত্রশোকে তাহার হৃদয় 'ফুটিফাটা হইয়া গেল',—এইরূপ বাক্য চলিবে না।

কয়েকটি ক্রিয়ামূলক গতের প্রয়োগ—হাল ধরা—রাজা নাই, রাজ্যের হাল ধরে কে? **হাল ছাড়া**—হাল ছাড়লে চলবে না, আবার চেষ্টা কর। **পাশ কাটানো**—পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছ যে! **উপর চাল চালা**—বাইরে থেকে উপর চাল চাললে হবে না, কাজে লাগ। সে কাজ হাসিল করিয়া গা-ঢাকা দিয়েছে, তার আর পাত্তা পাওয়া যাবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লোকে যদি দু-পয়সা কামায় বা জমায়, তাতে তোমার চোখ টাটায় কেন? বাংলার ক্ষেতে ত সোনা ফলে, কিন্তু বন্যা এসে সব নয়ছয় ক'রে দেয়, দেশে হা-অন্ন হা-অন্ন ব'লে হাহাকার প'ড়ে যায়, পল্লীসংসার ছারখারে যায়, চাষীরা ললাটে করাঘাত করে।

অনুশীলনী—নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলি বাক্যে ব্যবহার কর :—

টান দেওয়া, ঘুস খাওয়া, তাল ঠোকা, গালি পাড়া, জল হওয়া, চা'ল চালা, জল কাটা, ফল ধরা, জের টানা, ঘাট মানা, কাৎ হওয়া, তাল রাখা, মুখ চাওয়া, জ্বাল দেওয়া, সুতা কাটা, হাঁড়ী কাড়া, বায়না ধরা, বায়না লওয়া, হাই তোলা, জনরব তোলা, মায়া কান্না কাঁদা, কাট হওয়া, গায়ের ঝাল ঝাড়া, মাঠ-মাঠ হওয়া, নাক ডাকানো, চাঁদ-পারা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছেদ-বিন্যাস

আমরা যখন অন্যের সঙ্গে কথা বলি, তখন বক্তব্যটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য মাঝে মাঝে আমাদিগকে একটু আধটু থামিতে হয়; ঝড়ের মত অবিরাম বলিয়া গেলে লোকে ভাল বুঝিতে পারে না। লিখিবার সময়ও একটানা অবিরাম কেবল শব্দের পর শব্দ বসাইয়া গেলেও বুঝিবার অসুবিধা হয়। সে-জন্য লেখার মাঝে মাঝে ছেদ বসাইতে হয়। সব জায়গায় সমান থামিবার প্রয়োজন হয় না, কোথাও বেশি, কোথাও কম থামিতে হয়। একটি শব্দের পর যতটা থামিবার প্রয়োজন, একটি বাক্যশেষের পর তাহার চেয়ে ঢের বেশিক্ষণ থামিবার প্রয়োজন হয়। আবার একটি দীর্ঘ বাক্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পর অথবা ছোট ছোট বাক্যের পর দুইএর মাঝামাঝি সময় থামিতে হয়। এইজন্য ছেদের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়।

ছেদ-চিহ্ন ছাড়া আরও কতকগুলি চিহ্ন আছে, সেগুলিরও ব্যবহারের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। যেমন,—(১) উদ্ধরণ-চিহ্ন (“—”)। পরের জবানী বা দ্বিতীয় ব্যক্তির মুখের কথা বুঝাইতে হইলে এই চিহ্নের প্রয়োজন।

ছেদ-চিহ্নগুলি ভিন্ন-ভিন্ন বাক্যের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেয়,—বাক্যের ক্রম বুঝায়, কোথায় কোন্ বাক্যের শেষ তাহাও জানাইয়া দেয়। আবার একটি বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ ও প্রধান-অপ্রধান ভাগ দেখাইয়া দেয়। কণ্ঠস্বরের যে সকল ভঙ্গীর জন্য মুখের কথা সহজবোধ্য হয়,—সেই সকল ভঙ্গী বুঝাইবার জন্যও কতকগুলি চিহ্ন আছে। লেখার মধ্যে চিহ্নগুলিকে বসাইলে পড়িবার সময় আপনা হইতেই সেই ভঙ্গীগুলিই গলায় আসিয়া পড়ে।

বাঙ্গালা-ভাষায় এই সকল ছেদ-চিহ্ন ছিল না, কেবল কবিতার পংক্তির শেষে এক দাঁড়ি (।) ও যে পংক্তিটি তাহার সঙ্গে মিলিত তাহার শেষে দুই দাঁড়ি (॥) বসানো হইত। পংক্তির শেষে ভাবাবসান বা বাক্য শেষ হইল কিনা তাহাও দেখা হইত না। যেমন,—

একচক্রাপুরে এক বিপ্রের আবাসে।
বঞ্চেন পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণের বেশে॥

বাঙ্গালা-ভাষায় এখন যে ছেদগুলি চলিতেছে, তাহাদের সমস্তই ইংরাজী হইতে গৃহীত। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের ভাষায় ইংরাজী নিয়মে ছেদ-প্রয়োগের প্রথার প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে মোটামুটি আলোচনা হইয়াছে। এইখণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

কমা (,)

(ক) **স্থান—কাল-পাত্রাদির পরিচয়** বুঝায়—এমন শব্দের পর অর্থাৎ পরিচায়ক পদের পর কমা বসাইতে হয়। যেমন,—

(১) ভারতের রাজধানী, দিল্লী নগরী, যমুনার তীরে অবস্থিত।

(২) সাহিত্য-সভার সম্পাদক, প্রভাত বাবু, কল্য মারা গিয়াছেন।

(খ) দীর্ঘ বাক্যে একাধিক **অসমাপিকা ক্রিয়া** থাকিলে প্রত্যেক অসমাপিকা ক্রিয়ার পর কমা বসাইতে হয়। যেমন—বরাতী জিনিস-গুলি কিনিয়া, সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া, একখানি গাড়ী ডাকিয়া, স্টেশনের দিকে চলিলাম।

(গ) **মিশ্র বাক্যের** মধ্যে কমা বসাইয়া **ভিন্ন ভিন্ন অংশকে** ভাগ করা হয়। যেমন,—

যখন আমি কলেজে পড়িতাম, তখন একদিন রবীন্দ্রনাথের জোড়া-সাঁকোর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

(ঘ) যে বাক্যে ক্রিয়া নাই, সে বাক্যের **উদ্দেশ্য** ও **বিধেয়ের** মাঝে কমা বসানো হয়। যেমন,—ফুল, তাহার চক্ষুর শূল।

(ঙ) অনেকগুলি একশ্রেণীর **বিশেষ্য, বিশেষণ** বা **ক্রিয়া** এক সঙ্গে বসিলে প্রত্যেকটির পর কমা বসাইতে হইবে। **'ও'** বা **'এবং'** দুইটি শব্দের মাঝে থাকিলে কমার প্রয়োজন হইবে না। যেমন—

(১) স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও তাম্র—এই চারিটি ধাতু প্রচুর পাওয়া যায়। (২) শ্রান্ত, ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পথিক গ্রামে উপস্থিত হইল।

(চ) কোন' **স্থানের বিস্তৃত পরিচয়** বা **ঠিকানা** জানাইতে হইলে কমা ব্যবহার করিতে হয়। যেমন,—

(১) বিলাসপুর, পোঃ আঃ বিনোদপুর, জেলা যশোহর।

(২) ৫, বৌবাজার ষ্ট্রীট, বৌবাজার, কলিকাতা।

(ছ) নামের সঙ্গে উপাধি ও অন্যান্য পরিচয় দিতে হইলেও কমার প্রয়োজন। যেমন,—

ডাক্তার শ্রীসুকুমার সেন, এম-এ, পি-এইচ্‌-ডি, অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

(জ) কাহারও উক্তি উদ্ধরণ-চিহ্ন দিয়া তুলিলে তাহার আগে কমা বসাইতে হয়। যেমন,—

(১) সে কহিল,—"আমি ইহাতে সম্মত নই।" (২) তিনি আমাকে জানাইতেছেন,—"আমার দ্বারা তাহার বেশি কিছু হইবে না।"

(ঝ) 'যে', 'অতএব', 'কারণ', 'কাজেই', 'ফলে', 'কেন-না' ইত্যাদি অব্যয়ের পরেই কমা বসে। যেমন,—

(১) আমি জানি যে, তাহার বুদ্ধি প্রখর। (২) তুমি এলে না, অতএব, তোমার দাবি নাই। (৩) আমি যাইতে পারিব না, কারণ, আমার পিতা অসুস্থ। (৪) সে যাইবেই, কেন-না, তাহার গরজ বেশি। (৫) ইহা ছাড়া, তিনি মাঝে মাঝে ধূমপানও করিতেন।

(ঞ) সম্বোধনপদের পর কমা বসানো হয়। যেমন,—বৎস, তোমার ব্যবহারে প্রীত হইয়াছি।

সেমি-কোলন (;)

কমার জন্য যতটুকু থামিতে হয়, তাহার দ্বিগুণ সময় সেমি-কোলনে থামিতে হইবে। যে সকল বাক্যের মধ্যে একটা যোগ-সূত্র আছে যাহাদের প্রত্যেকটিতে বক্তব্য একেবারে শেষ হইয়া যাইতেছে না,—একটা ভাবের ধারা চলিতেছে, সেখানে প্রত্যেক বাক্যের পর পূর্ণচ্ছেদও চলে না,—কমাও চলে না। সেখানে সেমি-কোলন বা

অর্দ্ধচ্ছেদ দেওয়াই সঙ্গত। মাঝে মাঝে **অব্যয়শব্দ প্রয়োগ না** করিলে সেমিকোলনই তাহার অভাব পূরণ করে।

(ক) দিনে ঘুমাইবে না, গ্রীষ্মকালে অবশ্য দিনে ঘুম খারাপ নয়; রাত্রিকালে দধি খাইবে না, দিনের বেলায় যত পার খাইবে; প্রত্যহ স্নান করিবে, শীতকাল ও বর্ষাকালে মাঝে মাঝে বাদ দিতে পার।

(খ) যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল; রণক্ষেত্র মৃতদেহে পরিপূর্ণ; আহতদের আর্ত্তনাদ মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে; চিল, কুকুর ও শৃগালগুলি দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কি ভীষণ দৃশ্য!

কতকগুলি মিশ্র বাক্যকে **একসূত্রে গাঁথিতে হইলে** প্রত্যেক বাক্যের পর সেমি-কোলন বসাইতে হয়।

প্রভুভক্তি শিখিতে চাও, কুকুরের কাছে শিখ; শ্রমশীলতা শিখিতে চাও, মৌমাছির কাছে যাও; সহযোগিতা শিখিতে হইলে পিপীলিকার আচরণ লক্ষ্য কর। ইতর প্রাণীদের কাছেও অনেক শিখিবার আছে।

জিজ্ঞাসা-চিহ্ন (?)

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইলে ইহা ব্যবহার করিতে হয়। যেমন—'তুমি আসিবে কি?' এই প্রশ্নটি তৃতীয় ব্যক্তির মুখ দিয়া জানাইতে হইলে ঐ চিহ্ন আর চাই না। যেমন,—সে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তুমি আসিবে কি না। সময়ে সময়ে **একটি মাত্র শব্দের পরও** জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসে। যেমন,—সুখ? সুখ কি সংসারে আছে?

প্রশ্ন না বুঝাইলেও মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা-চিহ্নের প্রয়োজন হয়। যেমন,—কে না জানে ইহাতে মানুষের হাত নাই?

অবিশ্বাস, সন্দেহ বা ব্যঙ্গ বুঝাইলে শব্দের পর ব্র্যাকেটে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন দেওয়া হয়। যেমন (১) পণ্ডিতেরাই (?) শেষে এই বিচার করিলেন। (২) মাসিকপত্রের অফিসে রাশি রাশি কবিতা (?) আসে।

বিস্ময়াদি-সূচক চিহ্ন (!)

এই চিহ্ন **মুগ্ধতা, বিস্ময়, আশঙ্কা, আনন্দ** ইত্যাদি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন—(ক) কি ভীষণ! অন্ধকারে কোলের মানুষ চেনা যায় না! (খ) আহা! যদি আমি সঙ্গে থাকিতাম! (খ) নদীতে সাঁতার দিতে কি স্ফূর্ত্তি! (ঘ) গজেন্দ্র কি অদ্ভুত মানুষ!

সম্বোধন পদের পরও ব্যবহৃত হয়। যেমন,—মহারাজ! জয় হউক।

উদ্ধরণ-চিহ্ন "—"

(ক) **মুখের কথা** যেমনটি বলা হইয়া থাকে, ঠিক তেমনটি তুলিতে হইলে " "এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। রাম কহিল—"আমি যাইতে পারিব না।"

(খ) 'কোন' **পুস্তক** অথবা **অন্যের লেখা** হইতে কিছু তুলিতে হইলেও এই চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়।

অন্য কাহারও লেখার **বাক্যাংশ** ব্যবহার করিতে হইলে **দুইটির বদলে একটি** করিয়া উদ্ধরণ-চিহ্ন দিতে হয়। যেমন, (ক) কবি বলিয়াছেন—'পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির।' 'নিশির শিশির' কেমন করিয়া 'পাতায় পাতায় পড়ে' বুঝি না।

(খ) 'জীবের ধ্রুবতারা' যাহার চিরদিনের জন্য ডুবিয়াছে—তাহার জীবনে আর কি বাকি থাকিল।

কোন' কোন' শব্দকে **বিশেষ করিয়া লক্ষ্য** করাইতে হইলে একটি করিয়া উদ্ধরণ-চিহ্ন দিতে হয়; যেমন আমরা 'মানুষ',—'মেষ' নহি

একটিমাত্র শেষের উদ্ধরণ-চিহ্নকে **এপোষ্ট্রপি** বা লোপচিহ্ন বলে। যেখানে একটি অক্ষর লুপ্ত থাকে অথবা পড়িবার সময় যেখানে সামান্য একটু স্বরের উচ্চারণের তফাৎ করিতে হয়, সেখানে এই চিহ্নটি (') ব্যবহার করা হয়। যেমন—কোন' (কোনো), হ'ল (হইল), শির'পরি (শির উপরি), চ'লে (চোলে), চা'ল (চাউল), খোদাতা'লা (খোদাতায়লা)।

ড্যাশ (—)

(১) মাঝখানে বাক্যের **গতিভঙ্গ** হইলে **ড্যাশ** (—) ব্যবহার করিতে হয়। যেমন—(ক) আমি যখন পুরীতে ছিলাম,—সত্য কথা বলিতে কি—একদিনও সমুদ্রে স্নান করি নাই। (খ) তিনি এখানে নাই,—অর্থাৎ কি না—এখান হইতে পলায়ন করিয়াছেন! (গ) "এক মণ মাছ,—যেমন ক'রে পার—নিয়ে এস।"

(২) শব্দের **পুনরাবৃত্তি** যেখানে হয়, সেখানে ড্যাশ ব্যবহৃত হয়। লোভ হইতে ধন—ধন হইতে দম্ভ—দম্ভ হইতে অধঃপতন।

(৩) **সংক্ষেপ** করিয়া অথবা **বিস্তার** করিয়া বলিতে হইলে ড্যাশ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যেমন,—অন্নকষ্ট, ম্যালেরিয়া, জলকষ্ট, মড়ক, বন্যা—এই সব লইয়াই ত বাঙ্গালা, দেশ। (খ) তাহার সবই গিয়াছে,—ধন, স্বাস্থ্য, মান ও বন্ধুস্বজন।

(৪) যেখানে **থামিয়া বলার** বিশেষ একটা **সার্থকতা** আছে। যেমন,—(ক) মেয়েটি সুন্দরী, সুশীলা, গুণবতী ও বিদুষী, কিন্তু—খঞ্জ। (খ) দুইজনের শেষে মিলন হইল, কিন্তু—মৃত্যুশয্যায়।

(৫) যেখানে বাক্যটিকে শেষ করিতেই দেওয়া হয় না। যেমন,— "আমি তবে—।" "না না কিছুতেই তোমার যাওয়া হ'বে না।"

(৬) উদাহরণ দিতে হইলে অথবা **বিস্তৃত** বা **স্পষ্ট করিয়া** বলিতে হইলে বাক্যের ভূমিকাংশের পর **কোলন-ড্যাশ** দিয়া বক্তব্য আরম্ভ করিতে হয়। যেমন,—(ক) চারিদিকে জলবেষ্টিত ভূখণ্ডের নাম দ্বীপ, যেমন:—মাদাগাস্কার, সিংহল ইত্যাদি। (খ) মানব-জীবনের ছয়টি রিপু:—কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য। (গ) তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্রটি এই:—কদাচ ধার করিবও না, ধার দিবও না।

(৭) বহুবাক্যের পরে সংক্ষেপ করিয়া শেষে একটি বাক্য ব্যবহার করিতে হইলেও বাক্যের আগে **কোলন-ড্যাশ** ব্যবহৃত হয়। যেমন—

তাহার ঘর পুড়িল, ছোট ছেলেটি মারা গেল, দেনার দায়ে বিষয় সম্পত্তি গেল :—এই সমস্ত বিপদের জন্যই তাহার এই দশা।

হাইফেন (Hyphen)

হাইফেন (-) যোগ বুঝাইবার চিহ্ন। ড্যাশ যেমন দুইটি বাক্যের মাঝে বসে, হাইফেন তেমনি দুইটি শব্দের মাঝে বসে।

যেখানে **সন্ধি** হয় না, সেখানে দুই বা ততোধিক শব্দের সমাস দেখাইতে (-) ব্যবহার করা হয়। যেমন—মৃত্যু-শয্যা, আকাশ-প্রদীপ, সূর্য্য-রশ্মি, গায়ে-পড়া, গেল-বছর, ইঁচড়ে-পাকা।

অর্থান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা **সমাসবদ্ধ** পদ দীর্ঘ হইলেই ইহার প্রয়োজন বেশি হয়। যেমন—কু-শাসন, নর-কপাল। হিন্দুদের আচার-বিচার, শিক্ষাদীক্ষা-সভ্যতার কথা।

একাধিক শব্দকে মিলাইয়া একটি **অখণ্ড সমাসের ভাব** প্রকাশ করিতে গেলে হাইফেনের সাহায্য লইতে হয়। যেমন,—আহা-মরিও নয়, ছি-ছিও নয়। যত সব গাঁয়ে-মানে-না আপনি-মোড়লের দল।

ইংরাজি-উপাধিজ্ঞাপক ভিন্ন ভিন্ন **অক্ষরের** মাঝে হাইফেন দেওয়ার প্রথা দৃষ্ট হয়। যেমন—এম্-এ, পি-এইচ-ডি, বি-কম্, বি-এল্।

আজকাল বিশেষণ 'যে' ও 'সে'র পরও হাইফেন দেওয়া হইতেছে। যেমন,—যে-কেহ এ-কাজ করিতে পারে না। সে-প্রকৃতির লোক আমি?

কোন' শব্দ যদি এক ছত্রে না ধরে, তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া কতকটা পরবর্ত্তী ছত্রে আনিতে হয়। এই বিভাগ বুঝাইবার জন্য হাইফেন দেওয়া হয়। যথা—বাঙ্গালা দেশে মহাকবি কালিদাসের পর **রবীন্দ্র-নাথের** মত এত বড় কবির আবির্ভাব আর হয় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ভাব-ব্যাখ্যান

সকল দেশেই জনসাধারণের মধ্যে কতকগুলি প্রবাদ-প্রবচন চলিয়া থাকে। এ-গুলি তাহাদের বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল অর্থাৎ তাহারা অনেক দেখিয়া এবং অনেকবার ঠেকিয়া ঠেকিয়া যাহা শিখিয়াছে, তাহাই ঐ প্রবাদগুলির আকার ধরিয়াছে। ঐ-গুলির ভিতর অনেক কথাই লুকানো আছে। সেজন্য লোকে অনেক কথা বলার দায় এড়াইবার জন্য মাঝে মাঝে ঐ-গুলি ব্যবহার করে। কারণ, ঐ-গুলি ব্যবহার করিলে অনেক কথাই বলা হয়,—বক্তার বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। ঐ-গুলির ভিতরে কি কথা সব প্রচ্ছন্ন আছে বা কি সব কথার ইঙ্গিত আছে, তাহা সকলেই জানে, সকলেই বুঝে ; কাজেই এইগুলির সাহায্যে সহজেই ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে।

প্রবাদ-প্রবচনগুলি যে সকল কথার সার কথা,—যে-সকল কথা ঐ-গুলির মধ্যে লুকানো আছে বা যে সব কথা ঐ-গুলি মনে পড়াইয়া দেয়—সে-গুলিকে উদ্ধার করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করা ছাত্রদের শিক্ষার অঙ্গ। বিশদ ব্যাখ্যান করিয়া ঐ-গুলিকে বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিতে হইলে কয়েকটি কথা মনে রাখিতে হইবে।

১। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে—প্রবাদ-বচনটির ভিতরকার (ব্যঙ্গার্থ বা লক্ষ্যার্থ) অর্থ কি? উদাহরণ-স্বরূপ—"চক্‌চক্ করিলেই সোনা হয় না," অথবা "ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়

পায়"—এই দু'টি প্রবাদ-বচনে কেবল সোনা বা পাথরের কথাই বলা হইতেছে না।

(ক) চক্‌চক্‌ করিলেই যেমন অন্য কোন' ধাতু সোনা বলিয়া গণ্য হয় না, তেমনি চক্‌চক্‌ করিলেই অর্থাৎ বাহিরে চটক, জৌলুস বা চাকচিক্য থাকিলেই কোন' জিনিস বা কোন' মানুষই সোনার মত আদর পাইতে পারে না। ইহাই ভিতরকার অর্থ।

(খ) পাথর খুব শক্ত জিনিস। পাথরের মত শক্ত আর কিছুই নাই বলিলেই হয়। সেই পাথরও যখন 'ঘষতে ঘষতে ক্ষয় পায়',—তখন পাথরের মত যাহা শক্ত নয়, তাহা ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে নিশ্চয়ই ক্ষয় পাইবে। কাজ যত শক্তই হোক, অবিরত চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে। ইহাই প্রবাদটির গূঢ় অর্থ।

এইরূপ ভাবে প্রবাদ-বচনের ভিতরকার অর্থই বাহির করিতে হইবে।

২। ভিতরকার অর্থটিকে পরিষ্কার করিয়া ব্যক্ত করিয়া তৎপরে বিষয়টির সম্বন্ধে নিজের যাহা জানা আছে, তাহা বলিতে হইবে। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে এ-সম্বন্ধে নিজের জীবনের যে-টুকু অভিজ্ঞতা আছে বা যতটুকু পড়া আছে তাহাও বলা যাইতে পারে। ঠিক ঐ-ধরণের বা ঐ ভাবের অন্য প্রবাদ জানা থাকিলে তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৩। প্রবাদ-বচনে মানব-চরিত্রের কোন' একটি দোষ বা গুণের ইঙ্গিত থাকিলে তাহার সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ লেখা চলিতে পারে।

৪। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যদি কোন' গল্প জানা থাকে তাহা হইলে সেই গল্পটি বলা যাইতে পারে। কোন' লোকের চরিত্র বা জীবনের ঘটনার সহিত গূঢ় অর্থটির মিল থাকিলেও তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পুরাণ বা ইতিহাস হইতে, ভাবের উপযোগী কাহিনী মনে পড়িলে তাহাও কাজে লাগানো যাইতে পারে।

আগাগোড়া গল্পাকারেও লেখা যাইতে পারে।

প্রশ্নোত্তরের দ্বারা এইরূপ বাক্যের ভাবটির ব্যাখ্যান হইতে পারে। 'চক্‌চক্ করিলেই সোনা হয় না'—এই প্রবাদ-বাক্যটিকেই ধরা যাক্।

ক—যা' কিছু চক্‌চক্ করে, তাই সোনা নয়। তবে এমন অনেক জিনিস আরও আছে যা চক্‌চক্ করে। তাদের দুই-একটির নাম কর দেখি।

খ—যেমন, পিতল, রাঙ, রাঙতা ইত্যাদি।

ক—এগুলি সোনা নয় কেন?

খ—সোনাও চক্‌চক্ করে, ওগুলোও চক্‌চক্ করে, শুধু চক্‌চক্ করার জন্যই সোনার এত দাম নয়। সোনার যে যে গুণ আছে, ও-গুলোর তা' নেই—কেবল সোনার চাকচিক্যটাই ওদের আছে।

ক—সোনা তবে কি ক'রে চেনা যায়?

খ—কষ্‌টি পাথরে কষলেই সোনাকে ধরা যায়। জলের সঙ্গে ওজন ক'রে দেখলে ধরা যায়, কারণ, সোনা জল হইতে উনিশ গুণ ভারী। পাত বা তার গড়াতে গেলেও বুঝা যায়। আরও অনেক পরখ আছে। সোনা সহজে ক্ষয় পায় না, সোনায় মরচে ধরে না, এইরূপ—

ক—তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে বাহিরের বাহার বা চটক-জোলুস দেখে অনেক জিনিসকে মূল্যবান্ ব'লে ভ্রম হয়—কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে

বা পরখ কর্‌লে সে ভ্রম দূর হ'য়ে যায়। উপরে বাহার থাকলেই হয় না—ভিতরে গুণ থাকা চাই। তবে ত একথা অন্যান্য জিনিস সম্বন্ধেও খাটে। তুমি একটা দৃষ্টান্ত দাও দেখি।

খ—মরীচিকাকে জল ব'লে ভ্রম হয়—কাছে গেলেই ধরা পড়ে। বুদ্ধিমান্ লোক দূর হ'তেই বুঝতে পারে। বিষাক্ত মাকাল ফলের গড়ন ও রঙ দেখে অতি সুস্বাদু ফল ব'লে মনে হয়—কিন্তু অভিজ্ঞ লোকে জানে; তাই ছেলের হাতে মাকাল ফল দেখলেই কেড়ে নেয়।

ক—আচ্ছা, মানুষ সম্বন্ধে দু' একটা দৃষ্টান্ত দাও দেখি।

খ—ছিমছাম পোষাক-পরিচ্ছদ প'রে অনেকে ভদ্রলোক সেজে বেড়ায়—কিন্তু আচরণ দেখে ঠিক করতে হয় সাধু কিনা।

অনেকের বেশ আদবকায়দা দুরস্ত এবং মুখে একেবারে মধু ঝর্‌ছে—কিন্তু তাতে তাকে সজ্জন মনে কর্‌লে অনেক সময় ভুল হ'বে। হয়ত সে পাকা জোচ্চোর। সহজে লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বা মনোহরণের জন্য ঐরূপ মিঠা-মিঠা কথা বলে।

ক—সাধারণ লোকের যখন চটক দেখে ভ্রম হয়—তখন অনেকে অসারতা ঢাকবার জন্য বাহিরের বাহারের আয়োজন ক'র্‌বে, কি বল?

খ—হাঁ—তা'ত করেই। ফোঁটা, তিলক, জটা, গেরুয়ার প্রতি লোকের অগাধ শ্রদ্ধা। তাই, অনেক ভণ্ড, শঠ ও কুচক্রী লোক সন্ন্যাসীর সাজ প'রে গালভরা উপনাম গ্রহণ করে।

জিনিস যত অসার হয়, ব্যবসাদাররা তার উপর তত পালিশ ও রঙ চড়ায়। সোনার জলে নাম লেখা, গদি-আঁটা রেশমী মলাট দিয়ে বাঁধিয়ে বড় বড় রঙিন অক্ষরে, চক্‌চকে কাগজে ছেপে গ্রন্থবণিকরা অনেক অসার মাল দিব্যি চালায়, লোক বাইরের চটক দেখে বই কেনে। বুদ্ধিমান্ লোকে কেনে না, তারা জানে—চক্‌চক্ কর্‌লেই সোনা হয় না।

'জন্ম হউক যথা তথা কর্ম্ম হউক ভাল'

(১)

উচ্চ জাতিতে বা বড় বংশে জন্মগ্রহণ করিলে সকল ব্যক্তিই স্বভাবতঃ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়ে। কিন্তু বড় বংশে জন্মিয়া যদি কেহ মন্দ আচরণ করিতে থাকে, তবে লোকে তাহাকে আর শ্রদ্ধা করিতে পারে না। নীচকুলে জন্মিয়াও যদি কেহ সৎকার্য্য করে, চরিত্রবান হয়,—পুণ্যবান হয়, তবে সেও সকলের নমস্য হইয়া পড়ে। আপন কাজের দ্বারাই মানুষ আপনার জন্মের হীনতা খণ্ডন করিতে পারে।

আমাদের দেশে জাতিভেদের সঙ্গে জাতিগত কর্ম্ম ও ব্যবসায় ঠিক করিয়া দেওয়া থাকিত। উচ্চ জাতিতে জন্মিলে, লোকে ভাল কাজ করিবার সুবিধা পাইত। নীচ জাতিতে জন্মিলে বাধ্য হইয়া মানুষকে নীচ জাতির জন্য ঠিক-করা নীচ কাজই করিতে হইত, উচ্চ কাজ করিবার সুযোগ বা অবসর খুব কম পাইত। সেজন্য দেশে নিয়ম ছিল, যে যে-জাতিকুলে জন্মিয়াছে তাহার জন্য ঠিক-করা কাজটিই যদি ভালো করিয়া কেহ করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহাকে শ্রদ্ধেয় লোক বলা হইবে।

ব্যাধও যদি তাহার কাজই ঠিক মত করিয়া চলে,—তবে সে শ্রদ্ধার পাত্র। একজন জেলে যদি নিজের ব্যবসায়ে কোন' অন্যায় আচরণ না করে, যেমন—চুরি করিয়া মাছ না ধরে—পচা মাছ ফাঁকি দিয়া চালাইতে চেষ্টা না করে,—সুবিধা পাইয়া দাম বেশি না লয়,—নিজের সমাজের লোকের উপকার করে, আত্মীয় প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে আর নিজের জাতিগত ধর্ম্ম বর্ণে বর্ণে পালন করিয়া চলে, তাহা হইলে সে সাধুসজ্জন হইল। এইভাবে কাজ করিয়া মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধ সকলের পূজ্য হইয়াছিল। রামায়ণের গুহক চণ্ডাল একজন

মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে আমরা দেখি কালকেতু ব্যাধ আপন কাজই সাধুভাবে করিত বলিয়া চণ্ডী-মাতার দয়া লাভ করিয়াছিল। ভক্ত দাদু ও রবিদাস চামারের ঘরে আর কবীর জোলার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের ধর্ম্মগুরুর মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন।

এখন আর পূর্ব্বের নিয়ম চলে না। এখন একজন লোক যে-জাতি-কুলেই জন্মলাভ করুক না কেন, সকল সমাজেই মিশিবার অধিকার পাইয়াছে—সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাদীক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছে, সকল প্রকারের ভাল কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছে। এখন কেহই আপন জাতির জন্য ঠিক-করা কাজটিই করিতে বাধ্য নয়। মানুষ এখন আপনাকে সকলপ্রকারেই বড় করিয়া তুলিতে পারে। এখন একজন চামারের ছেলেও একজন অধ্যাপক, জননেতা ব দেশশাসক হইতে পারে। একজন চণ্ডাল এখন শুধু গুহক নহে লক্ষ্মণ ভরতের মতই হইতে পারে। ইউরোপে কত ভক্তিভাজন মহাপুরুষ নীচবংশে জন্মিয়াছেন, আমাদের দেশেও জন্মিতেছেন। জন্ম যেমনই হউক, সাধনার গুণে মানুষ সকলের বড় হইয়া উঠিতেছে। বহু দিনের চেষ্টার ফলে মানুষ এই অধিকার পাইয়াছে।

(২)

শিমুল ফুল খুব উঁচু ডালে ফুটে আর পদ্ম পচাপুকুরের পাঁকে জন্মে—তবু শিমুলের আদর নাই, পদ্মের এত আদর কেন? পদ্ম নিজের গুণেই এত আদর পায়। মানুষ তেমনি নীচকুলে জন্মিলেও আপন গুণে লোক সমাজে সম্মান পায়।

কোন'-না-কোন' মানুষ একদিন আপনার গুণে আপনার সাধনার ফলে বা আপনার মাহাত্ম্যবলে একটি বংশকে বড় করিয়া তুলিয়াছেন।

তারপর যে-কেহ সেই বংশে জন্মে, সে-ই বলে, আমি বড় বংশের ছেলে,—যে বড় বংশের আদিপুরুষ, সে যেমন একদিন নিজের সাধনাতেই বড় হইয়াছিল,—তেমনই সকল কালেই যে কোন' মানুষ নীচকুলে জন্মিয়াও চেষ্টা করিলেই বড় হইয়া উঠিতে পারে—বড় বংশের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। বড় হইয়া উঠা একদিন সম্ভব হইত, এখন আর সম্ভব নয়,—এমন তো নয়। এখন বড় হওয়ার সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তাহা-ও নয়, বরং এখন সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষেত্র আরও বাড়িয়াছে।

ইউরোপ, আমেরিকায় এমন বহু লোক জন্মিয়াছেন যাঁহারা অধম-কুলে জন্মিয়াছেন বলিয়াই অধম হইয়া থাকেন নাই। তাঁহারা নিজেদের সাধনায় মহাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। জন্মের জন্য কেহই তাঁহাদিগকে অবহেলা করিতে পারে নাই; আমাদের দেশেও বহু মহাপুরুষ নীচ-কুলে জন্মিয়াও কর্ম্মগুণে সকলের নমস্য হইয়াছেন। মহাভারতে আছে—একলব্য ব্যাধের বংশে জন্মিয়াও খুব বড় বীর হইয়াছিলেন। বিদুর দাসীপুত্র হইয়াও মহাপণ্ডিত ও মহাধার্ম্মিক হইয়াছিলেন। ইতিহাসেও আমরা দেখিতে পাই, দাসীপুত্র চন্দ্রগুপ্ত ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু সম্রাট্। জোলার ছেলে কবীর, চামারের সন্তান দাদু ও রবিদাস এদেশের ধর্ম্মগুরু।

উচ্চকুলে জন্মিয়া মানুষ বড় হওয়ার অনেক সুযোগ পায়। নীচকুলে জন্মিয়াও বড় হইতে হইলে মানুষকে অনেক বাধা পার হইতে হয়। নীচকুলে জন্মিয়াও যিনি বড় হইয়া উঠিয়াছেন,—তাঁহার কৃতিত্ব অনেক-বেশি। তাঁহাকে আরও শ্রদ্ধা করা উচিত।

(৩)

নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ কর্ম্মগুণে বড় হইয়া উঠিত—পূর্ব্বকালে তাহাকে যে কেহ শ্রদ্ধা করিত না, তাহা নহে। কিন্তু সে

শ্রদ্ধা কতটা গভীর হইয়া উঠিত না; জন্মের জন্য সে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা পাইত না এবং অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাহাকে শ্রদ্ধা করিত। লোকে তাহার হীন জন্মের কথাটা বাদ দিয়া ভাবিতে পারিত না।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখন লোকে বুঝিতে পারিয়াছে—আপন জন্মের উপর যখন কাহারও নিজের হাত নাই, তখন জন্মের কথা একেবারে না তোলাই ভালো। আপন আপন কর্ম্মের উপরই প্রত্যেকের সম্পূর্ণ হাত আছে—কর্ম্মের দ্বারা মানুষের বিচার হওয়া উচিত। ক্রমেই লোকের ধারণা হইতেছে যে, বংশ-গৌরবের কোন' মূল্য নাই—উহা অসার; তাই আজকাল মানুষের মনুষ্যত্বের বিচারে বংশ, জাতি বা কুলের কথা কেহই তুলে না। এখন একজন নীচকুলে জন্মিয়া নিজের কর্ম্মগুণে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলে সকল লোকেরই পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা লাভ করেন। আগেকার লোকেরা এই সত্যটিকে বুঝিয়াও বুঝিত না। উদাহরণস্বরূপ, মহাভারতের কর্ণের প্রতি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইউরোপে বহু জ্ঞানী, গুণী, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এই সত্যের ধারণাটিকে লোকের মনে বেশ দৃঢ় করিয়া দিয়াছেন।

যে সয়—সে রয়

দুঃখবিপদের মধ্য দিয়াই মানুষ প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠে। যাহার জীবনে কোন' দুঃখবিপদ্ আসিল না, সে প্রকৃত শিক্ষাই পাইল না। আবার যাহার জীবনে দুঃখবিপদ্ আসিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহা হইতে সে পরিত্রাণ পাইয়া গেল, প্রকৃত শিক্ষা তাহারও ভাগ্যে ঘটিল না। অর্থাৎ দুঃখবিপদ্ হইতে মানুষ যাহা লাভ করিতে পারে, তাহা সে পাইল না।

রবীন্দ্রনাথ তাই বলিতেছেন,—দুঃখবিপদ্ আসুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহা যেন আমি সহ্য করিতে পারি।

বিপদে মোরে রক্ষা কর' এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখে তাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

এইরূপ সহ্য করিতে করিতে মানুষের মনের বল বাড়ে,—সহজে সে কাতর হইয়া পড়ে না। ক্রমে দুঃখিবিপদে তাহার কোন ক্ষতি হয় না।

এ সংসারে বাস করিতে হইলে দুঃখ-বিপদ আসিবেই! তাহা হইতে একেবারে রেহাই পাওয়া কঠিন। যে কখনও সহ্য করা অভ্যাস করে নাই, সে দুঃখবিপদে একেবারে মুষড়াইয়া পড়ে। তাহার দ্বারা পরের কোন কাজ হওয়া দূরে থাকুক, নিজেকে সে বাঁচাইতে পারে না। কিন্তু যে সহ্য করিতে পারে, তাহারই জয়। নিজে ত সে আত্মরক্ষা করিয়া চলিবেই—আরও পাঁচজনকে সে রক্ষা করিতে পারিবে।

(২)

মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে মানুষ যদি কিছুতেই পরাস্ত না হয়,—কিছুতেই রণে ভঙ্গ না দেয়, তবে আমরা তাহাকে বলি বীর। দুঃখবিপদ্ মানুষের ঢের বেশি প্রবল শত্রু। সহ্য করার নামই দুঃখবিপদের কাছে পরাস্ত না হওয়া, রণে ভঙ্গ না দেওয়া। যে সহ্য করিতে পারে, সে যে কত বড় বীর, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। যে সয়—সে শুধু রয় না,—সে খুব বড় বীরের সম্মান পায় এবং সগৌরবে বাঁচিয়া থাকে।

পাঁচজনের-সঙ্গে সংসারে বাস করিতে হইলে সহ্য করিতে শিখা চাই। নতুবা দুর্গতির একশেষ হইয়া থাকে। প্রতিদিনই আমরা যাহা ভালবাসি না, এমন কাজ কেহ-না-কেহ করিতেছে, যে কথা আমাদের অপ্রিয় তাহা

কেহ-না কেহ বলিতেছে—অনেকের ব্যবহারে আমাদের কিছু-না-কিছু ক্ষতি হইতেছে, অসম্মান হইতেছে, মনের শান্তি নষ্ট হইতেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা যদি সহ্য করা অভ্যাস না করি—কতক কতক অগ্রাহ্য না করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন অশান্তিময় হইয়া উঠিবে। মনে শান্তি ত পাইব-ই না, অধিকন্তু বিরক্তি জন্মিবে, রাগ জন্মিবে। রাগ হইলেই নিজের ক্ষতি ও পরের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। রাগ হইলে মুখ দিয়া যত কটু কথা বাহির হইবে, লোকের সঙ্গে শত্রুতা জন্মিবে। এমনি করিয়া জীবনে আমরা কোন' সুখই পাইব না।

যে সহ্য করিতে পারে না, সে মানুষের দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিতেও পারে না। সকলেই তাহার অপ্রিয় হইয়া উঠে।—কারণ দোষ-ত্রুটি সকলেরই কিছু-না-কিছু আছে। দেশশুদ্ধ লোককে সে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে থাকে। ফলে সে নিজেও সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠে।

অধিক কি যে সহিষ্ণু নয়, সে শেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া বসে। যে সহ্য করিতে পারে না, সে জীবনের অনেক সুযোগই হেলায় হারায়—জীবনে কোন' উন্নতি সে করিতে পারে না—অর্থ-ভাগ্যেও সে বঞ্চিত হয়। অনেক দুঃখ সহিলে তবে ভাগ্যদেবী প্রসন্ন হ'ন।

(৩)

দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যাখ্যান—

এ সংসারে মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে একটি গুণ চাই-ই চাই। সে গুণটির নাম সহিষ্ণুতা। পুরাণের হরিশ্চন্দ্র, বশিষ্ঠ, যুধিষ্ঠির, নল, শ্রীবৎস ইত্যাদি মহাপুরুষ ও কুন্তী, সীতা, দ্রৌপদী, দময়ন্তী ইত্যাদি নারীকুল-শিরোমণিদের কথা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে, ইহাদের অসীম সহিষ্ণুতা ছিল বলিয়াই ইঁহারা সকলের পূজার পাত্র। এ জগতে যে সকল বীর, রাজা, ধর্ম্মগুরু, দেশ-আবিষ্কারক, বৈজ্ঞানিক, জনবন্ধু ও

মহাজন মানবজাতির আদর্শস্বরূপ তাঁহারা সকলেই বহু দুঃখক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। কত বার তাঁহাদের জীবন বিপন্ন হইয়াছে, কতদিন খাইতে পান নাই, কতবার কত চেষ্টা তাঁহাদের বিফল হইয়াছে, কত রূপে তাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন, অপমানিত হইয়াছেন। কত বৎসর ধরিয়া দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই ধৈর্য্য হারান নাই—হতাশ হইয়া আপনার সাধনা ছাড়েন নাই। সেণ্ট্ পল, চন্দ্রগুপ্ত, বাবর, কলম্বস, গ্যালিলিও, ফ্যারাডে, হাওয়ার্ড, ডেভিড হেয়ার, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি যে কোন মহাপুরুষের জীবনচরিত পড়িলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহারা যদি দুঃখক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আপন আপন সাধনা ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে নিজেরাও এত বড় হইতে পারিতেন না—জগতের মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন না। যে জাতির লোক যত বেশি সহনশীল, জগতে সেই জাতিই তত উন্নত। যাহারা আজই অধীর বা কাতর পড়ে, তাহারাই চির পরাধীন হইয়া থাকে।

(৪)

গল্পের আকারে ভাব-ব্যাখ্যান—

[এ সম্বন্ধে রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে বেশ একটি গল্প আছে। ঐতিহাসিক দেখাইয়াছেন, একজন গুণী ব্যক্তির গুণের মধ্যে সহিষ্ণুতাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ। অন্যান্য গুণের পুরস্কার—সাফল্য, কিন্তু সহিষ্ণুতার পুরস্কার রাজসিংহাসন—জনরাজ্যেরই হউক, আর মনোরাজ্যেরই হউক। সহিষ্ণু ব্যক্তিই রাজা হওয়ার যোগ্য।]

শকারি বিক্রমাদিত্য যখন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্—তখন তাঁহার সভায় অনেক জ্ঞানী, পণ্ডিত, কবি আদর পাইতেন। তাঁহারা রাজার অনুগ্রহে খুব সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতেন। মাতৃগুপ্ত নামে একজন পণ্ডিত লোক রাজসভায় অনুগ্রহলাভের জন্য উপস্থিত হইলেন। মাতৃগুপ্ত

রাজসভায় দুইচারদিন আসা-যাওয়ার পর দেখিলেন, কবিই হউন আর পণ্ডিতই হউন, সকলেই চাটুকার। মাতৃগুপ্ত স্থির করিলেন—তিনি রাজসেবা করিতে আসিয়াছেন, রাজসেবা করিবেন, তোষামোদ করিবেন না, তোষামুদেদের সঙ্গে মিশিবেনও না; নিঃশব্দে কেবল আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাইবেন।

মাতৃগুপ্ত—বিনা বাক্যব্যয়ে রাজার আদেশ পালন করিয়া যাইতেন। রাজার যাহাতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়, সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি; একটি কথাও বলিতেন না, রাজা ও সভাসদ্‌গণের সর্ব্বপ্রকার অনাদর সহ্য করিয়া চলিতেন। যেখানে রাজনিন্দা হইত, সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেন অথবা অসহ্য হইলে সরিয়া যাইতেন। তাই বলিয়া রাজার কর্ণে সে সকল কথা তুলিয়া দিতেন না, কাহারও সঙ্গে তর্কও করিতেন না। সভাস্থ কবিরা প্রত্যহ শ্লোক লিখিয়া আনিয়া রাজাকে শুনাইত। মাতৃগুপ্ত একজন মহাকবি ছিলেন, কিন্তু কখনও রাজার বিনা অনুরোধে রাজাকে একটি শ্লোকও শোনান নাই। তবে যদি কখনও রাজা আদেশ করিতেন—তবেই শোনাইতেন। রাজা মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু মুখে কিছুই বলিতেন না।

এত যে রাজসেবা, তাহার পুরস্কার কি? দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল। এমনি করিয়া বছর ঘুরিয়া গেল। রাজা সকলকেই অনুগ্রহ করেন, মাতৃগুপ্তকে কোন' অনুগ্রহই করেন না, বরং অনাদর করেন। মাতৃগুপ্তের দুইবেলা অন্ন জোটে না,—পরণে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, শীতকালে থরথর করিয়া শীতে কাঁপেন, গ্রীষ্মে পায়ে জুতা বা বর্ষায় মাথায় ছাতি জুটে না। তাঁহার অবস্থা ক্রমে এত দীনহীন হইয়া গেল যে, সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। রাজা দেখিয়াও দেখেন না, আর যত আদেশ তাঁহার সব মাতৃগুপ্তের প্রতি।

সভার লোকেরা মাতৃগুপ্তকে অনবরত টিটকারি দেয়, বিদ্রূপ করিয়া বলে—যে কথা কইতে জানে না, সে যতই খাটুক,—যতই রাজার পিছে পিছে ঘুরুক, তার এখানে কিছু মিলবে না। ওহে মাতৃগুপ্ত, গুণগান ক'রে শ্লোক লিখে শোনাও, তাতে অন্ততঃ পেটটা চ'লে যাবে। অন্যত্র চেষ্টা দেখ, এখানে তোমার কিছু জুটবে না। আর কত কষ্ট সইবে? ধৈর্য্যের সীমা আছে ত?

মাতৃগুপ্ত এসকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া কাজ করিয়া চলিতেন। রাজারও পরীক্ষা চলিতে লাগিল। এমনি ভাবে বৎসর কাটিয়া গেল।

কাশ্মীরের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। অমাত্যগণ একজন বিচক্ষণ রাজা পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, কাশ্মীর তখন বিক্রমাদিত্যের অধীন। রাজা পত্রখানি হাতে করিয়া ভাবিতেছেন। রাজার চিন্তা লক্ষ্য করিয়া মাতৃগুপ্ত বিষণ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রাজা মাতৃগুপ্তের পানে চাহিয়া দেখিলেন, মাতৃগুপ্তের শরীরে শুধু হাড় কয়খানি বাকি আছে। দেখিয়া রাজার চোখে জল আসিল, বড়ই অনুতাপ হইল,—বলিলেন, "মাতৃগুপ্ত, এক কাজ করতে পার? আমি একখানি পত্র দেব, পত্রখানি কাশ্মীরের মন্ত্রীর কাছে নিয়ে যেতে পারবে? পথে যেন পত্রখানি খুলো না।"

মাতৃগুপ্ত বলিলেন—"মহারাজ! এক্ষণি যেতে প্রস্তুত আছি।"

রাজা একখানি পত্র লিখিয়া তাহাতে গালা-মোহর করিলেন এবং চিঠিখানি লইয়া যাইবার জন্য মাতৃগুপ্তের হাতে দিলেন। সঙ্গে একটি পোশাক দিয়া বলিলেন, 'এইটি প'রে কাশ্মীর প্রবেশ করিতে হ'বে'।

মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর যাইতেছেন দেখিয়া সভার লোকেরা টিটকারী দিয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ, বেহারার কাজ পর্য্যন্ত করতে হ'ল।"

মাতৃগুপ্ত কাশ্মীরে গিয়া পত্রখানি রাজমন্ত্রীর হাতে দিবামাত্র মন্ত্রী মাতৃগুপ্তের পদে প্রণাম করিলেন এবং মহাসমারোহে রাজহস্তীর পৃষ্ঠে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। মাতৃগুপ্ত অবাক্,—জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্যাপার কি?' মন্ত্রী পত্রখানি মাতৃগুপ্তের হাতে দিলেন। পত্রে অনেক কথার শেষে লেখা ছিল,—

"এই পত্রবাহক মাতৃগুপ্তের মত জ্ঞানী, গুণী, প্রভুভক্ত, সহিষ্ণু, ধীর ও বিচক্ষণ লোক আমার সভায় একটিও নাই। সহিষ্ণুতায় মাতৃগুপ্ত কর্ণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। দেড় বৎসর ধরিয়া ইহার পরীক্ষা করিয়া একটুও খুঁত ধরিতে পারি নাই। ইহাকেই রাজসিংহাসনে বসাইবে। পত্রের মর্ম্ম ইহাকে পূর্ব্বে জানিতে দিই নাই।" মাতৃগুপ্ত কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার চোখ দিয়া কেবল জল পড়িতে লাগিল।

শরীরের নাম মহাশয়—যা সওয়াবে তাই সয়।

গল্পের আকারে ভাবব্যাখ্যান—

একটি ধনীর ছেলের শরীর ছিল অপুষ্ট, প্রায়ই রোগ হইত, আজ সর্দ্দি, কাল পেটের অসুখ, কোন দিন বা মাথা-ধরা। শরীরের জন্য তাহার পড়াশুনাও বন্ধ ছিল। একটু ঠাণ্ডা লাগিলেও সর্দ্দি হইত, সেজন্য রাত্রিকালে সমস্ত দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া লইতে হইত। সামান্য একটু শীত সহ্য করিতে পারিত না, শীতকালে আপাদমস্তক গরম কাপড় জড়াইয়া ঘরে বসিয়া থাকিত। একটু রৌদ্র লাগিলেই মাথা ধরিত, ক্ষুধা পাইলে এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিতে পারিত না। খাওয়ার সামান্য এদিক্-ওদিক্ হইলেই পেটের অসুখ করিত।

ধনী ব্যক্তি ছেলেটিকে অনেক ঔষধ খাওয়াইলেন। অনেক ভালো

ভালো স্বাস্থ্যকর জায়গাতে রাখিয়া শরীরের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিলেন। অনেক মাদুলীকবচ গলায় হাতে পরাইয়া দিলেন, বহু টাকা খরচ করিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। পিতার উদ্বেগের আর সীমা নাই। পড়াশুনা না হয়, না-ই হইল, বাঁচা ত চাই। ডাক্তার কবিরাজ, সাধু সন্ন্যাসী—সব হদ্দ হইয়া গেল। শেষে এক যুবক ডাক্তার বলিল,—"মহাশয় একবৎসরের জন্ত ছেলেটিকে ছাড়িয়া দিন, আমি উহাকে লইয়া একটি স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইব। আপনি মাসে মাসে খরচ পাঠাইবেন। আমি একটি ছোট বাসা করিয়া উহাকে লইয়া থাকিব।" ছেলেটি বাড়ী আসিতে পাইবে না। ইচ্ছা হইলে দেখিয়া আসিবেন।

ধনী পিতা সম্মত হইয়া বলিলেন, "ইহাই আমার শেষ চেষ্টা।"

ডাক্তার ছেলেটিকে লইয়া পুরীর সমুদ্রের ধারে একটি বাসা করিলেন। সেখানে গিয়া প্রথমে তাহার ... ছাড়াইলেন, পরে জামা ও ছাড়াইলেন। রাত্রিকালে প্রথমে একটি জানালা খুলিয়া রাখিতেন। তারপর একে একে দুয়ারজানালা সব খুলিয়া রাখিতে লাগিলেন। ছেলেটি ভোরে উঠিতে পারিত না। সমুদ্রে সূর্য্যোদয়-দর্শনের লোভ দেখাইয়া তাহার ভোরে উঠার অভ্যাস করাইলেন। তারপর তাহাকে লইয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিন এক মাইল, তারপর একটু একটু বাড়াইতে বাড়াইতে শেষে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া আনিলেন।

ঢেউএর ওঠাপড়া দেখিতে দেখিতে খোশগল্প শুনিতে শুনিতে ছেলেটি কত দূর চলিয়া যাইত, তাহা নিজেই বুঝিত না। ফিরিবার জন্ত ব্যস্ত হইলে ডাক্তারবাবু কথায় কথায় ভুলাইয়া দিতেন। ক্রমে সমুদ্রের ধারে বেড়ানো ছেলেটির নেশায় দাঁড়াইল। শেষে ছেলেটিই বেড়াইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িত। প্রাতঃকালে বহু দূর বেড়ানোরই

ক্ষণে ক্ষুধা হইত; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খাইতে পাইত না। তাহাতে ক্ষুধা সহ্য করিবার শক্তি বাড়িতে লাগিল। ফিরিতে বেলা হইত, তাহাতে রৌদ্র সহ্য করিবার ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল। বৈকালেও এইরূপ বেড়ানো অভ্যাস হইল। যে ছেলে গাড়ী ছাড়া দুই পা চলিত না,—সে আট দশ মাইল প্রত্যহ খালি পায়ে, বিনা ছাতায়, খালি পেটে হাঁটিতে লাগিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সমুদ্রস্নান অভ্যাস হইল। প্রথম-প্রথম ভয় করিত। তারপর শত শত লোককে অনায়াসে স্নান করিতে দেখিয়া ছেলেটির ভয় ভাঙ্গিয়া গেল।

ছয় মাস এইভাবে কাটানোর পর ডাক্তার ছেলেটিকে লইয়া দারজিলিঙে গেলেন। সেখানে গভীর শীত। পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইতে সেখানে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। ডাক্তার একটু একটু করিয়া ছেলেটিকে শীত সহ্য করিতে শিখাইলেন, পাহাড়ে উঠানামা করাও ছেলেটির অভ্যাস হইয়া গেল। নানারূপ দৃশ্যের লোভ দেখাইয়া ডাক্তার ছেলেটিকে অনেক দূর পর্যন্ত লইয়া যাইতেন। ক্রমে ছেলেটি রোগমুক্ত, সবল, দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। এখন সে রৌদ্র, শীত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পরিশ্রম সবই সহ্য করিতে পারে। সে একজন নামজাদা খেলোয়াড় ও শিকারী হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেটি এখন বলে,—শরীরের নাম মহাশয় যা সওয়াইবে তাই সয়।"

দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। (C.U.1944)

(১) একজনের চেষ্টায় বা বুদ্ধিতে যে কাজ সম্পন্ন করা কঠিন, তাহা দশজনে মিলিয়া করিলে সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। অনেকের সঙ্গে মিলিয়া কোন কাজ করিতে গেলে সাফল্যলাভের সম্ভাবনাই পনেরো

আনা। যদি কার্য্য সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলেও লজ্জার কারণ নাই। একা কোন' কাজ করিতে গিয়া না পারিলে—লোকে নিন্দা করে, ব্যঙ্গ করে, বলে—'শক্তি নাই, বুদ্ধি নাই, আছে কেবল আম্বা—আমরা জানিই ত ওর দ্বারা কি কাজ হয়?' দশজনের সঙ্গে কাজ করিতে গিয়া না পারিলে নিন্দা করিবার, ঠাট্টা করিবার লোক কমিয়া যায়। তখন লোকে বলে, "কাজটা ভয়ানক কঠিন, দেখ না, এতগুলো লোক এক-সঙ্গে মিলিয়া চেষ্টা করিল, তবুও পারিল না। যাহাই হউক, ইহাদের চেষ্টাকে সুখ্যাতি করিতে হয় ইত্যাদি।"

একা কোন কাজ করিতে গিয়া না পারিলে নিজের মনে মনেও লজ্জা হয়, ধিক্কার জন্মে, এমন কি,—নৈরাশ্যও আসে। দশের সঙ্গে মিলিয়া কোন' কাজ করিতে গিয়া না পারিলে সেই লজ্জাটা দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যাইতে পারে, 'সকলে মিলিয়াই চেষ্টা করিয়া ত দেখা গেল—আমার একার বুদ্ধি বা শক্তি অল্প হইতে পারে—আমার একার ভুল হইতে পারে; কিন্তু সকলেরই বুদ্ধি ও শক্তি ত আমার মত অল্প নয়। আর ভুল হইলে বিশ-বিশটা চোখে নিশ্চয়ই তাহা ধরা পড়িত। দশ জনে মিলিয়া কাজটা হইল না, কিন্তু বিশজনে মিলিয়া করিলে অবশ্যই হইতে পারে। নৈরাশ্যের কারণ নাই—লজ্জার কারণ ত নাই-ই।"

(২) এক একটি তৃণের বল সামান্য। কিন্তু অনেকগুলি তৃণ একত্র করিলে যে ডোর রচিত হয়, তাহাতে একটি প্রকাণ্ড হাতীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়। ঈশপের গল্পে আছে, একজন কৃষকের ছেলেরা সর্ব্বদা বিবাদ করিত। কৃষক তাহাদিগকে শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাকায় যে কি সুবিধা তাহাই বুঝাইবার জন্য এক আঁটি কঞ্চি আনাইয়া ছেলেদের

প্রত্যেককে এক গাছি কঞ্চি ভাঙ্গিতে বলিলেন। ছেলেরা সহজেই এক-একগাছি কঞ্চি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কৃষক পরে প্রত্যেককে কঞ্চির আঁটিটি ভাঙ্গিতে বলিলে—কেহই পারিল না। তাহাতে কৃষক বুঝাইলেন, শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া একত্র থাকিলে কেহই অনিষ্ট করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র মিলিয়া মিশিয়া থাকিলেই অনেক লাভ, একত্র মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে লাভ ঢের বেশি।

বহুলোকের একত্র মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা বর্ত্তমান সভ্যতার একটি অঙ্গ। যে দিন মানুষ একত্র মিলিয়া কাজ করিতে শিখিল, সেই দিনই সে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক, হিংস্র জন্তুর অত্যাচার, বাহিরের শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি হইতে আত্মরক্ষা করিতেও শিখিল। সে ক্রমে গ্রাম, নগর, রাজ্য, গঞ্জ, বাজার, হাট ইত্যাদি গড়িয়া তুলিয়াছে; শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদিতেও উন্নতি করিতেছে; সাগর, পর্ব্বত, মরু ইত্যাদি অতিক্রম করিয়াছে। একা একা কাজ করিলে মানুষ চিরদিন অসভ্য হইয়া থাকিত। যে-কোন' কাজ অনেকে মিলিয়া করিলে সহজে সিদ্ধ হয়, তদ্দ্বারা অনেক বেশি কাজও করা যায়। অনেকে মিলিয়া কাজ করিতে গিয়া যদি সাফল্যলাভ না-ও ঘটে, তবুও তাহাতে লজ্জা, দুঃখ বা নৈরাশ্যের কারণ নাই। কাজটাই অসাধ্য, তাহাতে এই সত্যেরই প্রমাণ হয়। মানুষকে কেহ দায়ী বা দোষী করে না।

(৩) দেশের যে সকল কাজের সঙ্গে দেশের বহুলোকের অদৃষ্ট জড়িত যে, সকল কাজের উপর বহুলোকের সুখ-দুঃখ, ভালোমন্দ, জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে, সে সকল কাজে যদি একজন লোক,—সে যত বড়ই হউক না কেন—একা মাতব্বরি করিতে যায়, তাহা হইলে কি হয়? যদি কাজটিতে দেশের লোকের সত্যসত্যই মঙ্গল হয় তাহা হইলে

মাতব্বরকে সকলেই দেবতা করিয়া তুলে। আর যদি কাজটির ফল ভালো না হয়, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার অবধি থাকে না।

দেশের লোকের মতামত লইয়া, দেশের লোকের প্রতিনিধিগণ সকলে মিলিয়া যদি কোন কাজ করেন, তাহাতে কাজটির ফল যদি ভালো না-ও হয়, তাহা হইলেও কেহ তাহাকে দোষী করিতে পারে না। ভুল হইয়াছিল বলিয়াই সকলের ধারণা হয় এবং সেই ভুল শোধরাইবার চেষ্টা হয়।

একা দায়িত্ব লইয়া দশজনকে উপেক্ষা করিয়া দেশের মঙ্গল করিতে যাওয়াও বিপজ্জনক। তাহার চেয়ে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়া প্রাণপণ সাহায্য করিয়া দশজনের সঙ্গে মিলিয়াই কাজ করা বুদ্ধিমানের ধর্ম্ম। বাহাদুরি লইবার জন্য একা করিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা ঘটে।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রবাদ-প্রবচন ও লৌকিক উপদেশগুলি অবলম্বন করিয়া অণুচ্ছেদ রচনা কর—

(১) অতি বাড় বেড়োনাকো ঝড়ে ভেঙ্গে-যাবে। (২) অতি লোভে তাঁতী ডোবে। (৩) আটে পিটে দড়—তবে ঘোড়ার পিঠে চড়। (৪) তাঁতীকুলও গেল বৈষ্ণবকুলও গেল। (৫) দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝা যায় না। (৬) ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। (৭) পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। (৮) যেথানে বাসনা-রথ সেথানে সিদ্ধিপথ। (৯) ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হয়। (১০) পড়াবি তা পড়া পো, নইলে সৎসভাতে থো। (১১) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। (১২) গোঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। (১৩) উঠন্তি মুলপত্তনে চেনা যায়। (১৪) যে ছেলে ভাঁটা খেলে তার নাটাপায়া চোখ। (১৫) নাচতে না জানলে উঠানের দোষ। (১৬) ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয় পায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পত্র-রচনা

আত্মীয়-স্বজন সকলেই কাছে থাকিলে অবশ্য পত্রাদি লিখিবার প্রয়োজন তত হয় না; কিন্তু তাঁহারা বাড়ী ছাড়িয়া দূরে গেলে বা বিদেশে বাস করিলেই পত্রাদি লিখিবার আবশ্যকতা জন্মে। বর্ত্তমান যুগে বিদেশগমন অনিবার্য্য। সেজন্য পত্র লিখিবার প্রয়োজন অবশ্যই ঘটে।

দূরবর্ত্তী আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ বেশ বিস্তারিত ভাবেই জানিতে ইচ্ছা হয়। চিত্ত-বিনোদনের জন্য প্রবাসী আত্মীয় বন্ধুর পক্ষে প্রিয়জনের পত্রগুলিই সম্বল হইয়া দাঁড়ায়। পত্রের দ্বারাই পরস্পরের মধ্যে অন্তরের যোগ রক্ষা হয়। সেজন্য পত্রগুলি সুরচিত হওয়া উচিত। এলোমেলো ভাবে অমার্জিত ভাষায় পত্র লিখিলে, যিনি পত্র পাইবেন—তাঁহার মনস্তুষ্টি হয় না। পত্র-রচনাবিদ্যাও সেজন্য বালকদিগকে শিখিতে হয়।

পত্ররচনার কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে। সে নিয়মগুলি যত দূর সম্ভব পালন করাই সভ্যতার অঙ্গ। একখানি পত্রকে সাধারণতঃ সাত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

১। শিরোনামা। ২। ভগবানের নাম।
৩। পত্র-প্রেরকের ঠিকানা। ৪। তারিখ।
৫। সম্ভাষণ ৬। মূল পত্রাংশ ৭। অধোনামা।

১ম—শিরোনামা—পত্রের বহিরঙ্গ। তাহাতে যাহাকে পত্র দেওয়া হইতেছে, তাহার নাম ও ঠিকানা থাকিবে। ঠিকানাটির সহিত সম্পর্ক ডাক-বিভাগের সঙ্গে। নামের আগে একটি বিশেষণ যোগ করিবার প্রথা আছে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিশেষণগুলি ব্যবহৃত হয় :—

১—(ক)—পূজ্য পুরুষের জন্য—পরম পূজনীয়, পরম ভক্তি-ভাজন, পরমারাধ্য ইত্যাদি ও শ্রীযুক্ত। (খ)—পূজ্য মহিলার জন্য—ঐ বিশেষণগুলিই স্ত্রীলিঙ্গে।

গ) মুসলমানের পক্ষে। পূজ্য পুরুষের জন্য—(১) হজনাব ফয়েজমাব আলিশান জনাব হজরৎ, (২)। আরজদস্তে বখেদমতে বন্দেগান আলিশান। পূজ্যা মহিলার জন্য—(১) বখেদমতে হজরত মখদুমা মাছুমা। (২) জনাব হজরত মোয়াজ্জমা।

২। সমশ্রেণীর লোক অথবা বন্ধুদের জন্য।

(ক)—হিন্দু পুরুষ—পরম শ্রদ্ধাস্পদ, মান্যবর, সুহৃদ্বর ও শ্রীযুক্ত। (খ) হিন্দু স্ত্রী পরমশ্রদ্ধেয়া, মাননীয়া, প্রিয়সখী ও শ্রীযুক্তা। (গ)—মুসলমানের পক্ষে—মেহেরবান অথবা কদরদান জনাব।

৩—স্নেহের পাত্র বা আশীর্ব্বাদের পাত্রের জন্য।

(ক) হিন্দু পুরুষ—পরম কল্যাণীয়, পরম স্নেহাস্পদ, পরম প্রীতি-ভাজন, পরম ক্ষেমাস্পদ, প্রাণাধিক ইত্যাদি ও শ্রীমান্। (খ) হিন্দুনারী—ঐ সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ও শ্রীমতী। (গ) মুসলমানমতে—নূরে চশম।

শিরোনামা নামের পর যথাক্রমে—

১—(ক) শ্রীচরণকমলেষু অথবা বিশেষণগুলিতে 'এষু' যোগ দিয়া (খ) শ্রীচরণকমলেষু অথবা আ-কারান্ত বিশেষণগুলিতে 'সু' যোগ দিয়া। (গ) কেবলাগাহ সাহেব জনাবেষু, বখেদমতেষু, জনাবেষু,—পুং। (ঘ) সাহেবা জনাবেষু অথবা বখেদমতেষু (স্ত্রী)।

২—(ক) বিশেষণগুলিতে 'এষু' যোগ দিয়া। (খ) আ-কারান্ত বিশেষণে 'সু' যোগ দিয়া অথবা প্রিয়সখী-করকমলেষু, (গ) মেহেরবানেষু।

৩—(ক) বিশেষণগুলিতে 'এষু' যোগ দিয়া অথবা দীর্ঘায়ুর্নিরাপৎসু,

আয়ুষ্মৎসু। (খ) আ-কারান্ত বিশেষণগুলিতে সু যোগ দিয়া অথবা আয়ুষ্মতীষু। (গ) দোয়াবরেষু।

ঠিকানা সম্বন্ধে বলিবার বিশেষ কিছুই নাই। যতদূর সম্ভব পরিষ্কার করিয়াই লেখা উচিত। দুই-একটি উদাহরণ দেওয়া গেল—

পল্লীর,—৺যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের বাটি। পোঃ কড়ুই, জেলা বর্দ্ধমান। **নগরের,**—৪১।১৩ রসারোড, পোঃ টালিগঞ্জ, কলিকাতা।

বাঙ্গালার বাহিরের চিঠিতে বাঙ্গালা ভাষায় ঠিকানা লেখা উচিত নয়।

২য়—পত্রের দ্বিতীয় অংশ,—ভগবানের নাম।

৩য়—পত্রের তৃতীয় অংশ, পত্রলেখকের বিস্তৃত বা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা। পত্রের ডাহিন কোণে থাকিবে। যেমন—(২) পি ১৬৬, রসা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। (২) শ্রীখণ্ড, গ্রাম আলমপুর, জেলা বর্দ্ধমান। (৩) মণিমন্দির, মধুপুর, ই—আই—আর।

৪র্থ—তারিখ—ঐ ঠিকানার নীচেই থাকিবে।

যেমন—(১)—৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৯। (২) ১লা বৈশাখ, ১৩৫১।

৫ম—সম্ভাষণ—প্রথমতঃ শিরোনামার নামের পর যাহা বসে, তাহাই বসাইতে হয়। তারপর সম্বন্ধানুসারে নিম্নলিখিত পাঠগুলি—

(১) প্রণাম শতকোটি নিবেদন, সভক্তি প্রণামান্তে নিবেদন, শ্রীচরণে অসংখ্য প্রণিপাতপুরঃসর নিবেদন ইত্যাদি। (২) কৃতাঞ্জলি নিবেদন, সবিনয় নিবেদন, প্রীতিসম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন, যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর বিজ্ঞাপন। (৩) মোবারক জনাবেষু বা পাকজনাবেষু-র —পর, আদাব তসলিমাৎ বহুত বহুত পরে আরজ এই; বান্দা

করম ফর্দার খাকছারের আরজ এই, নালায়েক নামুরাদের আরজ এই।
(৪) দোয়াবরেষু-র পরে দোয়া বহুৎ বহুৎ পর সমাচার এই—

ইহার পর একটি সম্বোধন পদ,—যেমন—বাবা, মা, দাদা, স্নেহের ভাই, স্নেহের ভগিনি, মহাশয় ইত্যাদি যোগ দেওয়া যাইতে পারে।

ষষ্ঠ— মূল পত্রাংশে পত্রলেখককে আপনার বক্তব্য জানাইবার আগে কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। পত্রখানি যদি উত্তর হিসাবে লিখিত হয়, তাহা হইলে যে-পত্রের উত্তর, তাহার প্রাপ্তি-সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বন্ধে একটু কিছু লিখিতে হইবে। আর উত্তর না হইলে লেখার কারণটা গোড়াতেই জানাইয়া দিতে হইবে।

আপনার বক্তব্য পত্রের মধ্যাংশে ভিন্ন ভিন্ন অণুচ্ছেদে (প্যারাগ্রাফ করিয়া) বিশদভাবে প্রকাশ করিতে হইবে যাহাতে কোন কথা বাদ না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। উত্তর লিখিতে হইলে, যে-পত্রের উত্তর, সেই পত্রখানিকে পাশে রাখিয়া উত্তর লিখিতে হইবে। ভাষা কোথাও অস্পষ্ট বা রুক্ষ না হয়, অবান্তর কথা বেশি না থাকে—অযথা সংক্ষিপ্ত না হয়,—লেখায় আলস্য, অযত্ন, অনাদর, চাঞ্চল্য বা ঔদাসীন্য প্রকাশিত না হয়, সেদিকে এবং যথাযথ ছেদ-বিন্যাসের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, হাতের লেখা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ও সুদৃশ্য হওয়া চাই। বেশ ভাবিয়া-চিন্তিয়া বক্তব্য কথাগুলিকে গুছাইয়া সাজাইয়া বলিতে হইবে। পত্র পড়িয়া পত্রাধিকারী কেবল যেন বার্ত্তাই না পায়—সেই সঙ্গে আনন্দ ও প্রীতির স্পর্শ লাভ করে। যখন যে কথাটি মনে পড়িবে, তখন সেইটিকে না বসাইয়া, আগে কথাগুলি মনে করিয়া লইয়া এক-একটি প্রসঙ্গে যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা এক একটি করিয়া প্যারাগ্রাফে শেষ করিতে হইবে।

উপসংহারে নিজের ও অন্যান্য সকলের কুশলসংবাদ দিয়া আত্মীয়-

বন্ধুগণের উদ্দেশে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ-প্রণামাদি নিবেদন করিয়া—পত্রাধিকারীর আত্মীয়বন্ধুগণের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

৭ম। পত্রের শেষে নাম স্বাক্ষরিত করিবার আগে পত্রলেখকদের নিজ নামের বিশেষণ যোগের প্রথা আছে, তাহাই পত্রের সপ্তমাংশ।

(১) প্রণত সেবক, চিরপ্রণত, স্নেহের চিরস্নেহাশ্রিত, শ্রীচরণাশ্রিত, সেবকাধম, স্নেহধন্য। (২) নিবেদক, ভবদীয়, প্রীতিমুগ্ধ, গুণমুগ্ধ, তোমার, (৩) নিত্যাশীর্ব্বাদক, চিরশুভানুধ্যায়ী, চিরশুভার্থী। (৪) খাদেম খাকছার, রাকেমে বান্দা, দোয়াগো ইত্যাদি।

[নিম্নে কয়েকখানি পত্রের নমুনা দেওয়া হইল—বালকের পক্ষ হইতে বালকের জবানীতেই পারিবারিক বিষয় লইয়া লিখিত।]

ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পারিবারিক বিষয় লইয়া পত্র লিখিবার কথা। পারিবারিক পত্রাদিতে **স্নেহ-ভালবাসা ও অন্তরের স্পর্শ** থাকা চাই। পত্রগুলির নিদর্শন সেই ভাবেই দেওয়া হইল। শুষ্ক-নীরস পত্রের নিদর্শন দিয়া লাভ নাই, সেগুলি বাড়ীতেই পাইবে।

কতকগুলি পত্রের নমুনা

স্বহৃদ্বর শ্রীযুক্ত শ্রীপতি গুপ্ত
স্বহৃদ্বরেষু—

১০, বেলতলা রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।
৭ই জুলাই, ১৯০৫।

(১)

প্রীতিভাজনেষু—

ভাই শ্রীপতি, আমার ছোট ভাই শ্যামলের জন্ম দিন আজ। মা তোমাকে আজ সন্ধ্যাকালে আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিতে বলিলেন। আজ আমার ভগিনীপতি ও মামাদেরও নিমন্ত্রণ আছে,—

একটু গানবাজনা'রও আয়োজন আছে। আশা করি, তুমি অবশ্য আসিবে। না আসিলে মা বড় দুঃখিত হইবেন। অবশ্য এসময়ে তোমার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, কিছু সময় নষ্ট হইবে। তাহা হউক, মাঝে মাঝে একটু-আধটু বিশ্রাম ও আমোদ-প্রমোদ-ত চাই। কবিগুরু বলিয়াছেন—বিশ্রাম কাজেরি অঙ্গ এক সাথে গাঁথা। নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা॥

তোমার অমল।

(২)

ভাই শ্রীপতি, তোমার কাছে আমার ভাই কমলকে পাঠাইলাম ইহার হাতে তোমার 'কথা ও কাহিনী'-খানি দিবে—'গানভঙ্গ' কবিতাটির প্রয়োজন হইয়াছে। আমি ঐ কবিতাটি একটি সভায় আবৃত্তি করিব। শুনিলাম 'কথা ও কাহিনীতে' ঐ কবিতাটি আছে। বইখানি পরে ফেরৎ দিব। আমার 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানির কাজ শেষ হইয়া থাকিলে কমলের হাতে ফেরৎ দিবে। তুমি আমার কাছে 'শ্রীকান্ত' চাহিয়াছিলে। বইখানি খুঁজিয়া পাইতেছি না। খুঁজিয়া পাইবামাত্র পাঠাইব। তোমার স্কুল কবে খুলিবে? তিনচার দিন তোমার সঙ্গে দেখা—সাক্ষাৎ নাই একবার এদিকে এস না? ইতি—

তোমার অমল

কল্যাণীয়েষু—

ঠিকানা ও তারিখ

স্নেহের ভাই অরুণ, তুমি কুড়ি টাকা জলপানি পাইয়াছ জানিয়া যে কি আনন্দ হইল. তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা আমার নাই। ভগবান্ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তুমি দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল কর, আপন পরিবারের দুঃখ দৈন্য দূর কর এবং দেশের ও দশের কল্যাণ সাধন কর, আমি এই আশীর্ব্বাদ করি।

এমন আনন্দের দিনে বাবার কথা মনে করিয়া চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যাইতেছে। বাবা আজ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন—তাহা হইলে তিনি কত উল্লাসই না করিতেন! কত কষ্টেই না তিনি আমাদের মানুষ করিয়াছেন! হায়, তিনি দেখিয়া গেলেন না—তুমি বংশের কিরূপ সুসন্তান হইয়াছ! বাবা আমার বিবাহ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। বাবার মুখপানে চাহিয়া আমি বলিয়াছিলাম—"বাবা, তুমি আমার জন্য সব খোয়ালে, অরুণকে লেখাপড়া শেখাবে কি করে? ভাইরা আমার দুবেলা খেতে পাবে না যে।"

বাবা আমার মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন—"পাগলি, দেখিস, অরুণ আমার স্কলারশিপ পাবে—তার লেখাপড়ার জন্য খরচ করতে হবে না। সে-ই মানুষ হ'য়ে তোদের ভাইদের মানুষ করবে।" আজ আমার সেদিনের কথা মনে পড়িতেছে। আজ আমার মনে হইতেছে, তুমি বাবার সাধ পূর্ণ করিতে পারিবে, মায়ের চোখের জল মুছাইতে পারিবে। তুমি কৃতী হইয়া ছোট ভাইদের মানুষ কর—তাহা হইলেই তোমার পিতৃকৃত্য সম্পাদন করা হইবে। ইতি—

তোমার দিদি অপরাজিতা।

শ্রীচরণকমলেষু— ঠিকানা ও তারিখ

মা, আমার ক'দিন হ'তে জ্বর হয়েছে। জ্বর বেশি নয়,—ডাক্তার বাবু বলেছেন—কাল সেরে যাবে। আমার জন্য ভেবো না, মা। চার পাঁচ দিন হ'তে কিছু খাই নি—কিছুতেই ঘুম আস্‌ছে না। তাই রাত্রে তোমাকে পত্র লিখ্‌তে বস্‌লাম।

বিদেশে রোগ-শয্যায় প'ড়ে থেকে তোমাকে মনে পড়ছে। বাড়ীতে অসুখ হ'লে তুমি আমার বিছানায় ব'সে সারারাত পাখা

করতে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে, ঔষধ খেতে দিতে, কত যত্ন করতে, সেই সব কথাই কেবল মনে পড়ছে। এখানে বিদেশে ছাত্রাবাসে সেবা-যত্ন করবার কেউ নেই। দিনের বেলায় সকলেই ইস্কুলে চ'লে যায়—আমি একলা বিছানায় প'ড়ে থাকি, আর আকাশ-পাতাল কতই ভাবি। এখনও গ্রীষ্মের ছুটি হ'তে অনেক দেরী। কতদিন তোমাদের দেখিনি—কতদিন তোমার হাতের অমৃতের মত রান্না খাইনি—এখানে ঠাকুরের একঘেয়ে রান্না খেতে কান্না আসে।

এতদিন বোধ হয় আমাদের বাড়ীর আমগাছটা মুকুলে ভ'রে গেছে,—না,—বোধ হয় মুকুল ঝ'রে গিয়ে গাছে গুটি ধরেছে। আমড়া গাছটায় নূতন পাতা বা'র হয়েছে। কত দিন আমড়ার টক খাই নি। পুকুরের ধারে অশোকগাছটা বোধ হয় ফুলে ভ'রে গেছে। এই সময় কি অশোকষষ্ঠী হয়? তুমি সেই স্নান ক'রে এলো'চুলে লালপেড়ে কাপড় প'রে কপালে ফোঁটা দিতে—আমি তোমার আল্তাপরা পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতাম, আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে তোমার চোখে জল আসত। মনে পড়ছে—বাঁশবনে ঘেরা হাঁসডাকা কলমীফুলে-ভরা খিড়কীর পুকুরটি—বৈকাল বেলায় সেখানে ছিপ ফেলে ব'সে থাকতাম। মনে পড়ছে,—দীঘির ধারে সেই গোলগোল লাল-লাল ফলে ভরা ঝুরি-ঝোলা বটগাছের শীতল ছায়াখানি—সেই ছায়াতে ব'সে ডোম-বুড়োর ঝুড়িবোনা দেখতাম, ভালুকনাচ ও সাপ-খেলানো দেখতাম, পাখীর কলরব শুনতাম,—বেলা প'ড়ে এলে তুমি খাবার খেতে ডাকতে। মনে পড়ছে—হিমসায়রের ঘাটে সঙ্গীদের সঙ্গে সাঁতরানো, ঘণ্টা ধ'রে মাতামাতি। তুমি কাহাকে পাঠিয়ে দিতে ধ'রে আনবার জন্য। বাড়ী ফিরলে তুমি বকতে। বলতে—জ্বর হবে; কিন্তু তাতে-ত কোন দিন জ্বর হয়নি মা।

মনে পড়ছে—তোমার নিজের হাতের আজ্জানো গাছের মাচা-ভরা ও চাল-ভরা লাউ-কুমড়া-শশা-ঝিঙ্গে-বরবটীর কথা। আমাদের বাড়ীর পাঁচিলগুলো হয়তো-এতদিন ঝিঙে-ফুলে ভ'রে গেছে। মনে পড়চে—তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে লেপাপোঁছা আঙিনার সেই তুলসীমঞ্চটিকে। তুমি সন্ধ্যাবেলায় সেখানে প্রদীপ জ্বেলে গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম ক'রে তুলসীতলার মাটি আমার মাথায় ছুঁইয়ে দিতে। এমনই কত এলোমেলো টুকরা-টুকরা কথা আজ মনে আসছে।

আরও ছোটবেলার কথা মনে পড়ছে। সে-সব কথা লিখলে আমাকে নেহাৎ ছেলেমানুষ মনে করবে। তুমি ভাবছ মা, আমার বুঝি এখানে মন টেকেনি। কিন্তু তা' নয়, অসুখ হ'লে তোমাকে বড় বেশি মনে পড়ে, তাই এ সব লিখলাম। আমার প্রণাম জেনো। ভাই-বোনেদের আশীর্ব্বাদ দিও। খোকা কি হাঁটতে শিখেছে? তার ক'টা দাঁত উঠলো? খুকু আমার নাম করে?—না. এত দিন ভুলে গেছে? ওদের জন্য বড় মন কেমন করে।

ইতি—তোমার স্নেহের ননী।

শ্রীচরণকেমলেষু—

দাদা, তুমি এবার পূজোয় বাড়ী আসবে না শুনে আমাদের পূজোর উল্লাস-উৎসাহ সব ক'মে গেছে। পাঁচসাত দিনের জন্য এলে আর তোমার পরীক্ষার কোন ক্ষতি হ'ত না। পূজোর জন্য মা কত আয়োজন করেছিলেন—তুমি আসবে না শুনে তাঁর কিছুতে মন নেই।

এখানে সকালে বিকালে সেনবাবুদের বাড়ীতে বোধনের শাহ্‌নাই বাজছে, গাঁয়ের সব প্রতিমা দোমেটে হ'য়ে গেছে। এবার কৃষ্ণনগর হ'তে কুমোর এসে সেনবাবুদের প্রতিমা গড়েছে। ওরা এবার আর

ডাকের সাজ দিয়ে সাজাবে না—সব মাটির গয়না দিয়ে, মাটিরই সাজ দিয়ে সাজাবে।

গাঁয়ের মাঠে সবুজের পাথার এসেছে। ডহর, পগার, দীঘির পাড় সাদা কাশফুলে ঢাকা পড়ে গেছে—ঠিক যেন ঐ পাথারের ফেনা। দীঘির ছাতিম গাছগুলো সাদা সাদা ফুলে ভ'রে গেছে! সকালবেলায় শিউলিতলা ফুলে ভ'রে থাকে—আমরা কুড়িয়ে শেষ করতে পারি না। ঠাকুরবাড়ীতে জবা, অপরাজিতা, অতসী, দোপাটি, করবী—রাশি রাশি ফুটছে। এবার আমাদের গাছে বিস্তর নারকেল হ'য়েছিল। বাড়ীতে হাঁড়ী হাঁড়ী নারিকেল নাড়ু তৈরী হচ্ছে। এবার বাগানে কলা যা হয়েছে, দাদা অনেক দিন তেমনটি হয় নি। আর বাতাবি লেবুগুলো হয়েছে এক-একটি কুমড়োর মত। বুধু গাইটা কুড়িদিন হলো বিইয়েছে, দুবেলায় পাঁচ সের ক'রে দুধ দিচ্ছে। আমরা এত দুধ খেয়ে উঠতে পারছি না। মা তোমার জন্য ক্ষীর তৈরী ক'রে রাখছেন। ইস্কুল-কলেজের যত ছেলে সবাই বাড়ী এসেছে। তারা এবার থিয়েটার করবে—চন্দ্রগুপ্ত প্লে হবে। যারা চাকরী করে বা বিদেশে কাজকর্ম্ম করে, তারাও একে একে আসছে। ঢাকে ঢোলে, হাঁকে ডাকে, জাঁকে জমকে গাঁয়ে একটা সোরগোল পড়ে গেছে।

কা'ল ঘোষেরা বাড়ী এসেছে। কত জিনিষপত্রই না এনেছে! দুই নৌকা বোঝাই মালপত্র। তাহাদের সঙ্গে একটা গ্রামোফোন এসেছে। ললিতদাদা এবার একটা ক্যামেরা সঙ্গে এনেছেন—এরই মধ্যে কত ছবি তুলে ফেলেছেন। ও বাড়ীর কাকাবাবু একটা বন্দুক এনে নদীর ধারে পাখী শিকার করছেন। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে দেখি পা'ল তুলে কত নৌকা এসে আমাদের ঘাটে ভিড়ছে। প্রত্যেকটাতেই ভাবি, তুমি বুঝি আসছ। সবাই বাড়ী আসছে, সকল বাড়ীতেই

ধুমধাম। আমাদের বাড়ীই কি এবার অন্ধকার হ'য়ে থাকবে, দাদা? দিদি এসেছে—জামাইবাবু সপ্তমীর দিন আসবেন। তুমি এলেই আমাদের ষোলকলা পূর্ণ হয়। ইতি—

তোমার স্নেহের ভাই অর্দ্ধেন্দু।

শ্রীচরণকমলেষু—

মামাবাবু, আজ তিন দিন হইল, আমাদের দুঃখিনী জননী আমাদিগকে ফেলিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। মা আমার বড় দুঃখ, বড় যন্ত্রণা পাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সকল জ্বালা মা-গঙ্গার জলে জুড়াইয়া দিয়াছে। অনেক দিন হইতেই তিনি ভুগিতেছিলেন, প্রস্তুত হইবার সময়ও দিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই তিনি এমন করিয়া চলিয়া যাইবেন। ভাল করিয়া চিকিৎসা হইলে হয়ত তিনি বাঁচিতেন। কিন্তু গ্রামে সুচিকিৎসার-ত সম্ভব হইল না। বাবা কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু অত্যন্ত ব্যয় হইবে বলিয়া মা রাজী হ'ন নাই।

অভাবের সংসারে কত যন্ত্রণাই তিনি পাইয়াছেন! নিজে দিনরাত খাটিয়া, কত দুঃখ সহিয়া, কত জ্বালা গোপন করিয়া, তিনি আমাদিগকে সুখে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভাল করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতে পরাইতে পারেন নাই বলিয়া কতই না আক্ষেপ করিতেন! আমরা তাঁহাকেও কতই না দুঃখ দিয়াছি! কত অবুঝের মত আবদার করিয়াছি। ছোট ভাইবোনেদের জ্ঞান নাই—তাহারা ত বুঝিত না। যদি জানিতাম মা এমন করিয়া চলিয়া যাইবেন—তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তও তাঁহার কাছছাড়া হইতাম না—খেলা করিয়া সময় নষ্ট করিতাম না, তাঁহার সকল কাজে সাহায্য করিতাম, সারাদিনই তাঁহার সেবা

করিতাম—কোন খাদ্যে লোভ হইলেও তাহা সংবরণ করিতাম, ক্ষুধা পাইলেও চুপ করিয়া থাকিতাম।

মৃত্যুর তিন দিন আগেও মা আমাদের রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছেন। জ্বর গায়ে কত কষ্টেই না তিনি সংসারের সকল কাজ করিতেন! ছোট ভাই-বোনগুলি তাঁহাকে এক দণ্ড বিশ্রাম দিত না—এবং কাজ বাড়াইয়া দিত, শীতের রাত্রেও ঘুমাইতে দিত না। দিদির বিবাহের জন্য মায়ের আহার-নিদ্রা ছিল না। সে কি দুশ্চিন্তা! তারপর দিদির বিবাহ হইয়া গেল। সংসারের জ্বালা মাকে একাই পোহাইতে হইয়াছে। বালিকা হইলেও দিদি যে সংসারের কতখানি ছিল—তাহা তখন বুঝা গেল। আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিতেই মায়ের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। ফল পাকিলে তবে অনেক গাছ মরিয়া যায়, কিন্তু আমরা 'মানুষ' না হইতেই মা আমাদের চলিয়া গেলেন।

মা সজ্ঞানে বিদায় লইয়াছেন—মৃত্যুকালে বাবার পায়ের ধূলা লইলেন এবং অস্ফুটস্বরে মুখে ভগবানের নাম করিতেছিলেন। তখন তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি পায়ের কাছে বসিয়াছিলাম, আমাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—কি বলিতে চেষ্টা করিলেন বলিতে পারিলেন না! সজল চোখে কেবল মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

দিদি মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মা ছোট খোকাকে তাহার কোলে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। দিদি ছোট বোনটিকে লইয়া যাইবে। বাবা কেমন যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন—খোকা-খুকীকে বুকে ধরিয়া বালকের মত কেবল কাঁদেন। এ সময় আপনি একবার আসিবেন এবং আমাদের গতি কি হইবে তাহা ঠিক করিয়া যাইবেন।

ইতি—

আপনার স্নেহের প্রবোধ।

ফুলগাঁ, পোঃ, রামনগর, জেলা মুর্শিদাবাদ।
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮।

শ্রীচরণকমলেষু—

ছোটদি, তোমার পত্র পেয়েছি। তুমি কতদিন আর শ্বশুরবাড়ীতে থাকবে? তুমি যাবার সময় ব'লে গেলে—তিনমাস পরেই ফিরে আসবে; তিন মাসের জায়গায় আজ পাঁচমাস হ'য়ে গেল। তোমার জন্য আমার বড় মন কেমন করে,—পড়াশুনার মন লাগে না। তোমার জিনিসপত্রগুলো দেখলে আমার কেবল কান্না পায়।

আমাদের বাগানে আম এবারেও তেমনি পেকেছে। আমি আর আম পাড়তে কি কুড়াতে যাই না। তুমি থাকলে যেতাম,—একলা যেতে ভাল লাগে না। বকুলতলা ফুলে ভ'রে থাকে—আমি আর ফুল কুড়াই না; কুড়িয়ে কি হবে? মালা গাঁথবে কে? স্নান করতে গিয়ে অভ্যাসমত পদ্ম তুলে আনি, কিন্তু বাড়ীর দুয়ারে এসেই ছিঁড়ে ফেলে দিই। তুমি ঐ পদ্ম দিয়ে আমাদের কাঠের ঠাকুরটিকে সাজাতে। ঠাকুরটা এখন উঠানের এক কোণে প'ড়ে আছে। তোমার পুতুলের ঘর আমি ভেঙ্গে দিয়েছি। পুতুলগুলোকে প'ড়ো বাড়ীতে ফেলে দিয়েছি। আর কি হ'বে? তুমি ফিরে এসেও-ত আর পুতুল খেলবে না। বাড়ীতে কোন' ভাল খাবার তৈরী হ'লে মা তোমার নাম করেন,—আমার কান্না পায়। আমি তো খেতে পারি না, বিড়ালকুকুরকে দিয়ে দিই। মা মাঝে মাঝে তোমার নাম ধ'রে ডাকেন—আমি চমকে চারিদিকে চাই। বাড়ীর বাহিরে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলায় পড়াশুনায় একরকম কেটে যায়। বাড়ীতে ফিরে এলেই মন খারাপ হ'য়ে যায়।

এখানকার খুব দরকারী সংবাদগুলো তোমাকে এবার জানাই। আমাদের বাড়ীর নিমগাছটা ফুলে ভ'রে গেছে। উঠানে বেলফুল রাশ-রাশ ফুটছে। আমাদের লাগানো গাছপালার মধ্যে একটা ম'রে গিয়েছে। তুমি চলে যাওয়ার পর ঠিকমত জল দেওয়া ত হয় না। মালতীলতাটা আরও একহাত বেড়েছে। মঙ্গলার এঁড়ে বাছুর হয়েছে। ভুলো-কুকুরটা ম'রে গিয়েছে। ময়নাটা রোগা হয়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে তোমার নাম ধ'রে ডাকে। এ-বার ভাল আম হয়নি। মাকে বলেছি, যা' হয়েছে সব যেন তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মা বলেছেন,—তাই দেব। তোমার সইয়ের আষাঢ় মাসে বিয়ে। তাতেও তুমি কি আসবে না?

তোমার বিয়ের ভাবনায় মা-বাবার চোখে ঘুম ছিল না,—তোমার বিয়ে হওয়ায় যে আমার চোখে ঘুম আসে না, ছোটদি! তোমার চিঠিগুলো জড়ো ক'রে ভাঙা টিনের বাক্সয় রাখছি। তুমি এলে সব দেখাব। ইতি—

স্নেহের ভাই রবি।

১। পিতার নিকট বিদেশে পড়াশুনার জন্য খরচার টাকা চাহিয়া পত্র লিখ। ২। ভাগিনেয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া ভগিনী-পতিকে পত্র লিখ। ৩। ভ্রাতৃবিয়োগে বন্ধুকে সান্ত্বনা দিয়া পত্র লিখ।

৪। ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে প্রধান শিক্ষকের নিকট ছুটি চাহিয়া পত্র লিখ। ৫। কোন উপকারীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইয়া পত্র লিখ। ৬। কাশীতে গিয়া সেখানকার স্থানীয় বর্ণনা দিয়া ছোট-ভাইকে পত্র লিখ। ৭। ভগিনীপতিকে তাহার জন্মদিনে শুভবাসনা

জানাইয়া পত্র লিখ। ৮। মাতুলালয়ে বিজয়ার প্রণাম জানাও। ৯। তোমার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র রচনা কর। ১০। নূতন স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া পিতাকে সেই স্কুলের পরিচয় জানাও।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অনুবাদ

অনুবাদের সাধারণ নিয়মগুলি প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। এই খণ্ডে কেবল কতকগুলি নিদর্শন দেওয়া হইল। প্রত্যেকটি অনুবাদের সঙ্গে জটিল বাক্যগুলিকে কিরূপ সরল স্বাভাবিক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দেওয়া হইল।

(১)

We cannot look at the sun. He is so bright that he dazzles our eyes. Only the eagle can look at him. When the sun rises in the morning, the eagle flies up in the sky to meet him and to cry loudly there. And the cock crows aloud to tell everybody that the sun is coming. But the owl and the bat fly away when they

see the sun rising in the east. They hide themselves in dark places.

আমরা সূর্য্যের পানে তাকাইতে পারি না। সূর্য্য এমনি উজ্জ্বল (বা প্রখর) যে, চাহিলে আমাদের চোখ ঝলসিয়া যায়। একমাত্র ঈগলপক্ষীই সূর্য্যের পানে চাহিতে পারে। প্রাতঃকালে যখন সূর্য্য উঠে, ঈগলপক্ষী তখন উড়িতে উড়িতে আকাশে উঠিয়া সূর্য্যের সম্মুখীন হয় ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে। মোরগ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া সকলকে জানায় যে, সূর্য্যোদয়ের সময় হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে সূর্য্যকে উঠিতে দেখিয়া পেঁচা ও বাদুড়গুলি উড়িয়া পলায় ও অন্ধকার জায়গায় লুকায়।

[Fly up to meet, to tell the sun is coming—এইগুলির অনুবাদ লক্ষ্য করিতে হইবে। Hide themselves—আত্মগোপন করে—এরূপ অনুবাদ করা যায়; কিন্তু সোজা ভাষার সঙ্গে খাপ খায় না।]

(২)

You have heard of our great Queen Victoria. Look at the picture. Victoria came to the throne of England when she was a girl of eighteen. She became the Empress of India in 1838. Queen Victoria had a very tender heart. She ruled India with the heart of an affectionate mother. She reigned over us for more than sixty years. She died in the year 1901.

তোমরা আমাদের মহীয়সী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কথা শুনিয়াছ। তাঁহার চিত্রখানির দিকে তাকাও। তাঁহার বয়স যখন আঠারো বৎসর

তখন তিনি ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের অধীশ্বরী (রাজরাজেশ্বরী) হ'ন। তাঁহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। স্নেহময়ী জননীর হৃদয় লইয়া তিনি ভারত শাসন করিতেন। ষাট বৎসরের অধিককাল তিনি আমাদের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন।

[কাহারও কাহারও মতে সম্রাজ্ঞী শব্দটি অশুদ্ধ। সেজন্য অধীশ্বরী বা রাজরাজেশ্বরী শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।]

(৩)

After summer comes the Rainy Season. It lasts for two months from the middle of June to the middle of August. Then the tanks and wells that dried up during Summer are filled up again. Sometimes the streets in the cities are flooded and the kutcha roads of villages are covered with mud. The water of a river may rise above the banks and flood the fields around. In such case, there is often great loss of life. Such things are common in India.

গ্রীষ্মের পর বর্ষার আরম্ভ। ইহা দুই দুইমাস কাল থাকে,—জুনের মাঝামাঝি হইতে আগষ্টের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। গ্রীষ্মে যে সকল পুষ্করিণী ও কূপের জল শুকাইয়া যায়, তাহারা তখন আবার ভরিয়া উঠে। কখনও কখনও শহরের রাস্তাগুলি জলে ডুবিয়া যায় এবং গ্রামের কাঁচা রাস্তাগুলি কাদায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নদীর জল তীর ছাপাইয়া উঠিয়া চারিদিকের মাঠ ভাসাইয়া দিতে পারে। সেরূপ ক্ষেত্রে অনেক প্রাণহানি হয়। ভারতবর্ষে এই রকম ব্যাপার প্রায়ই ঘটে।

[নিম্নে কয়েকটি বাক্য-বিনিময়ের অনুচ্ছেদ উদাহৃত হইল। এই-গুলিকে মুখের কথায় (জবানীর) অনুবাদ স্বাভাবিক চলতি বাঙ্গালায় দেওয়া হইল।]

(৪)

"At night it gets dark. Then I lock the door of my house. Do you lock your door, too?"

"No, I never lock my door."

"Are you not afraid of thieves? They may come in the dark and steal something."

"Oh, no! I have a good guard. He watches my house all night long. He never sleeps. Thieves are afraid of him. He is my little dog. If he sees a thief he barks."

"রাত্রি হ'লে অন্ধকার হয়। তখন আমি বাড়ীর দরজা বন্ধ করি। তুমিও তোমার দরজা বন্ধ কর-ত?"

"না, আমি কখনও দরজা বন্ধ করি না।"

"তুমি চোরকে ভয় কর না? (তোমার চোরের ভয় নেই?) তারা অন্ধকারে এসে কিছু চুরি করতে পারে ত?"

"নিশ্চয়ই— না, আমার একটি ভাল পাহারাওয়ালা (প্রহরী) আছে। সারা রাত্রি ধ'রে সে আমার বাড়ীতে পাহারা দেয়। সে কখনও ঘুমায় না, চোরেরা তাকে ভয় করে। সে হচ্ছে আমার ছোট কুকুরটি। চোর দেখলেই সে ঘেউ-ঘেউ শব্দ করে।"

[At night, it gets dark—এই বাক্যটিকে কথায় কথায় অনুবাদ করিলে বাঙ্গালা হইবে না। Are you not afraid of

thieves ? এই বাক্যটি সম্বন্ধেও তাই। পরের বাক্য দুইটিকে একটি বাক্যে অনুবাদ করিতে হইয়াছে। শেষ বাক্যের 'If'-এর অনুবাদ 'যদি' দিয়া করিলে চলিবে না।]

(৫)

Once upon a time there were two friends. One was a jackal and the other was a camel. The jackal was a cunning animal. The camel was not cunning, but he was very wise.

One day the jackal wished to go across the river. He could not swim. So he said to the camel—

"Are you hungry, friend ? I know where there is some sweet cane."

"Where is it ?" asked the camel.

"It is across the river," said the jackal.—"Will you carry me over ? I can show you where the sugar-cane is."

"I will carry you with pleasure," said the camel. He knelt down, and allowed the jackal to jump on to his back. The camel walked into the river and swam to the other side.

এক সময় একটি উষ্ট্র ও একটি শৃগালের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। শৃগালটি ধূর্ত্ত। উষ্ট্রটি ধূর্ত্ত ছিল না, কিন্তু তাহার যথেষ্ট বিচক্ষণতা ছিল। একদিন শৃগালটির নদীর পরপারে যাইতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে

সাঁতার দিতে জানিত না। কাজেই উষ্ট্রটিকে বলিল—বন্ধু, তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে? কোথায় মিষ্টি মিষ্টি আখ পাওয়া যায়, তাহা আমি জানি। উষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় বল দেখি? শৃগাল বলিল—নদীর ওপারে। তুমি আমাকে নদী পার ক'রে নিয়ে যাবে? কোথায় পাওয়া যায় তা আমি দেখাতে পারি? উষ্ট্র বলিল—খুশী হ'য়েই তোমাকে ব'য়ে নিয়ে যাব। এই বলিয়া সে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া শৃগালকে লাফ দিয়া পিঠে উঠিতে দিল এবং নদীতে নামিয়া সাঁতরাইয়া অপর পারে গেল। (মুখের জবানীর অনুবাদ চলতি ভাষায়)

[এক সময়ে দুই বন্ধু ছিল—একজন একটি শৃগাল, অপর জন উষ্ট্র, —এইরূপ অনুবাদে ভাবপ্রকাশ হয় বটে—কিন্তু ভাষা স্বচ্ছন্দ হয় না। দুই তিনটি বাক্যের অনুবাদে কর্ত্তা বদলাইতে হইয়াছে; নতুবা শুনিতে ভাল হয় না। Some sweet sugar-cane এর বদলে মিষ্টি মিষ্টি আখ—না বলিলে খাঁটি বাঙ্গালা বলা হয় না।]

(৬)

In a forest there lived an old tiger. *He was too old and feeble to chase his prey.* One day he went to a tank and slowly bathed himself. After his bath, he sat on the bank, holding in his paw a bracelet.

A Brahmin, with a stick in his hand, passed that way. The tiger saw the Brahmin and said, "Come here, good sir. I will give you a gold bracelet."

কোন' বনে একটি ব্যাঘ্র বাস করিত। সে এত বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, শিকারের পিছু পিছু ছুটিয়া আর শিকার ধরিতে পারিত

না। একদিন সে একটি পুকুরে নামিয়া আস্তে আস্তে স্নান করিল। স্নানের পর সে একটি কঙ্কণ থাবায় করিয়া পুকুরের ধারে বসিয়া রহিল। লাঠি হাতে একটি ব্রাহ্মণ সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। ব্যাঘ্রটি ব্রাহ্মণকে দেখিয়া বলিল—"এদিকে আসুন, মহাত্মন্, আমি আপনাকে একটি স্বর্ণ-কঙ্কণ দান করিব।"

[এখানে He was···prey—এই বাক্যটির অনুবাদ লক্ষ্য করিতে হইবে। বিশেষণের বিশেষণ-রূপে যে বাক্যে Too ব্যবহৃত হয়, সে বাক্যকে বাঙ্গালায় মিশ্র বাক্যে অনুবাদ করিতে হয়। Himself কথাটির অনুবাদের স্থান নাই।]

অনুশীলনী—নিম্নলিখিত অণুচ্ছেদগুলি অনুবাদ কর :—

1. The name of our country is India. We belong to the great Aryan family. Our fore-fathers came here probably from Central Asia. First of all, they settled in the northern plains of the Hindusthan. So those plains are known by the name of the "Aryyavatra." There lived in India many peoples speaking different tongues. The population of this country is over three hundred and thirty millions. The soil of India is very fertile, the climate excellent.

[Forefathers—পূর্ব্বপুরুষগণ। Settled—বসবাস করিয়াছিল, উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। Three........millions—তেত্রিশ কোটি।]

2. A shepherd's boy tended flock of sheep by the side of a forest. To amuse himself he used to cry out,

'wolf, wolf' from time to time. And when the farmers from the fields near by came to his help he laughed at them for their pains which were in vain. Soon the wolf did actually come and the boy was much alarmed. He cried out at the top of his voice. Kindly do come and help me, friends. This time the wolf has really come.

But the peasant turned a deaf ear to his cries. So the wolf, having no cause for fear from any quarter, took things easily and fell upon the flock. No one trusts a liar even when he speaks the truth.

[Tended flock of sheep—এক পাল ভেড়া চরাইত। To amuse himself—মজা দেখিবার জন্য। From time to time—সময়ে সময়ে, মাঝে মাঝে। For their pains which were in vain—তাহাদের বৃথা শ্রম (বা কষ্ট) স্বীকারের জন্য। Did actually come—সত্যসত্যই আসিল। Alarmed—ভীত। At the top of his voice—উচ্চৈঃস্বরে, প্রাণপণে যতদূর গলার স্বর উঠে। Turned a deaf ear to—কর্ণপাত করিল না, শুনিয়াও শুনিল না। From any quarter—কোন' দিক হইতে। Took things easily—সহজে কাজ সারিতে লাগিল।]

3. Ram and I have been to see the sheep feed on the green grass in the field. One sheep had fallen into the cool pool near the field. The pool was not deep; so Ram got it out. He did not get wet; so there was

no need to go home. Was not Ram a good boy to get the sheep out of the pool ?

[Have been to see—দেখিতে গিয়াছিলাম। Get it out —ইহাকে (টানিয়া) তুলিয়াছিল। He did not get wet—তাহার গায়ে জল লাগে নাই, তাহার গা ভিজে নাই। So—কাজেই ! Last sentence—ডোবা হইতে ভেড়াটিকে তুলিয়া রাম কি ভাল ছেলের কাজ করে নাই ?]

4. Two boys went to the woods to play. They saw a great bear. They ran away and the bear ran after them. The bear ran fast, so they hid in a big banyan tree. At first the bear did not see them. When he did see them, he sat at the foot of the tree. The boy did not know what to do.

[Ran after—পিছুপিছু ছুটিয়াছিল। Fast—দ্রুত। At the foot of the tree—গাছের গোড়ায়। Did not know what to do—কি করিবে ঠিক করিতে পারে নাই। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

5. The lion was just going to kill it, when it implored the lion's mercy. It pleaded so hard for its life that at last the lion let it go. The mouse ran off to its hole, saying, "Noble Lion, I hope I may one day be able to repay your kindness". The lion only smiled at the mouse's words. He could not see how a little mouse might ever be of any use.

[Implored mercy—কৃপা ভিক্ষা করিল। Pleaded so hard

—এত বেশি অনুনয়বিনয় করিল। Repay—প্রতিদান দেওয়া। Last sentence—একটি ছোট ইঁদুর কিরূপে কখনও তাহার উপকারে আসিতে পারে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।]

6. When the day came, I was dressed in my best clothes and got ready to start. I saluted my father and mother and all the elder members of my family and they gave me their blessings. Before I started, I was given a piece of chalk, and my grand-mother, who feared that hard task of learning to read and write would make me very hungry, wrapped up in the corner of my *dhoti* a little *murhi*; so that I could refresh myself, whenever the pangs of hunger became greater than I could bear.

[Saluted—প্রণাম করিল। Elder members—গুরুজনগণ। Before I started—যাত্রার পূর্ব্বে। My grandmother.......... murhi—আমার ঠাকুরমার ভাবনা হইল..........পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা পাইবে তাই তিনি ধুতির খুঁটে ইত্যাদি। Whenever......bear—ক্ষুধার অসহ্য কষ্ট হইলেই।

7. *Lion*—I don't feel at all well to-day.

Fox—I am sorry to hear you say that. Is there anything that I can do for you ?

Lion—If you really want to make me well again go out into the forest and bring me a deer. I have been told by a wise doctor that if I eat the heart and brains of a deer, I shall soon get well again.

Fox—But how am I to do that ? I cannot run fast

enough to catch a deer, and even if I could, I should not be strong enough to bring him here.

[1st sentence—আমি আজ একটুও সুস্থ বোধ করিতেছি না। I have been told by a wise doctor—একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক আমাকে বলিয়াছেন। I cannot......deer........here—আমি এমন দ্রুত দৌড়াইতে পারি না যে, একটি হরিণ ধরিতে পারিব। তাহা পারিলেও আমার এমন শক্তি নাই যে, তাহাকে এখানে (টানিয়া) আনিতে পারি।

8. Do you see the old beggar that stands at the door?
Do not send him away, we must pity the poor.
Oh! see how he shivers! he is hungry and cold.
For people can't work when they grow very old.
I hope my dear children will always be kind.
Whenever they meet with the aged and blind.

[প্রথম বাক্যকে দুইটি বাক্যে ভাঙ্গিয়া অনুবাদ কর। Shivers—কাঁপিতেছে। Cold—শীতল। Whenever—যখনই।]

9. You see, there are so many beasts that would like to be King, but they nearly all have some fault. There is the Boar; he has no sense and will not do for a King. Then there is the Bear: he is brave but he is so slow and sleepy that he would not either. Then there is the Leopard: he is very handsome, but very bad-tempered. And there is the Tiger: but he is too cruel and proud.

10. Early in summer (গ্রীষ্মের প্রথম দিকে) Flora went into the country (পল্লীগ্রাম), to see her little Friend Annie. She had never been away from the city before

and she did not know much about the country. Annie was glad when Flora came. The two girls had a pleasant time (বড় আনন্দেই কাটাইতেছিল) and were very happy. Every day they went into the field and woods.

11. Many things in the country were new and strange (অদ্ভুত) to Flora. At first, she hardly knew a sheep from a cow (ভেড়ার ও গোরুর মধ্যে তফাৎ জানিত না) or a duck from a goose ; but she soon learnt all these.

She stayed with Annie till the summer was over (গ্রীষ্মের শেষ হওয়া পর্য্যন্ত). After she had gone back to her home in the city, she wrote a letter to her little friend and then Annie wrote a letter to Flora.

Would you like to read these two letters ?

12. My dear Annie, it is now three weeks since I have come home (তিন সপ্তাহ হইল আমি বাড়ী আসিয়াছি). I often think of the pleasant days, that I spent with you in the country (পল্লী অঞ্চলে).

I have a new book that papa brought for me. It is a pretty book, and I am going to read it.

Write to me, Annie, and tell me all about the things on the farm. Do the flowers bloom in the meadow ? Do the lambs still (এখনও) play in the grassy (ঘাসে-ভরা) field ? Are the apples ripe ?

Your friend, Flora.

13. Dear Flora, your letter came to me this morning. I was very glad to hear from you (তোমার সংবাদ পাইয়া) and so was mother (মা-ও). We have missed you very much since you went away.

Jack Frost has killed (তুষারপাতে নষ্ট হইয়াছে) all the flowers in the meadow. The lambs that you saw when you first came here, are almost as big as sheep now. The apples are ripe and we have carried them into the barn. Our school will begin next week. I shall be glad, for then I shall have new books.

Your loving friend, Annie.

নিম্নলিখিত গল্প দুইটি সরল বাঙ্গলায় অনুবাদ কর।

1. An old lion lived in a den. He was very weak and he could not catch his prey. "I am so hungry", said he, "How can I get something to eat ?" Just then a rabbit came hopping along, "Good morning, Bunny." said the lion, "Will you come in ?" "Thank you," said Bunny, and went in. But Bunny did not come out. Then came a dog trotting along. "Come in, my friend," said the lion. The dog walked in. And he too did not come out. Very soon there came a sly fox. "How do you do, Brother Fox ?" said the lion. "Won't you walk into my den ?" But Brother Fox did not reply. He only looked at something on the ground. "What are you looking at ?" "I see the tracks," said the Fox. "Yes ! I have friends who often come to see me," replied the lion. "All the tracks go into the den. But they do not come out," the sly fox thought. "Come in," said the lion. "No, thank you." said the Fox. "The tracks do not show me the way out." So the Fox took fright and fled away,

Prey—শিকার, weak—দুর্ব্বল, rabbit—খরগোশ, hop—লাফাইয়া চলা, good morning—নমস্কার, thank—ধন্যবাদ, show—দেখান, ground—মাটি, track—পায়ের দাগ, friend—বন্ধু।

2. An Englishman owned a dog. He was very kind to the dog. And the dog was very fond of his master. He was always with him. One day the master fell ill. He was very weak and he could not go out. The dog was always by his side. He watched him night and day like a friend. After sometime the man died. His dead body was brought out and put into the grave. The poor animal followed the dead body. Soon the men left the grave. But the dog would not return. He sat on the grave, looking at it. Even hunger and thirst could not drive him home. He became weak day by day. At last he could not sit up any longer. So he had to lie down. A kind girl took pity on the dog. She tried to bring him home. But the dog would not stir. At last she brought him some food. It saved the life of the poor dog. Wasn't the dog really faithful ?

Is lying on—শুইয়া আছে, fell ill—অসুস্থ হইয়া পড়িল, like a friend—বন্ধুর মতন, animal—প্রাণী, followed—অনুসরণ করিল, drive—তাড়ান, faithful—বিশ্বস্ত, Englishman—ইংরাজ, watched—লক্ষ্য রাখিয়াছিল, sometime—কিছুকাল, was put into—ভিতরে রাখা হইল, return—ফিরিয়া আসা, really—সত্যসত্যই, was brought out—বাহিরে আনা হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গল্প-রচনা

(Composition of Stories)

[ষষ্ঠশ্রেণীতে নিবন্ধ রচনার বদলে গল্পরচনার পাঠ্যসূচি বিহিত হইয়াছে। সেজন্য গল্পরচনা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইল। নিম্নশ্রেণীতে নিবন্ধ-রচনা-শিক্ষা অপেক্ষা গল্পরচনা শিক্ষার অধিকতর প্রয়োজন।]

মানুষমাত্রেই গল্প শুনিতে ভালবাসে। যাহা নিজে করিতে পারে না, সচরাচর যাহা দেখিতে পায় না, যে সব সাধ পূর্ণ করিতে পারে না, তাহাদের সব কথাই মানুষ গল্পে শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করে। শিশুর শক্তি অল্প, জ্ঞান অল্প, অতি অল্পই সে দেখিয়াছে, তাহার অধিকাংশ সাধই মেটে না, তাই শিশু গল্পে সে সকল কথা শুনিতে খুব বেশি ভালবাসে। গল্প শুনিবার জন্য সে দিদিমা, পিসিমা, ঠাকুরমা, জ্যাঠাইমা, ঠাকুরদাদা ইত্যাদি প্রাচীন-প্রাচীনাদের কোল ঘেঁসিয়া বসে।

আমরা প্রথম গল্প শুনি দিদিমা-দাদামহাশয়ের কাছে। সচরাচর যাহা দেখিতে পাই না,—তাহারই কথা শুনিতে চাই ; যাহা কিছু অদ্ভুত বা বিচিত্র, তাহাই জানিতে চাই। তাঁহারাও আমাদিগকে অনেক আজগুবি গল্প শোনান,—পরী, রাক্ষস,

দৈত্য, ভূত, প্রেতনী ইত্যাদি লইয়াই তাঁহাদের গল্প। তাঁহাদের গল্পে কল্পিত মানুষের ক্ষমতাও অসীম। গল্পের মানুষ এমন সব কাজ করে, যাহা শুনিয়া গা শিহরিয়া উঠে, অবাক্ হইতে হয়। অন্যান্য জীবজন্তুরা মানুষের মতই কথা কয়, কাজ করে, কৌশল বাহির করে। শৈশবকালে আমরা কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব বুঝি না। আমাদের বিশ্বাস করিবার শক্তিও থাকে অসীম ; তাই সবই নির্বিচারে বিশ্বাস করি।

ক্রমে বড় হইলে জানিতে পারি যে, ও-সব গল্প নেহাৎ আজগুবি বা গুলিখুরি,—একেবারেই অসম্ভব। তখন আর ও-সব গল্পে তেমন আনন্দ পাই না। যাহা কতকটা সম্ভব, অথচ বিচিত্র তাহাই শুনিতে চাই। তখন শুনিতে চাই পৌরাণিক গল্প, যথা—রাম, সীতা, সাবিত্রী, ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির ইত্যাদির কাহিনী। ক্রমে আরও বড় হইলে পৌরাণিক গল্পও আজগুবি বলিয়া মনে হয়। কেবল ইতিহাসের কাহিনীগুলিই যে সত্য, এই ধারণা জন্মিয়া যায়। তখন ইতিহাসের গল্প শুনিতে চাই ; পৌরাণিক গল্পের মধ্যে যতটুকু ইতিহাস কেবল ততটুকু গ্রহণ করি। মহাপুরুষগণের জীবনচরিত ও পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-কাহিনী আরও ভাল লাগে। তখন কেবল আনন্দ নয়, আনন্দের সঙ্গে জ্ঞান লাভও করিতে চাই।

উপকথা শুনিবার প্রবৃত্তি আমাদের পরিণত বয়সেও একেবারে নষ্ট হয় না। অসত্য বলিয়া জানিয়াও আমরা গল্প শুনিতে চাই। যাহা কিছু মানুষের অসাধ্য, যে-সব জীবের

অস্তিত্বই নাই (যেমন পরী, রাক্ষস ইত্যাদি), যাহা সংসারে কখনও ঘটে না বা ঘটা সম্ভব নয়,—সে সকলের কথা শুনিয়া আনন্দ পাই না বটে,—কিন্তু যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে বা মানুষের পক্ষে যাহা সম্ভব, তাহার কথা লইয়া রচিত গল্প শুনিতে চাই। সে-জন্য উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে। জীব-জন্তু-পরী-দৈত্যের গল্পও যে ভালবাসি না, তাহা নয়—তবে ঐসকল গল্পের ব্যঙ্গার্থ বা গূঢ় নৈতিক অর্থটা কি, তাহাই শুধু লক্ষ্য করি।

বাল্যকাল হইতে গল্প শুনিয়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকারের আখ্যায়িকা, ইতিহাস, পুরাণ-কাহিনী, সংবাদপত্রের বিবরণ ইত্যাদি পড়িয়া নানা দেশ ঘুরিয়া নানা লোকের সংসর্গে এবং নিজের জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়া আমরা যে জ্ঞান লাভ করি—তাহার সাহায্যে নিজেরাও গল্প রচনা করিতে পারি।

ছাত্রগণও যতটুকু পড়িয়াছে বা দেখিয়াছে এবং যে সকল গল্প শুনিয়াছে—সে সকলের সাহায্যে নূতন নূতন গল্প রচনা করিতে পারে। গল্প রচনা হইলেই সাহিত্য-রচনার সূত্রপাত হইবে—ভাষাও স্বভাবতই সরস হইয়া উঠিবে—সাহিত্যের রসবোধেও দীক্ষা লাভ হইবে। গল্প রচনা করিতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম মনে রাখিতে হইবে।

১। গল্পের ভঙ্গীটি একটু বিচিত্র হওয়া চাই, শুনিবার জন্য যেন স্বতঃই আগ্রহ জন্মে।

২। গল্পের ভঙ্গীটি এমন সরস হওয়া চাই, যেন শুনিতে ভাল

লাগে। এলোমেলো করিয়া বলিলে বা নীরস করিয়া বিবৃত করিলে চলিবে না।

৩। গল্পের বিষয়টিকে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিতে হইবে, শ্রোতা বা পাঠক যেন 'তারপর কি হইল'—জানিবার জন্য ব্যগ্র হয়।

৪। শ্রোতা ও পাঠকের কৌতূহলটিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য শেষ কথাটিকে চাপিয়া রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। গোড়াতেই যেন শেষটা কি হইবে তাহার আভাস ইঙ্গিত দেওয়া না হয়।

৫। যাহার সহিত মূল গল্পের কোন সম্বন্ধ নাই—এমন সব কথা গল্পের মধ্যে যেন আনা না হয়।

৬। গল্পের বর্ণিত ঘটনার আবহাওয়াটা যেন শ্রোতা বা পাঠকের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে; সে জন্য স্থান কাল বা পাত্রের বর্ণনা আবশ্যক। কিন্তু তাহা যেন আবার অতিরিক্ত হইয়া না যায়।

কথোপকথনচ্ছলে গল্পরচনা

(Invention of Story)

শিক্ষক—এস, মুখে মুখে একটি গল্প রচনা করা যা'ক। ধর, এক রাজার ছেলে শিকার করতে গিয়েছে।

ছাত্র—শিকার করতে গিয়ে বাঘের মুখে পড়লে ত আর গল্প আগায় না, ভালোয় ভালোয় ফিরে এলেও গল্প হয় না। তারপর?

শিক্ষক—আমি বলব কেন? বল, কি হ'লে গল্পটা আগায়?

ছাত্র—অনেক জীবজন্তু বধ করল। শেষে একটা হরিণের পিছু-পিছু ছুটতে ছুটতে গভীর বনের মধ্যে পথ হারা'ল।

শিক্ষক—পথ হারিয়ে সে কি করল? সহজে বাড়ী ফেরানো হবে

না কিন্তু। একটা নূতন বিপদের কল্পনা করতে হয়, নইলে সঙ্গের লোকজন শীঘ্রই তাকে খুঁজে বা'র ক'রে ফেলবে।

ছাত্র—তবে একদল ডাকাতের হাতে পড়ুক।

শিক্ষক—বেশ! ডাকাতেরা তাকে নিয়ে কি করবে? ডাকাতি করতে শেখাবে ত? তারা কি বিশ্বাস ক'রে দলে নিতে পারবে?

ছাত্র—কেন তাকে আটকে রেখে রাজার কাছ হ'তে অনেক টাকা আদায় করবে।

শিক্ষক—তা করতে গেলে ত ডাকাতের দল ধরাই পড়ে যাবে।

ছাত্র—আচ্ছা, শুনেছি ডাকাতের দল কালীপূজা ক'রে নরবলি দেয়। রাজপুত্রকে মা কালীর কাছে তবে ব'লি দেবে।

শিক্ষক—বেশ, বেশ, গল্প জমছে, কিন্তু বলি দিলে ত গল্প ফুরিয়ে গেল, ভাল ক'রে না জমতেই ফুরিয়ে যাবে যে।

ছাত্র—কোন' প্রকারে বাঁচাতে হবে রাজপুত্রকে।

শিক্ষক—ঠিক, কি প্রকারে বাঁচানো যায়? ধর,—ডাকাতরা পরামর্শ করল—এমন নিখুঁত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যুবকটি পাওয়া গেছে, 'একে বলি দিলে মা কালী বড়ই সন্তুষ্ট হ'বেন!' তখন রাজার ছেলেকে মালা পরিয়ে কপালে সিঁদুর দিয়ে উৎসর্গ ক'রে মন্ত্র প'ড়ে হাড়িকাঠে ফেলা হ'ল। একজন শাণিত খাঁড়া হাতে দাঁড়াল। ডাকাতের চারিপাশে দাঁড়িয়ে 'জয় জগদম্বা' ব'লে চীৎকার করতে লাগল। দু'মিনিটের মধ্যে সব শেষ হ'য়ে যাবে। এখন কি ক'রে বাঁচানো যায়?

ছাত্র—রাজার সৈন্য এসে পড়ল কিংবা মা কালীর প্রত্যাদেশ হ'ল কিংবা একজন সন্ন্যাসী হুঙ্কার ক'রে এসে সহসা উপস্থিত—

শিক্ষক—না, কোনটাই বেশ জুৎসই হচ্ছে না! সম্ভবমত কিছু বল'। গভীর বনে পাহাড়ের গুহার মধ্যে রাজার সৈন্য সন্ধান পাবে কি

ক'রে? রাজার ছেলে অবশ্য প্রাণপণে মা কালীকে ডাকতে লাগল। কিন্তু সত্যই তো মা-কালী তখনও বলিকে বাঁচিয়ে দেন না।

ছাত্র—হাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে। ধরুন, সর্দার-ডাকাতের একটি মেয়ে ছিল, সে ছুটে এসে তার বাবাকে বল্ল—'বাবা, এমন সুন্দর ছেলেটিকে ছেড়ে দাও!'

শিক্ষক—আচ্ছা, আর একটু রসান দিয়ে বল না কেন? মেয়েটি আলুথালু বেশে, এলো চুলে ছুটতে ছুটতে এসে হাড়িকাঠে নিজের গলা গলিয়ে দিল। তখন হৈ চৈ প'ড়ে গেল। সর্দার মেয়েকে ধম্‌কিয়ে তাড়িয়ে দিতে গেল। মেয়েটি কেঁদে কেটে বল্লে, 'আমাকে কাটো বাবা অমন সুন্দর ছেলেটিকে কেট না।'

ছাত্র—সর্দার কিছুতেই মেয়ের কথায় বিচলিত হ'ল না, কিন্তু দলের বাকি সকলে সর্দারের মেয়ের কান্নাকাটি শুনে বিগলিত হ'ল। তারা সর্দারকে বল্ল—'থাক্, আর নরবলিতে কাজ নেই। ছেলেটির সঙ্গে বরং তোমার মেয়ের বিয়ে দাও।'

শিক্ষক—তা বেশ! সর্দার তা'তে কোন উত্তর দিল না—নিশ্চয়ই ভাবল, আগে পোষ মানুক, তারপর যা' হয় করা যাবে। রাজপুত্রকে একটা গুহার ঘরে বন্দী ক'রে রাখ্‌ল। এইবার তাকে উদ্ধার করতে হয়।

ছাত্র—বেশত, মেয়েটি তাকে উদ্ধার করে পালাক্ না কেন?

শিক্ষক—অত সোজা নয়। সর্দার নিশ্চয়ই খুবই সাবধানে রেখেছিল। তা নয়, ধর',—ডাকাতদের মধ্যে একজন যুবকের নিশ্চয়ই ইচ্ছা ছিল ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে, এটাত স্বাভাবিক? সে নিশ্চয়ই মেয়েটির জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এইরূপ একটা কল্পনা করা যাক্। মেয়েটি তারই শরণাপন্ন হ'ল। সে আপনার ঘোড়া রাজপুত্রকে ছেড়ে দিল, দুই জনে চাবি সংগ্রহ ক'রে গভীর রাত্রে রাজপুত্রকে মুক্তি দিল।

ছাত্র—এবং নিজেও পালালো।

শিক্ষক—না, সে বীরপুরুষ, মেয়েটিকে বিপন্ন ক'রে সে পালাবে কেন ?

ছাত্র—তবে প্রাতঃকালে যখন জানা গেল রাজপুত্র পালিয়েছে, তখন অপরাধী ডাকাত-বীর ধরা পড়্‌ল এবং তাহার প্রাণদণ্ড হ'ল।

শিক্ষক—হাঁ—হ'বে, ব্যস্ত কেন। কিন্তু এই বীরটিকেও বাঁচাতে হবে। 'ধর', বিচার হ'ল—দুদিন পরে প্রাণদণ্ড হবে স্থির হ'ল। দুই-দিন ডাকাতেরা কোন একটা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকুক না কেন ?

ছাত্র—অর্থাৎ রাজপুত্র সসৈন্যে এসে পড়ুক।

শিক্ষক—দু'দিন পরে যখন অপরাধী ডাকাতকে মা কালীর কাছে বলি দেওয়ার সব আয়োজন ঠিক হ'য়েছে, আর কাজ শেষ হ'তে ২।৪ মিনিট দেরী আছে, ঠিক এই সময়েই রাজপুত্র সসৈন্যে এসে পড়ুক।

ছাত্র—তারপর তুমুল যুদ্ধ হ'ল নিশ্চয়ই। ডাকাতেরা পরাজিত হ'ল। রাজপুত্র মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল।

শিক্ষক—জনকতক ডাকাত লড়াইয়ে মারাও গেল। কিন্তু ডাকাতের সর্দার, বীর যুবক ডাকাত ও অন্যান্য কয়েকটি ডাকাত ধরা পড়্‌ল। রাজপুত্র তাদের বন্দী ক'রে রাজপুরীতে নিয়ে গেল।

ছাত্র—তারপর রাজা নিশ্চয়ই সেই ডাকাতের প্রাণদণ্ড দিলেন, আর মেয়েটির সঙ্গে রাজপুত্রের বিবাহ দিলেন।

শিক্ষক—ঠিক তা' না। তা' হয় কি ক'রে ? একজন ডাকাতের মেয়ের সঙ্গে রাজপুত্রের ত বিয়ে হ'তে পারে না। সর্দারকে যখন শ্মশানে নিয়ে শূলে চড়ানো হবে, তখন সর্দার রাজার কাছে নিবেদন করল—'রাজপুত্রের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দিন, ও মেয়ে আমার নয়।

এটি একজন রাজার মেয়ে। পাঁচ বছর বয়সে ওকে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে লুট ক'রে এনেছিলাম।'

ছাত্র—মেয়েটি নিশ্চয়ই অপূর্ব্বসুন্দরী,—একথা বলা হয় নাইত। কিন্তু ডাকাতের কথা রাজা বিশ্বাস করবে কেন?

শিক্ষক—হাঁ, রাজকন্যার মত মেয়েটির চেহারা বটে। সেটা গোড়াতেই বলতে হবে, সর্দ্দারের নিজের কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা। সে প্রমাণস্বরূপ বলল,—মেয়েটির ডানচোখের ভুরুর কাছে একটা কাটা দাগ আছে, আর এক পায়ের ক'ড়ে আঙুল একটু উঁচু, আর পিঠে একটা জটুল আছে। অমুক দেশের রাজার যে মেয়েটি চুরি গেছে, তার কি কি চিহ্ন ছিল জিজ্ঞাসা ক'রে লোক পাঠানো হোক্—আর কত বয়সে, কবে মেয়েটি চুরি গেছে তাও জিজ্ঞাসা করা হোক। আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম ঠিক এগারো বছর আগে শিবচতুর্দ্দশীর দিন।

ছাত্র—বলা বাহুল্য, ডাকাতের প্রাণদণ্ড স্থগিত রইল। আর সেই দেশের রাজাকে জিজ্ঞাসা করায় সব মিলে গেল।

শিক্ষক—হাঁ, ২০ দিন পরে দূত ফিরে এসে জানাল—যে মেয়েটি রাজার চুরি গেছে, সে মেয়ের বয়স ষোলই হবে। ১১ বৎসর আগে শিবচতুর্দ্দশীর দিন তাঁর নর্ম্মদাতীরের এক তাঁবু লুট হয়—সেই সঙ্গে ডাকাতেরা মেয়েটিকে নিয়ে যায়, তার গায়ে এই সব চিহ্ন আছে। রাজা সব মিলিয়ে দেখিলেন—মেয়েটি রাজকন্যাই বটে। তখন মেয়েটির মা-বাপকে খবর দেওয়া হ'ল—তারা এল, বিয়ে হ'য়ে গেল।

ছাত্র—আর ডাকাতের সর্দ্দারের কি হল? অন্যান্য ডাকাতদেরই বা কি হল? নিশ্চয়ই প্রাণদণ্ড আর হ'ল না?

শিক্ষক—তা' আর কি ক'রে হয়? ডাকাতের সর্দ্দার কতকগুলি টাকাকড়ি পেয়ে কাশীবাস করতে গেল। তার আর ডাকাতি ভালো

লাগ্‌ল না, অনেক পাপ করেছে, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে গেল। বীর ডাকাত যুবকটি রাজ্যের সেনাপতি হ'ল। অন্যান্য ডাকাতেরা তার অধীন সৈনিক হ'ল। এইরূপ হ'লেই ভাল হয় নাকি? এইবার গল্পটি লিখে ফেল।

দুইজনের কথাবার্তার মধ্য দিয়া যে গল্পটি গড়িয়া উঠিল—তাহা পাঠ করিতে কেবল আনন্দলাভই ঘটে! এমন গল্প যথেষ্ট আছে—যাহাতে অনন্দলাভও হইতে পারে—কিছু নৈতিক জ্ঞানলাভও হইতে পারে। যেমন **ঈসপের** গল্প।

শুষ্ক নীরস নীতিকথায় কোন ফল হয় না, শুনিতে ভালও লাগে না। অনবরত নৈতিক উপদেশ শুনিয়া শুনিয়া বিরক্তি জন্মে। ঐ নৈতিক উপদেশ যদি গল্পচ্ছলে প্রকাশ করা যায়, শিশুগণ পড়িয়াও আনন্দ পায়, পরোক্ষভাবে বিনা আয়াসে কিছু নৈতিক জ্ঞানও লাভ করে। অন্যান্য গল্পের মত এই গল্পগুলিকে বিবিধ ভঙ্গীতে লেখা যাইতে পারে। পরোক্ষ ভাবে বিবৃতি করা একপ্রকারের ভঙ্গী। দুই তিন জনের মুখে কথা বসাইয়া কথোপকথনের ছলে প্রকাশ করা আর একটি ভঙ্গী। দ্বিতীয় প্রকারের ভঙ্গীতে গল্প আরও বেশি সরস হয়, রচনা করাও শক্ত নয়।

ঈসপের রচিত দুই একটি গল্পকে কথোপকথনের ভঙ্গীতে (Dialogue form) বিবৃতি করিয়া দেখানো যাইতেছে।

স্বাধীনতার গৌরব

বাঘ—পালাচ্ছ কেন? শোন, শোন, কোন ভয় নেই।

কুকুর—ভরসাই বা কি? বাঘ কি বৈষ্ণব হয়?

বাঘ—তোমাকে দেখেই আমার পালাবার কথা। আমাকে দেখে তুমি পালাও কেন? দেখছ না আমার শরীরের হাড় ক'খানা শুধু আছে। তুমি যদি একবার আমার ঘাড় কামড়ে ধর, তা হ'লে আমার ছাড়াবার শক্তি নেই। আমি নামেই বাঘ।

কুকুর—তোমার এ দশা কেন হ'লো?

বাঘ—আর ভাই, সে কথা ব'লো না। সারা দিনরাত আহারের সন্ধানে বনে বনে ঘুরেও পেট ভ'রে খেতে পাই না। অনেক দিনই উপোষে কাটে। আচ্ছা ভাই, তুমি এত হৃষ্টপুষ্ট ও সবল হ'লে কি ক'রে?

কুকুর—আমি পেট ভ'রে খেতে পাই, তাই এমন হয়েছি। আমি যা করি তুমিও যদি তাই কর, তা'হলে তোমার শরীরও এমনই হবে।

বাঘ—তুমি যা' আমিও তাই করতে রাজী আছি। তোমাকে কি করতে হয় বল।

কুকুর—বেশি কিছু না। রাত্রিকালে প্রভুর বাড়ীতে পাহারা দিতে হয়—চোর-ডাকাত না আসে দেখতে হয়।

বাঘ—এ-ই ত! তা আমি খুব পারব। রাত্রিতে আমি জেগেই থাকি। বনে শুধু কি খাওয়ার কষ্ট, ভাই! রোদে, বৃষ্টিতে, শীতে ও হাওয়ায় কত কষ্ট পাই। একটু আশ্রয় পেলে আর পেট ভ'রে দু'বেলা খেতে পেলে বেঁচে যাই।

কুকুর—আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে।

বাঘ—(চলিতে চলিতে) আচ্ছা ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

কুকুর—কি ? বল।

বাঘ—তোমার ঘাড়ে দাগ দেখতে পাচ্ছি, ওটা কিসের ?

কুকুর—ও কিছুই নয়। ওটা গলবন্ধনের দাগ।

বাঘ—গলবন্ধ কেন ?

কুকুর—দিনের বেলায় গলবন্ধে শিকলি দিয়ে বেঁধে রাখে কিনা।

বাঘ—(চমকাইয়া) সে কি ? শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে ? বল ক ? তবে তুমি যেখানে খুশী যেতে পাও না ?

কুকুর—তা' কেন ? দিনের বেলায় বাঁধা থাকি। রাত্রে ছেড়ে দেয়—তখন যেখানে খুশী যেতে পারি। প্রভুর চাকরেরা কত আদর করে, ভালবাসে, স্নান করায়, খাওয়ায় ; প্রভুও আদর ক'রে গায় হাত বুলিয়ে দেন।

বাঘ—তোমার সুখ তোমারই থাক—আমার অমন সুখে কাজ নেই। আমার অনাহারই ভালো—বনবাসই ভালো। বন্দী থেকে রাজভোগ ?—অমন রাজভোগে আমার কাজ নেই। না খেতে পেয়ে ম'রে যাব, সেও ভালো—একদিনের জন্যও গলায় শিকলি পরতে পারব না। ওরে বাপরে ! আমি এখনি বনে ফিরে চললাম। বিদায়।

কুকুর—তোমার মত বোকার এইরূপ দুর্দশা হওয়াই ঠিক।

(—কথামালিকা)

দুরাত্মার ছল

বাঘ—(স্বগত) আজ ত আর আহার মেলে না, দেখছি। শিকার-গুলো কি নিঃশেষ হয়ে গেল ? এই ঝরনার জল খেয়েই পেটটা ভরানো

যাক। ঝর্‌নায় ত অনেক রকম জীবজন্তু জল খেতে আসে, আজ ত একটাও দেখছি না। মুস্কিল হ'য়েছে, জয়দ্‌গব ঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়ে। বাঘ ধার্ম্মিক ও ন্যায়পরায়ণ হ'য়ে উঠলে তার প্রাণধারণ করাই কঠিন। বিনা দোষে কারো-ত প্রাণহানি করা চলে না। উপায় কি? (পাহাড়ের নীচের দিকে তাকাইয়া)—বাঃ, মোটাসোটা একটি ভেড়া যে নাচে জল খাচ্ছে।...এই কে রে

মেষ—(কাঁপিতে কাঁপিতে)—আজ্ঞে, আমি একটি ভেড়ার ছানা।

বাঘ—(স্বগত)—তাই ত, জীবটা অত্যন্ত নিরীহ। বিনা দোষে কি ক'রে ওর ঘাড় ভাঙ্গি। দোষ একটা খুঁজে বের্ কর্‌তে হয়—নইলে উপোষ কর্‌তে হবে। (তাড়াতাড়ি লাফ দিয়া নিকটে গিয়া)—তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি যে জল খাচ্চি, তাই তুই ঘোলা করছিস্। আমি কে তা জানিস্?

মেষ—আজ্ঞে, আপনি কে তা' জানি না! তবে আমি জল ত ঘোলা কর্‌ছি না। আমি নীচে জল খাচ্ছি; আপনি উপরে জল খাচ্ছিলেন। উপর হ'তে জলটা নেমে আসছে—নীচের জল ঘোলা হ'লেও উপরের জল ত ঘোলা হ'তে পারে না, হুজুর।

বাঘ—বেটা তুই ন্যায়শাস্ত্র পড়েছিস দেখছি। যুক্তি দেখাচ্ছিস আমাকে? আচ্ছা, এক বছর আগে তুই আমাকে গাল দিয়েছিলি কেন? তার কি সাজা জানিস্?

মেষ—সাজা কি তা' জানি, হুজুর। কিন্তু এক বছর আগে আমি যে জন্মাইনি হুজুর। কি ক'রে আপনাকে গাল দিলাম?

বাঘ—তা-ও ত বটে! না, তুই ন'স্ বটে, তোর বাবা! সে একই কথা। তোর বাবাকে এখন পাচ্ছি কোথা? বাপের অপরাধের দণ্ড ছেলেকেই নিতে হয় জানিস্। তার শাস্তি তুই ভোগ কর।

মেষ—(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে)—শুনুন, শুনুন, আমার একটা—।

(কথামালিকা)

[পঞ্চতন্ত্রে ও ঈসপের গল্পগুলিতে ইতর জীবজন্তুর মুখে কথা বসানো হইয়াছে। তাহাতে গল্পের অঙ্গহানি না হইয়া বরং সরসতাই বাড়িয়াছে। শিশুরাও জানে, ইতর জীবজন্তু কথা বলিতে পারে না—কিন্তু গল্পের রস-সম্ভোগের মধ্যে তাহাদের সে-কথা মনে পড়িলেও রসভঙ্গ ঘটায় না। আর যদি মনেই পড়ে—তবে তাহারা বুঝে,—প্রথমটিতে **বাঘ** একজন স্বাধীনতাপ্রিয় তেজস্বী ব্যক্তি—**কুকুর** একজন আত্মমর্য্যাদাহীন দাসত্বসুখে মগ্ন নরাধম। দ্বিতীয়টিতে **বাঘ** একজন অত্যাচারী প্রবল ব্যক্তি এবং **মেষ** নিরীহ অসহায় লোক। ছাত্রগণ এইরূপ বুঝে বলিয়াই—গল্পের নৈতিক উপদেশও ধরিতে পারে।]

অনুশীলনী—ক। নাটকীয় ভঙ্গীতে রচিত উল্লিখিত দুইটি গল্পকে পরোক্ষ ভঙ্গীতে বিবৃত কর। 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি'—এই প্রবাদ-বাক্যের দৃষ্টান্ত দিয়া একটি নাটকীয় ভঙ্গীতে গল্প লিখ।

খ। নিম্নলিখিত নীতিগুলির উদাহরণস্বরূপ এক একটি গল্প লিখ।

১। ঈশ্বর যাহা করেন—তাহা মঙ্গলের জন্য।

২। অতিলোভের দণ্ড ক্ষতি-ক্ষোভ।

অতিলোভের দণ্ড

বোধিসত্ত্ব একবার ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সে জন্মে তিনটি কন্যা জন্মে। বেশি দিন পত্নী ও কন্যাদের লইয়া সংসারসুখ ভোগ করিতে পা'ন নাই। যৌবনেই তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর তিনি সোনার হাঁস হইয়া জন্মিলেন; কিন্তু পূর্ব্বজন্মের কথা তাঁহার মনে

ছিল। তখন তিনি হিমালয়-প্রদেশের হ্রদ হইতে সমতলে গ্রামে আসিয়া পত্নী-কন্যাদের সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাদের জন্য তাঁহার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল; সন্ধান করিয়া দেখিলেন, তাহারা একটি কুটীরে বাস করে এবং পরের গৃহে দাসীবৃত্তি করিয়া অতিকষ্টে সংসার চালাইতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধিসত্ত্বের অন্তর বিগলিত হইল। তিনি ভাবিলেন—তাঁহার দেহে ত সোনার পালখ অনেক, মাসে মাসে একটি করিয়া পালখ দিলে ইহাদের দুঃখ ঘুচে।

এই সঙ্কল্প করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদের ঘরের চালের উপর বসিলেন, —মানবকণ্ঠে পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"ভদ্রে, পূর্ব্বজন্মে আমি তোমার স্বামী ছিলাম। তোমাদের দুর্দ্দশা দেখে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে— আমি একটি ক'রে সোনার পালখ দিয়ে যাব, তাই বিক্রী ক'রে তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক—কন্যাদের একে একে বিয়ে দাও।" এই বলিয়া তিনি ৮।১০ ভরি ওজনের একটি পালখ দিয়া চলিয়া গেলেন। মাসে মাসে তিনি আসিতেন, আর পালখ দিয়া যাইতেন। মেয়েরা তাঁহার গায়ে হাত বুলাইত—বোধিসত্ত্ব তাহাতে সুখবোধ করিতেন।

ব্রাহ্মণী একদিন চিন্তা করিল—এভাবে একটি একটি করিয়া পালখ লইয়া বিশেষ সুবিধা হইতেছে না। ইনিই বা কতদিন আসিবেন, তাহাই বা ঠিক কি—কিছুদিন বাদে না আসিতেও পারেন। তার চেয়ে একদিন ইহাকে ধরিয়া সব পালখগুলি ছিঁড়িয়া লইলে একদিনেই আমরা বড়লোক হইতে পারি।

ব্রাহ্মণী এ প্রস্তাব মেয়েদের জানাইল। ইহাতে মেয়েরা রাজী হইল না। তাহারা মাকে বারবার নিষেধ করিয়া বলিল—"মা, আমাদের তাড়াতাড়ি ধনী হয়ে কাজ নেই—আমাদের দুঃখ ঘুচেছে এই যথেষ্ট। বাবাকে কষ্ট দিয়ে অমন কাজ ক'রো না। পালখগুলো উপড়ে

নিলে বাবা আর উড়তে পারবেন না—তাতে তিনি মারাও যেতে পারেন !"

ব্রাহ্মণী শুনিল না— বোধিসত্ত্ব আসিবামাত্র তাঁহাকে আদর করিবার ছলে কোলে তুলিয়া হাতে করিয়া গলাটা চাপিয়া ধরিল, তারপর একে একে পালখগুলি সব উপড়াইয়া লইল। বোধিসত্ত্ব যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি যত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন,—উপড়ানো সোনার পাখাগুলো ততই সাদা হইয়া সাধারণ হাঁসের পালখ হইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব উড়িবার চেষ্টা করিলেন,—উড়িতে পারিলেন না— কুটীরেই থাকিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণী হায় হায় করিতে লাগিলেন। কন্যারা বোধিসত্ত্বকে আহারাদি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিল। কিছুদিন পরে বোধিসত্ত্বের দেহে নূতন পালখ বাহির হইল। এবার যে পালখ বাহির হইল তাহা সোনার নয় ;—সাধারণ হাঁসেরই পালখ। বোধিসত্ত্বের মায়ামুগ্ধতার ইহাই দণ্ড। তারপর একদিন তিনি আকাশে উড়িয়া চলিয়া গেলেন। কন্যারা জননীকে ধিক্কার দিতে লাগিল। ব্রাহ্মণী অতিলোভের দণ্ড লাভ করিল। (জাতক-মালিকা)

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত নীতিকথা বা প্রবাদবচনগুলি অবলম্বন করিয়া এক একটি গল্প রচনা কর :—

১। ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে। ২। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। ৩। অতি লোভে তাঁতী ডোবে। ৪। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। ৫। দুধকলা দাও যত—সাপের বিষ বাড়ে তত। ৬। অজ্ঞাত-কুলশীলস্য বাসো দেয়ঃ কস্যচিৎ। ৭। অতি দর্পে হত লঙ্কা।

পদ্যে গল্প

পদ্যেও গল্প রচিত হইয়া থাকে। **পদ্যে রচিত গল্পগুলিকে ছাত্রেরা অনায়াসে গদ্যে রূপান্তরিত করিতে পারে।**

নিম্নলিখিত কবিতা দুইটিকে গদ্য-গল্পাকারে পরিণত কর —

(১)

এক পিঁপড়ে অনেক চেষ্টাতে হায়, শেষটাতে
যবে একটি ফোঁটা জল পেল না তেষ্টাতে,
অতি অধীর হ'য়ে নদীর ঘাটে যেই গেলো,
সে যে অমনি জলের ঢেউ লেগে ভেসেই গেলো।
সেই নদীর তটেই একটা বটের গাছ ছিলো,
এক ঘুঘুপাখী সেই গাছে গান গাচ্ছিলো ;
জলে পিঁপড়ে প'ড়ে খাচ্ছে খাবি, তাই দেখে'
তা'র প্রাণ বাঁচাবার পথ কিছু আর নাই দেখে,'
দিলে একটি পাতা ঝরিয়ে সে তা'র কাছে ঘেঁসে,—
আহা বাঁচেই যদি, ঐটে ধোরেই বাঁচবে সে!
আর মনের সুখে উঠ্ল পাখী গান গেয়ে।
পরে পিঁপড়ে তাতেই উঠ্লো তাহার প্রাণ পেয়ে—
ঠিক দুদিন'পরে নদীর তীরে সেইখানে,
আছে আপন মনে মগন ঘুঘু যেই গানে,
এক ব্যাধের ছেলে শিকার খুঁজে ফিরছিলো ;—
ধনু বাম হাতে আর ডা'ন হাতে তা'র তীর ছিলো।
সেই পিঁপড়ে তখন যাচ্ছিলো সেই পথ বেয়ে ;—
চেয়ে দেখলে সে যেই ঐ পাখীরেই বধ্বে এ—

হাতে—বাগিয়ে ধনুক তাকিয়েছে যেই তাগ করে,
এসে—অমনি সে তায় কামড়ালে পায় রাগ কোরে।
তা'তে—হাত কেঁপে তীর লাগ্‌লো গিয়ে আগডালে,
আর—ব্যাপার বুঝে' পালায় পাখী ফাঁকতালে।
পাখী—মরতে গিয়েও এমনি করে যায় বেঁচে,—
আর—পিঁপড়ে মনে আহ্লাদে বেড়ায় নেচে॥ (কৃষ্ণদয়াল)

(২)

দাতার প্রধান জাফর সদাই দান করে দীনজনে,
তাহার সমান দাতা নেই আর এ ধারণা তার মনে।
একদা সহসা বুস্তানে তার সান্ধ্যভ্রমণ-কালে,
হেরে তার দাস ক্ষুধায় কাতর ব'সে আছে আলবালে।
দিবসশেষের তিনখানি রুটি প্রাপ্য আহার তার
দিল একে একে কুকুরের মুখে,—বিচিত্র ব্যবহার!
কহিল জাফর,—"ওরে ও নফর, সারাদিন উপবাসী,
দিবস-শেষের খানা তোর তাও কুকুরেই দিলি হাসি?"
চমকি' বান্দা জোড় হাতে কয়,—"মরদ হয়েছি ভবে,
আজিকে নসিবে না হয় রসদ কালি পুনরায় হ'বে।
খোদার এ জীবে আহার কে দিবে ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে তামাম জীবের সেবা!"
কহিল জাফর আঁখি ছলছল,—"আবিসিনিয়ার দাস,
আজিকে দেমাক করিলি চূর্ণ ছিড়ে দিলি মোহপাশ।
পীরের কল্‌মা মোরে দিলি তুই' দেরে কোল, বুকে আয়।
তুই দানাদার দরাজদস্ত এই দীন দুনিয়ায়।

দৌলত-খানা খুলে দেছে যেবা দাতা কই বটে তারে,
সেই ত্যাগবীর বুকের রুধির হেলায় যে দিতে পারে।
ওরে ক্রীতদাস, দিলাম খালাস—গোলামির অবসান,
এই বাগিচার মালিক হইয়া দীল খুলে কর দান।" (বল্লরী)

সনী—রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, রজনীকান্তের সদ্ভাব-কুসুম ও অন্যান্য কবির গাথাশ্রেণীর কবিতা যাহা পাঠ্যপুস্তকে পাইবে—সেগুলিকে গল্পাকারে বিবৃত কর।

ঐতিহাসিক গল্প

প্রত্যেক দেশের ইতিহাসের অধিকাংশই গল্পের ভঙ্গীতে বিবৃত করিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসকে অবলম্বন করিয়া অনেক গল্পের পুস্তক রচিত হইয়াছে। এদেশের ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়াও অনেকে ঐতিহাসিক গল্প লিখিয়াছেন। এই শ্রেণীর গল্প লিখিতে হইলে ঐতিহাসিক সত্যকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কল্পনার রস যোগ করিতে হইবে। দুই-একটির এখানে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

চাঁদ-কেদার—চাঁদ রায় ভাবিয়াছিলেন—বাঙ্গালার বারভুইঞারা সকলে মিলিয়া মোগলের সঙ্গে লড়াই করিলে বাঙ্গালাদেশকে স্বাধীন করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন—ঈসা খাঁ তাঁহার সহিত মিত্রতা রক্ষা করিল না, তখন তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "কেদার আর কেন? সকল আশা-ভরসাই ত গেল। এখন মোগলের সঙ্গে লড়্‌বে—না, পাঠানের সঙ্গে লড়বে? বাবা কোটীশ্বরের ইচ্ছা নয়, বাঙ্গালা স্বাধীন হয়।"

কেদার সদর্পে বলিলেন—"বাবা, আমি এক হাতে পাঠানের সঙ্গে যুঝ্‌ব—অন্য হাতে মোগলের সঙ্গে যুঝ্‌ব। আগে ঈসা খাঁর দণ্ডবিধান কর্‌ব,—তারপর মোগলের সঙ্গে লড়ব।"

চাঁদ রায় বলিলেন—"যা পার, কর। আমার আর উৎসাহ নেই। আমি শ্রীপুরে ফিরে চল্‌লাম।"

চাঁদ রায় শ্রীপুরে ফিরিয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন—না—কোটীশ্বরের মন্দিরে পড়িয়া থাকিলেন। কেদার রায় এদিকে ঈসা খাঁর দুই একটি দুর্গ দখল করিয়া ঈসা খাঁকেই আক্রমণ করিলেন। এমন সময় পিতার আদেশ আসিল—"এক্ষুণি চলে এস। দেবতা স্বপ্ন দিয়াছেন—যা গেছে তা ফিরবে না—ঘোর বিপদ সম্মুখে, সে দিকে মন দাও।"

কেদার বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

চাঁদ বলিলেন—"কেদার, আর বৃথা লোকক্ষয় ক'রো না—বারভুঁইঞরা যখন একত্র মিলিত হ'ল না, তখন আর মোগলের সঙ্গে লড়াই ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ো না। পাঠান সুলতানকে যেমন কর দিতে, মোগল বাদশাহকেও তেমনি কর দাও।" কেদার নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ভগ্নহৃদয়ে চাঁদ আর বেশিদিন বাঁচিলেন না—শীঘ্রই অস্তমিত হইলেন। কেদার দমিলেন না। তিনি যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

ডাহিনে মোগল, পিছনে পাঠান, মগেরা এসেছে বাঁয়।
দুটি হাত, তবু তিনেরে রুখেছে একা সে সে কেদার রায়।

পোর্ত্তুগীজদিগকে সন্দীপ অধিকারে সাহায্য করিবার জন্য মোগলের সঙ্গে ইঁহার বিবাদ বাধে। জলযুদ্ধে ইনি পোর্ত্তুগীজদের সহায়তায় মোগলবাহিনীকে হারাইয়া দেন এবং মগদের সঙ্গে সন্ধি করেন। মানসিংহ তখন স্থলপথে ইহাকে আক্রমণ করেন—কিন্তু কেদার রায়

স্থলযুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া প্রথমে দুর্গের মধ্যে থাকিয়া যান—শেষে অন্যত্র পলাইয়া যান। মানসিংহের সঙ্গে তখন কেদার রায়ের একটা সন্ধি হয়। কিন্তু সন্ধির শর্ত্ত মানিয়া চলা বাঙ্গালার বার-ভুইঞাদের স্বভাব নয়। এবার কেদার রায় কিছুদিন পরে মগদের সঙ্গে যোগ দিয়া মোগলরাজ্যের একটি থানা আক্রমণ করিলেন। মানসিংহ, এবার আর সন্ধি নয়, এবার কেদার রায়কে বন্দী করিবারই ফন্দি আঁটিলেন। যুদ্ধের আগে তিনি দূতের হাতে একটি শিকল ও একখানি অসি পাঠাইয়া দিলেন এবং চিঠিতে লিখিলেন—

কেদার দেদার ক্লেশ দিয়েছ আমায়।
শেষ কথা তোমা সিংহ শোনাইতে চায়,
অসি ও শিকল—দুইই পাঠাইনু আজ
এর মাঝে খুশী যাহা লও মহারাজ॥

অসি ও শিকল লইয়া দূত কম্পিত হস্তে কেদার রায়ের সম্মুখে ধরিল। বলা বাহুল্য, কেদার রায় অসিখানি তুলিয়া লইলেন এবং একটি শ্লোক লিখিয়া শিকলে আটিয়া ফেরৎ পাঠাইয়া দিলেন। শ্লোকের ভাবার্থ এই—

কুম্ভভেদ করে বটে গজমুণ্ডে উঠে।
পবন হ'তেও দ্রুত যায় বটে ছুটে॥
গিরি-শির'পরে তার দুর্গম আশ্রয়।
তবু সিংহ পশু ছাড়া আর কিছু নয়॥
ভেবে দেখ এ শিকল কার পায়ে সাজে।
অসি তুলে লইলাম, লেগে যাবে কাজে॥

ফলে, মোগল ও বাঙ্গালীতে ভীষণ লড়াই বাধিয়া গেল। এবার কেদার রায় আহত হইয়া বন্দী হইলেন। বন্দিদশার অবমাননা তাঁহাকে

আর সহিতে হইল না,—মরণই তাঁহাকে মুক্তি দিল। (ঐতিহাসী)

শিবাজী প্রভু ও বাজীপ্রভু—শিবাজী আফজল-খাঁকে বাঘনখী দিয়া হত্যা করিলেন—বিজাপুররাজ তাহা সহিয়া রহিলেন না। আফজলের পুত্র ফজল, সলাবং খাঁ ও হাবশী বীর জোহর তিন জনে বিশাল সেনা লইয়া শিবাজীকে আক্রমণ করিলেন। শিবাজী তখন পবন-দুর্গে। ফজলের সেনা পাহাড়ের চূড়া হইতে দুর্গের উপর তোপ দাগিতে লাগিল। শিবাজী পবন-দুর্গে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না,—বিশালগড়ে পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। সুড়ঙ্গপথে বাহির হইলেও বিজাপুরী সেনা ভেদ করিয়া যাইতে হয়। শিবাজী কৌশলে একজন বিজাপুরী সেনানায়ককে বশীভূত করিয়া পাঁচ শত অনুচর সহ পার্ব্বত্য পথ দিয়া পলায়ন করিলেন। ফজল সংবাদ পাইয়া শিবাজীকে ধরিবার জন্য বহু সেনা পাঠাইলেন। গজপুর নামক স্থানে যখন পৌছিলেন, তখন শিবাজী ও তাঁহার অনুচরগণের অশ্বগুলি ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এদিকে বিজাপুরী সেনাও নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। এই গজপুরে শিবাজীর অনুগত ভক্ত সামন্ত বাজীপ্রভুর বাস। বাজীপ্রভু একটি ক্ষুদ্র জমিদার মাত্র।

এই গজপুরের গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়াই বিজাপুরী সেনাকে যাইতে হইবে। বাজীপ্রভু শিবাজীপ্রভুকে বাঁচাইবার জন্য আপনার অনুচর-গণকে লইয়া এই সঙ্কটের সময় ঐ গিরি-সঙ্কটের মুখ আটকাইলেন।

বৃথাই করিল ফজল মারাঠা কেল্লা ফতে,
বিজাপুরী সেনা বৃথাই বিশাল এ গিরিপথে।
দুই দুই জন যেমন আগায় মরে গজপুরী বর্শার ঘায়,
দুর্গম পথ আরো দুর্গম আহতে হতে,
দশসহস্র রোধিল কেবল পঞ্চশতে।

বাজীপ্রভুর সেনা মাত্র পাঁচশত ছিল। এই পঞ্চশতের তিনশত গিয়াছে—দুইশত বাকি। বাজীপ্রভু বক্ষে দারুণ আঘাত পাইলেন—হাতে করিয়া বুকের ক্ষত চাপিয়া তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার মৃত্যু আসন্ন, চোখে বিশ্বজগৎ ঝাপসা হইয়া আসিতেছে। তাঁহার সমস্ত শক্তি তখন কর্ণে কেন্দ্রীভূত। শিবাজী বিশালগড়ে পৌঁছিয়া তোপ দাগিলেন—সেই শব্দ শুনিয়াই তিনি বুঝিলেন—শিবাজী নিরাপদ হইয়াছেন। বাজীপ্রভু অনুচরগণকে বলিলেন, "আমার চিরবিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। আমার পতনের পরও তোমরা যুঝ্‌বে। যতক্ষণ না তোপের শব্দ শুন্‌তে পাও, শত্রুকে পথ দিও না।"

তখন বেলা দ্বিপ্রহর, তোপের শব্দ শোনা গেল। বিজয়ানন্দে বাজীপ্রভু অনুচরগণকে পলাইবার সঙ্কেত করিয়া বক্ষের ক্ষত মুক্ত করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বীরদেহ লুটাইয়া পড়িল। গিরিসঙ্কটে জলপ্রপাতের মত বিজাপুরী সেনা তাঁহার দেহ বিদলিত করিয়া ছুটিল।

অনুশীলনী

ইতিহাসের সাহায্যে নিম্নলিখিত গল্পগুলি লিখ—

১। উদয়ন-বাসবদত্তা। ২। চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্য-শকটার-রাক্ষস। ৩। অশোক-কুণাল-তিষ্যরক্ষিতা। হর্ষবর্দ্ধন-রাজ্যশ্রী। ৫। ভীম-দিব্যক-রামপাল। ৬। জয়চন্দ্র-সংযুক্তা-পৃথ্বীরাজ। ৭। আলাউদ্দিন-রতনসিংহ-পদ্মিনী-গোরা-বাদল। ৮। রাখাল বাপ্পারাওএর রাজপদ লাভ। ৯। রাণা লক্ষ-মুকুল-চণ্ড। ১০। রাণা কুম্ভ-মীরাবাঈ। ১১। নাসিরুদ্দিনের মহানুভবতা। ১২। বগরা—খাঁ ও কায়কোবাদ। ১৩। বাবরের আত্মোৎসর্গ। ১৪। হুমায়ুন-বাহাদুরশাহ-কর্ণাবতী-

চিতোর। ১৫। রাণী দুর্গাবতী। ১৬। চাঁদবিবি। ১৭। রাণা প্রতাপ মানসিংহ-শক্তসিংহ অমরসিংহ। ১৮। শাহজাহানের শেষ দশা। ১৯। শিবাজী-রামদাস স্বামী। ২০। অহল্যাবাঈ।

নিম্নলিখিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী সম্বন্ধে কোন গল্প জানা থাকিলে লিখ ঃ—

১। বুদ্ধদেব। ২। বিম্বিসার। ৩। অশোক। ৪। বিক্রমাদিত্য। ৫। শ্রীচৈতন্যদেব। ৬। ঈসা খাঁ। ৭। প্রতাপাদিত্য। ৮। মীরকাসেম। ৮। নন্দকুমার। ১০। রাণী ভবানী। ১১। লালবাবু। ১২। বিদ্যাসাগর।

হাসির গল্প

(১)

ইংলণ্ডের পল্লীগ্রামের একজন জমিদারপুত্র প্যারিসে বিদ্যাশিক্ষার জন্য ছাত্রাবাসে বাস করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে যুবকটি ঘরে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন, এমন সময় বাড়ীর একজন চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে সহসা সেখানে দেখিয়া যুবকটি বলিয়া উঠিলেন—

তুমি এখানে কেন? কি খবর?

চাকর—খবর আছে বল্‌ছি। পোষা বিড়ালটা ম'রে গেছে।

যুবক—বিড়ালটা মরে গেছে! এ-ত ভারি! কিসে মর্‌ল?

চাকর—বদহজম হ'য়ে মারা গেছে, অতিরিক্ত মাংস খেয়ে!

যুবক—অতিরিক্ত মাংস কোথায় পেলে ?

চাকর—ছোড়া দুটোয় মাংস,—ঘোড়া দুটোও মরেছে কিনা।

যুবক—আঁ! আমাদের ঘোড়া দুটো তবে মারা গেছে? কি ক'রে দুটো ঘোড়াই একসঙ্গে মরল।

চাকর—যে খাটুনি মরবে না? সারাদিন জল বইতে হ'ল কিনা। সকালবেলায় আস্তাবলে গিয়ে দেখা গেল—দুটোই ম'রে পড়ে আছে! আর বেড়ালটা আর দুটো কুকুরে তাদের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। খেটে খেটে হয়রান হ'য়ে ঘোড়া দুটো ম'রে গেছে।

যুবক—জল বইতে হ'ই কেন? এত জলের কি প্রয়োজন হয়েছিল?

চাকর—কেন আগুন নিভানোর জন্য। আপনার বাড়ীর খানিকটা যে পুড়ে গেছে—অনেক চেষ্টায় আগুন নিভানো গেল, নইলে গোটা বাড়ীটাই পুড়ে যেত।

যুবক—সেকি! হঠাৎ আগুন লাগ্‌ল কেন?

চাকর—দাসীদের দোষে। যত অপদার্থ লোককে দাসদাসী রাখবেন—বাতিগুলো নিভাতেই ভুলে গেল। তা' হ'তেই আগুন লেগেছিল;

যুবক—বাতি আবার কি জন্য?

চাকর—বাতি—বাতি কর্ত্তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে—

যুবক—এঃ, বল কি, বাবা তবে মারা গেছেন?

যুবকটি কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন—চাকরটিকে বলিলেন—"একথা তুমি আগেই বল্‌লে না কেন?"

চাকর—আজ্ঞে—আজ্ঞে—আপনার মা ব'লে দিয়েছিলেন—হঠাৎ গিয়েই খবরটা দিও না, আস্তে আস্তে সন্তর্পণে সইয়ে সইয়ে খবর দেবে। তাই এসেই সংবাদটা দিই নি। (ইংরাজী হইতে)

(২)

একজন জমিদার একজন উকিলের কাছে প্রায়ই কোন-না-কোন দ্রব্য উপহার পাঠাইতেন। উহা বহন করিয়া লইয়া যাইত গোবিন্দ নামে একটি ভৃত্য। গোবিন্দ সজ্জাতের ছেলে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, কিছু লেখাপড়াও করিয়াছিল, কিন্তু অবস্থা অত্যন্ত মন্দ বলিয়া জমিদারের বাড়ীতে চাকরি লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

গোবিন্দ উকিল বাবুর বাড়ীতে কতবার কত জিনিস উপহার লইয়া আসিয়াছে, উকিলবাবু কখনও একটি পয়সাও বকশিশ্ দেন নাই। গোবিন্দ উকিলবাবুটির উপর বড় সন্তুষ্ট ছিল না।

সে-বার পূজার সময় একটি বড় মাছ লইয়া গোবিন্দ উকিলবাবুর বাড়ীতে আসিল। ঘরে ঢুকিয়াই মেঝের উপর মাছটি ধপাস করিয়া ফেলিয়াই গোবিন্দ বিনা ভূমিকায় বলিয়া উঠিল, "এই নিন, হুজুর এই মাছটি পাঠিয়েছেন।"

উকিলবাবু চেয়ারে বসিয়াছিলেন। তিনি মাছটা পাইয়া খুব খুশী হইলেন, কিন্তু গোবিন্দের বে-আদবিতে বড় বিরক্ত হইলেন।

উকিলবাবু বলিলেন—"দেখ গোবিন্দ, তুমি বড়লোকের বাড়ীতে এত দিন চাকরী করছ—কিন্তু কিছুমাত্র আদব-কায়দা শিখলে না! জান, তোমার হুজুর আমার বন্ধু? তোমার কি আমার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলা উচিত?

গোবিন্দ—আজ্ঞে, আমার কসুর হ'য়েছে। আমরা মুখ্যু লোক—কেমন ক'রে কথা বল্‌তে হয় জানি না।

উকিল—আচ্ছা, জান না, শিখিয়ে দিচ্ছি। এস দেখি এই চেয়ারখানায় বসো দেখি।

গোবিন্দ—কি বলেন, হুজুর, আমি চেয়ারে বস্‌ব কি করে ?

উকিল—না, তুমি একবার বসো, সঙ্কোচ ক'রো না! দেখ, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।

এই বলিয়া উকিল বাবু জোর করিয়া গোবিন্দকে চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। তারপর মাছটি বাহিরে লইয়া গিয়া উহা হাতে করিয়া অতি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন—তারপর আস্তে আস্তে মাছটিকে রাখিয়া বলিলেন—"সেলাম হুজুর, রাজা সাহেব হুজুরকে তাঁর নমস্কার জানিয়ে এই সামান্য মাছটি উপহার পাঠিয়েছেন। দয়া ক'রে হুজুর এটা গ্রহণ করুন। হুজুরের স্বাস্থ্য কেমন আছে—রাজা সাহেব তা' জান্‌তে চেয়েছেন। আর—"

গোবিন্দ—তাই নাকি ? বেশ বেশ। চমৎকার মাছটি ত! রাজা সাহেবকে বল্‌বে, আমি ভাল আছি, মাছটা পেয়ে খুব খুশী হ'লাম—আমার ধন্যবাদ ও নমস্কার তাঁকে জানাবে। (মুহুরীর দিকে ফিরিয়া) ওহে একে দুইটা টাকা বক্‌শিশ্ দাও ত। আর বাড়ীর ভিতর হ'তে কিছু জলখাবার আনিয়ে দাও দেখি।

উকিলবাবু প্রথমটা গোবিন্দের কথায় অবাক্ হইয়া গেলেন। এদিকে গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়াছে। উকিলবাবু নদীয়া জেলার রসিক লোক, হাত ধরিয়া গোবিন্দকে উঠাইয়া বলিলেন—

"গোবিন্দ, তোমাকে আমি আদব-কায়দা শেখাতে গেলাম—তুমিই আমাকে আমার কর্ত্তব্য শিখিয়ে দিলে। সত্যই গোবিন্দ, তোমাকে কখনও কিছু দেওয়া হয় নি—বড় অন্যায় হয়েছে।"

এই বলিয়া গোবিন্দকে উকিলবাবু সেদিন পাঁচ টাকা বকশিশ্ দিয়া বাকি-বকেয়া শোধ করিলেন। গোবিন্দ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল!

(ইংরাজি হইতে)

অনুশীলনী

হাসির গল্প রচনা সোজা নয়। হাসির গল্পের বিষয়বস্তু মাথা হইতে বাহির করাই কঠিন। একই হাসির গল্প নানা দেশে নানা ভাষায় চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একই গল্প হিন্দীতে যাহা বীরবলের নামে চলে, তাহাই বাঙ্গালায় গোপাল ভাঁড়ের নামে চলে। হাসির গল্পের মূলসূত্রটি ধরাইয়া দিলে তাকে রসান দিয়া লেখা কঠিন নয়।

১। ১ম খণ্ডে অনুবাদের অনুশীলনীতে সঙ্কলিত 'বিচারকের দাড়ি পোড়ানো'র ইংরাজি অনুচ্ছেদটি পড়িয়া গল্পে পরিণত কর।

২। মূর্খকে কাজের ভার দিলে কিরূপ জব্দ হইতে হয়—তাহা লইয়া অনেক হাসির গল্প আছে। এক চাষী বিনা মজুরিতে পাঁচজন বোকা লোককে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ভার দিয়া বিদেশে গিয়াছিল—তাহারা কি ভাবে চাষীর সর্ব্বনাশ করিয়াছিল—নিজের মাথা হইতে বাহির করিয়া লিখ।

৩। ধূর্ত্ত চাকর প্রত্যহ পেঁপের ডাঁটের নলের সাহায্যে সর ফুটাইয়া দুধ খাইত—মনিব কুইনিন-গোলা খড়ি-জল কড়াইয়ে রাখিয়া দিয়া কেমন করিয়া চোর ধরিল তাহা লইয়া হাসির গল্প লিখ।

৪। অহঙ্কারী ধূর্ত্ত নাপিতকে এক কাঠুরিয়া গাধা কামাইতে বাধ্য করিয়া কেমন জব্দ করিয়াছিল—তাহা গল্পাকারে প্রকাশ কর।

৫। লাঙ্গুলহীন শৃগাল, দাঁড়কাক ও ময়ূরপুচ্ছ, কাক ও শৃগালের গল্প কৌতুকাবহ ভঙ্গীতে বিবৃত কর।

৬। শৃগাল সারসকে নিমন্ত্রণ করিয়া থালার ঝোল ঢালিয়া খাইতে দিয়া রসিকতা করিল—সারস তাহার প্রতিশোধ দিল গলাসরু পাত্রে শৃগালকে খাইতে দিয়া; এই গল্পটি সরস করিয়া প্রকাশ কর।

৭। আকবর বীরবলকে বোকা লোকদের ফর্দ্দ করিতে বলিলেন। বীরবল ১৫ দিন পরে ফর্দ্দ দাখিল করিল। তাহাতে আকবরের নাম সর্ব্বপ্রথমে। বাদশাহ চটিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বীরবল বলিল—"এলাকার বাহিরের লোককে ঘোড়ার জন্য লাখ টাকা দাদন যে দেয় সে কি?" বাদশাহ্ বলিলেন; "মূর্খ, দেখো তারা ফাঁকি দেবে না।" বীরবল বলিল—"তখন জাহাঁপনার নাম কাটিয়া পারস্যদেশের বোকা সওদাগরের নাম লিখিব।" ইহা লইয়া হাসির গল্প লিখ।

পৌরাণিক গল্প

রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পগুলি ছাত্রগণ প্রায়ই শোনে। সেগুলিকে নিজের ভাষায় কি ভাবে বিবৃত করিতে হইবে তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হইল। এই গল্পটি **ভক্তমাল** হইতে গৃহীত।

হরিভক্ত 'হরিজন'

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইল—মহারাজ যুধিষ্ঠির সমাপ্তিসূচক শঙ্খঘণ্টা বাজানোর জন্য আদেশ দিলেন ভীমসেনকে। ভীমসেন প্রাণপণ বলে ঘণ্টা নাড়িলেন—ভীমের ঘণ্টা-নাড়া কিরূপ তাহা আর বুঝাইতে হইবে না—কিন্তু ঘণ্টা বাজিল না। ভীম প্রাণপণ বলে শাঁখেই ফুঁ দিতে লাগিলেন, শাঁখ বাজিল না। মহারাজ যুধিষ্ঠির তখন ক্ষুণ্ণমনে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—যদুপতি, একি হলো? শাঁখঘণ্টা বাজে না যে?

শ্রীকৃষ্ণ—যজ্ঞ ত পরিপূর্ণ হলো না। বাকি থেকে গেছে মহারাজ। বহুলোক এতদিন ধ'রে ভোজন করেছে—কিন্তু একজন প্রকৃত বৈষ্ণবও আপনার অন্ন গ্রহণ করেন নি। সেজন্য যজ্ঞ অপূর্ণ।

যুধিষ্ঠির—এত লোক এত দিন ধ'রে খেয়ে গেল, তার মধ্যে কি কেউ প্রকৃত বৈষ্ণব ছিল না? বল কি, কেশব?

শ্রীকৃষ্ণ—নামে বৈষ্ণব অনেকেই ছিল, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব কেউ না। প্রকৃত বৈষ্ণব কি যজ্ঞান্ন ভক্ষণ করতে আসে? সে মাধুকরী ক'রে খায়—নিজের শ্রমার্জ্জিত শাকান্ন খায়—কিন্তু কারও বাড়ী পাত পাত্‌তে যায় না।

যুধিষ্ঠির—বৈষ্ণব কেউ খায়নি বল্‌ছ,—কিন্তু স্বয়ং তুমিই ত আমার গৃহে আছ,—তবে আবার ভক্তের প্রয়োজন কি?

শ্রীকৃষ্ণ—মহারাজ, তুমি কি আমার ভক্তকে আমার চেয়ে ছোট মনে কর? তুমি যদি এত লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ না খাইয়ে একজন মাত্র ভক্তকে খাওয়াতে, তাহ'লে সমান ফলই পেতে—বরং বেশিই পেতে। তোমার শাঁখ-ঘণ্টা আপনা হ'তেই বেজে উঠত।

যুধিষ্ঠির—কি উপায়, যদুপতি? কোথায় তেমন বৈষ্ণব পাই? তার সন্ধান দাও—এখনি তাকে আনহি।

শ্রীকৃষ্ণ—তোমার এই নগরীর এক প্রান্তে **বাল্মীকি** নামে এক মুচি আছে—তার চেয়ে পরম ভক্ত কাছাকাছি আর কাউকে দেখি না। সে অতি দরিদ্র, জুতো মেরামত করে। বৈষ্ণবের সাজসজ্জা, ভেখ-ভঙ্গী কিছুই তার নেই। সে গরীব গৃহস্থ মাত্র। বাইরে কিছুই বোঝবার যো নেই। আর পাঁচজন মুচিও যেমন সেও তেমনি। পাঁকের মধ্যে পদ্মের মতন তার হৃদয়টি বিকসিত। তাতে সারা দিনরাত লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করেন। তুমি তাকে নিয়ে এসে তার সেবা কর।

আমার নাম যেন করো না,—তা' হলে সে আমার উপর বড় অভিমান করবে।

মহারাজ তৎক্ষণাৎ ভীমার্জ্জুনকে পাঠাইলেন—তাহাকে আনিবার জন্য। ভীমার্জ্জুন বহু সন্ধানে বাল্মীকির দেখা পাইলেন—দুই ভাই বাল্মীকির পায়ে প্রণিপাত করিয়া নিবেদন জানাইলেন,—বাল্মীকি একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। সে বেচারী কাঁদিয়া ধূলোয় লুটোপুটি করিয়া বলিল—

মুই নীচ মুচি প্রভু জোড় হাতে কই।
রাজদ্বারে যাইবার যোগ্য কভু নই॥

ভীমসেন কাকুতি-মিনতি শুনিবার পাত্র নহেন; একেবারে বাল্মীকিকে কাঁধে তুলিয়া রাজপুরীতে হাজির হইয়া একেবারে সিংহাসনের উপর বসাইলেন। বেচারা ভয়েই আধমরা।

বাল্মীকির আগমনে রাজপুরীতে মহামহোৎসব সুরু হইল—নানা বাদ্য মুখরিত হইল। দধিহরিদ্রার জল ছড়ানো হইল—বন্দিগণ বৈষ্ণব স্তব আরম্ভ করিল—নূতন করিয়া রাজপ্রাসাদের উপর ধ্বজা তোলা হইল।

দ্রৌপদী নিজ হাতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রন্ধন করিলেন; বহুবিধ গব্য ও মিষ্টান্ন পদার্থে সোনার থালাটি সাজাইয়া তিনি রাজার নিজস্ব ভোজন-গৃহে বাল্মীকিকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। বাল্মীকি কাঁদিতে লাগিল,—বলিল—

"লজ্জায় ভয়ে আমার প্রাণপুরুষ মৃতপ্রায়। মহারাজ, আমাকে ঐ উঠানের এককোণে কলার পাতায় ক'রে এক মুঠো যা' হয় দিন, খেয়ে যাই। গরীবকে প্রাণে মারবেন না মহারাজ, আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে।"

মহারাজ যুধিষ্ঠির আস্তে আস্তে বাল্মীকির মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন, নিজের উত্তরীয় দিয়া তাহার গায়ের মালিন্য দূর করিয়া দিলেন, নানাবিধ প্রবোধ-বচনে আশ্বস্ত করিলেন, অনেক বুঝাইয়া আসনে বসাইলেন এবং নিজ হস্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

বাল্মীকি ভোজ্যদ্রব্যের আয়োজন দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল—কি খাইল, তাহার স্বাদ অনুভব করিতেই পারিল না। ভোজন সমাপ্ত হইলে যুধিষ্ঠির আবার শঙ্খঘণ্টাবাদনের আদেশ দিলেন। ভীমসেন আবার ঘণ্টা নাড়িতে ও শাঁখে ফুঁ দিতে লাগিলেন—শঙ্খঘণ্টা তবু বাজে না।

যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—"মাধব একি? শাঁখঘণ্টা বাজে না যে! কোন' ত্রুটী হলো নাকি? কিসে অঙ্গহানি হলো?"

শ্রীকৃষ্ণ—অঙ্গহানি হ'য়েছে, মহারাজ। দ্রৌপদী ভেবেছিলেন—একজন সাধুসন্ন্যাসীকে বুঝি খাওয়ানো হ'বে। তাঁর ঠাঁয়ে একজন মুচিকে দেখে তাঁর মনে অবজ্ঞা জন্মেছে,—তাই এখনো যজ্ঞ পূর্ণ হ'লো না।"

মহারাজ দ্রৌপদীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। দ্রৌপদী লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাল্মীকির চরণ বন্দনা করিলেন। দ্রৌপদী যেমন ভক্তিভরে বাল্মীকির চরণস্পর্শ করিলেন, অমনি রাজপুরীর সমস্ত শঙ্খ, সমস্ত ঘণ্টা আপনা হইতে এককালে একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ শেষে একজন হরিভক্ত মুচির পাদস্পর্শে পূর্ণাঙ্গ হইল।

চিত্র হইতে গল্প

নিম্নমুদ্রিত ছবিগুলি দেখিয়া এক-একটি গল্প রচনা কর :—

(১)

(২)

(৩)

(৪)
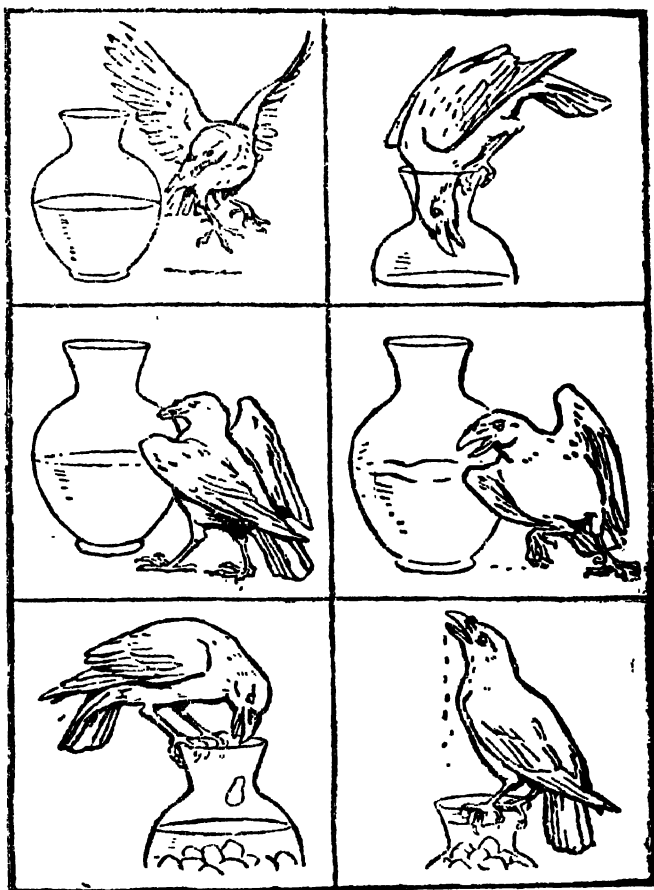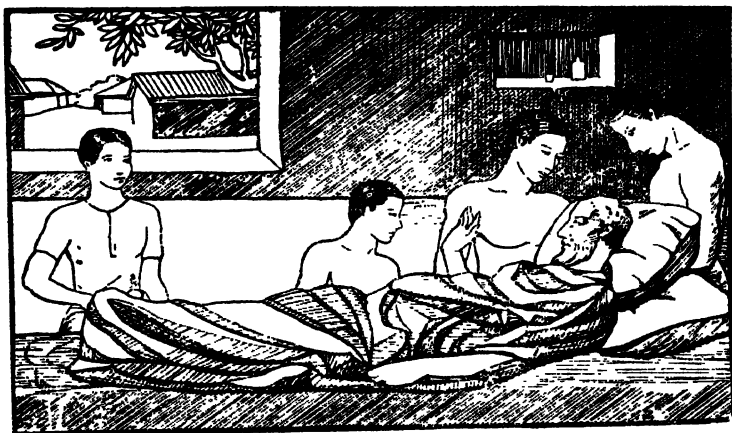
গল্পের অনুশীলনী

কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত অবলম্বনে নিম্নলিখিত গল্পগুলি লিখ :—

১। বাল্মীকির কবিত্বলাভ। ২। সগরবংশ-ধ্বংস ও ভগীরথের গঙ্গানয়ন। ৩। হরধনুর্ভঙ্গ। ৪। রাম ও ভরতের মিলন। ৫। বালিবধ। ৬। মেঘনাদবধ। ৭। সীতার বনবাস। ৮ সীতার পাতাল-প্রবেশ। ৯। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্ব। ১০। বৃত্রাসুরবধ।

১১। শ্রীবৎস চিন্তা। ১২। নলদময়ন্তী। ১৩। সাবিত্রী-উপাখ্যান। ১৪। ঘোষযাত্রা। ১৫। উত্তর-গোগৃহ। ১৬। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

নিম্নলিখিত কাঠামোগুলি লইয়া এক একটি গল্প খাড়া কর :—

১। **শৃগাল ও ঈগল**—গাছের উপর ঈগলের বাস—নীচে গর্ত্তে থাকে শৃগালী। দু'জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব। শৃগালী দূরে গেলে ঈগল তাহার ছানা চুরি করিয়া বাসায় রাখিয়া দিল। তারপর শৃগালী কি করিয়া ছানা আদায় করিল,—নিজের বুদ্ধিতে ঠিক করিয়া গল্পটি লিখ।

২। **শৃগাল ও ছাগল**—শৃগাল ছাগলকে বলিল—"দাড়িট' তোর যত বড়, তার অর্দ্ধেক বুদ্ধিও তোর থাক্‌লে আমার কথায় গর্ত্তে পড়্‌তিস্ না।" ইহা যে গল্পের শেষ কথা, সেই গল্পটি লিখ।

৩। **ভারবাহী ষণ্ড**—এক ব্যবসায়ী একটি ষাঁড়ের পিঠে লবণ চাপাইয়া বাড়ী আসিতেছিল—ষাঁড়টি পথে এক নালায় পড়িয়া গেল, তাহাতে তাহার লবণের ভার কমিয়া গেল—পরদিন আবার লবণ........ ইত্যাদি—গল্পটি সম্পূর্ণাঙ্গ কর।

৪। **ঘোড়ার সোজা**—একটি লোক একটি গাধা ও একটি ঘোড়া লইয়া আসিতেছিল—গাধার পিঠে ছিল অত্যন্ত ভারী বোঝাই, ঘোড়ার পিঠ খালি। গাধা ঘোড়াকে বলিল—"ভাই, তুমি যদি ভারের সামান্য অংশ লও তবে.......।" গল্পটিকে সম্পূর্ণ কর।

৫। **শৃগাল ও কাক**—মাংসখণ্ড লইয়া কাক গাছের ডালে বসিয়া আছে। শৃগাল কি কৌশলে তাহা আয়ত্ত করিল দেখাইয়া গল্প লিখ।

৬। **শৃগাল ও পশুরাজ**—পশুরাজ দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ—পীড়িত বলিয়া রটিল। একে একে অনেকে দেখিতে গেল। শৃগাল আপ্যায়ন জানাইল, কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল—শৃগালের শেষ কথা,—"গুহা হইতে বাহিরে আসিবার পদচিহ্ন একটিও দেখি না কেন?" ইহাকে কথোপকথনে লিখ।

৭। **ক্ষুদ্রের প্রতিদান**—সিংহ ইঁদুরকে প্রাণভিক্ষা দিল—ইঁদুর ঋণ পরিশোধ করিল—ইহা লইয়া একটি গল্প রচনা কর।

৮। **সাধুতার পুরস্কার ও অসাধুতার দণ্ড**—কাঠুরিয়া নদীর ধারে গাছ কাটিতেছিল—কুঠার জলে পড়িয়া গেল। জলদেবতা সোনার ও রূপার কুঠার দেখাইলেন। কাঠুরিয়া লইল না—লোহার কুঠারখানিই লইল এবং সোনার কুঠার ও রূপার কুঠার পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিল। একজন ধূর্ত্তলোক ইহা শুনিয়া ঐ নদীর ধারে গাছ কাটিতে গিয়া ইচ্ছা করিয়া কুঠার জলে ফেলিয়া দিল। জলদেবতা সোনার কুঠার দেখাইবা মাত্র সংগ্রহে ধরিতে গেল। ফলে, নিজের কুঠারখানিও হারাইল। গল্পাকারে বিস্তৃতভাবে লিখ।

৯। **কায়াসিংহ ও ছায়াসিংহ**—সিংহ নির্ব্বিচারে পশুবধ করে—বনের সকলে মিলিয়া স্থির করিল, প্রত্যহ একটি করিয়া পশু তাহার জন্য প্রেরিত হইবে। শশকের পালা আসিল। শশক দেরী করিয়া উপস্থিত হইয়া কুপিত সিংহকে বলিল, পথে অন্য সিংহ ধরিয়াছিল, সেজন্য বিলম্ব। সিংহ অন্য সিংহ কোথায় আছে জানিতে চাহিল। শশক কূপের কাছে লইয়া গিয়া প্রতিবিম্ব দেখাইল। সিংহ প্রতিদ্বন্দ্বীর বধের জন্য কূপে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ হারাইল। ইহাকে গল্পাকারে পরিবর্দ্ধিত কর।

১০। **বক-কুলীরক কথা**—বক রটাইয়া দিল, পুকুরের সব মাছ জেলেরা ধরিয়া লইবে—নিজেও সেজন্য উদ্বিগ্ন। মাছেরা বকের শরণাপন্ন হইল। বক এক-একটি করিয়া মাছ লইয়া অন্য পুকুরের দিকে গেল—কিন্তু পথেই খাইয়া ফেলিল। শেষে কাঁকড়াকে অন্য জলাশয়ে লইয়া যাইতে গিয়া ছিন্নকণ্ঠ হইল। ইহাকে গল্পাকারে লিখ।

১১। **আসল দোস্তি ও নকল দোস্তি**—মৃগ ও কাকের মধ্যে বন্ধুত্ব। মৃগ একটি শৃগালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিল। শৃগাল মৃগের মাংসের

লোভে তাহাকে শস্যক্ষেত্রে লইয়া গেল। সেখানে সে জালে আবদ্ধ হইল। কাকের কৌশলে মৃগ বাঁচিল—শৃগাল মরিল। ইহাকে গল্পাকারে লিখ।

১২। **হঠকারিতার পরিণাম**—ব্রাহ্মণী শিশুসন্তানের ভার ব্রাহ্মণের উপর দিয়া স্নানে গেল। ইতিমধ্যে রাজবাড়ী হইতে ব্রাহ্মণের ডাক পড়িল। পোষা বেজিকে ছেলের শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল; ফিরিয়া আসিয়া দেখে, বেজির সর্ব্বাঙ্গে রক্ত। বেজি ছেলের অনিষ্ট করিয়াছে ভাবিয়া ব্রাহ্মণ বেজিকে মারিয়া ফেলিল—ঘরে ঢুকিয়া দেখে ছেলে ঘুমাইতেছে—একটা প্রকাণ্ড সাপ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া পড়িয়া আছে। ইহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া গল্প রচনা কর।

১৩। **অর্দ্ধেক প্রাপ্য**—জেলে মস্ত একটা মাছ লইয়া জমিদার বাড়ীতে ঢুকিতেছে। দ্বারোয়ান বলিল—যাহা পাইবে তাহার অর্দ্ধেক না দিলে ঢুকিতে দিব না। জেলে দ্বারোয়ানকে দণ্ড দেওয়ার জন্য ৫০ বেত পুরস্কার চাহিল। এই সূত্রগুলিকে গল্পে পরিণত কর।

১৪। **স্বর্ণমরীচিকা**—মাইদাসের অত্যন্ত স্বর্ণ-লোভ, রাশিরাশি সোনা জড়ো করিয়াও তাহার তৃপ্তি নাই। দেবদূত তাহার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য দেখা দিয়া বর দিতে চাহিল। মাইদাস বর লইল—যাহা কিছু ছুঁইবে, সব যেন সোনা হয়। মাইদাসের মুখের স্পর্শে খাদ্যপানীয় সোনা হইয়া গেল—একমাত্র কন্যাও কোলে আসিয়া সোনা হইল। মাইদাস হায় হায় করিতে লাগিল। দেবদূতের দয়ায় শেষে 'বরের' দণ্ড হইতে রক্ষা পাইল। এই কথাগুলিকে গল্পে লিখ।

১৫। **ছোট দস্যু ও বড় দস্যু**—আলেকজান্দার এক দুর্দ্দান্ত দস্যুকে দেশের শত্রু বলিয়া শাসন করিতেছে। দস্যু বুঝাইতেছে—আলেকজান্দার স্বয়ং সমস্ত পৃথিবীর মহাশত্রু। এই ব্যাপারটিকে বাদানুবাদের ভঙ্গীতে গল্পাকারে প্রকাশ কর।

১৬। **পশুরাজের উদারতা**—একজন পলাতক রোমক দাস গুহায় বাসকালে একটি সিংহের পায়ের কাঁটা তুলিয়া দিয়াছিল। পরে ঐ সিংহ রোমে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিল। ক্রীতদাস ধরা পড়িয়া ঐ সিংহের মুখে অর্পিত হইল; সিংহ উপকারককে চিনিয়া গাত্রলেহন করিয়া ভালবাসা জানাইল। দর্শকগণ অবাক্, দাস মুক্তি পাইল। ইহাকে গল্পাকারে পরিণত কর।

১৭। **হাঁড়ির গল্প**—দরিদ্র ব্রাহ্মণ মনের দুঃখে বনের ভিতর মরিতে গিয়া শিবের অনুগ্রহে একটি হাঁড়ি পাইল—তাহা উল্টাইলেই মুড়কি ঝরে। পথে এক মুদি হাঁড়িটি ফাঁকি দিয়া লইল। ব্রাহ্মণ বনে ফিরিয়া আর একটি হাঁড়ি পাইল যাহা ঝাড়িলে দৈত্য বাহির হয়। দৈত্য-হাঁড়ির সাহায্যে মুড়কি-হাঁড়ির উদ্ধার হইল—ব্রাহ্মণের দুঃখ ঘুচিল, কিন্তু মুড়কি-হাঁড়ি ছেলেরা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ এবার বনে গিয়া সন্দেশ-হাঁড়ি পাইল। তখন সে সন্দেশের ব্যবসা করিয়া ধনী হইল। জমিদার সন্দেশ-হাঁড়ি কাড়িয়া লইল—দৈত্য হাঁড়ির সাহায্যে ব্রাহ্মণ ঐ হাঁড়ির উদ্ধার করিল। এই কাঠামোটিকে গল্পে পরিণত কর।

১৮। **দরবেশের দূরদৃষ্টি**—এক দরবেশ একটি পথহারা উটকে না দেখিয়াই বলিল, তাহার এক পা খোঁড়া, এক চোখ কাণা, উপরের পাটীতে একটিও দাঁত নাই এবং পিঠে মধু ও গম বোঝাই ছিল। কি করিয়া বলিতে পারিল, নিজের বুদ্ধিতে ঠিক করিয়া একটি গল্প লিখ।

১৯। **প্রহেলিকা-সমাধান**—বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেবের সভায় দিল্লীর বাদশাহ সম্পূর্ণ একই আকারের ও একই রকম গড়নের তিনটি মূর্তি পাঠাইয়া জানিতে চাহেন—কোন্‌টির কি বৈশিষ্ট্য। কেহই তফাৎ ধরিতে পারিল না। মন্ত্রী আপ্পাজী মূর্তিগুলির এক কাণ দিয়া লোহার তার চালাইয়া বৈশিষ্ট্য ধরিয়া ফেলিলেন। ১মটিতে 'তার' অন্য

কাণ দিয়া বাহির হইল. ২য়টিতে মুখ দিয়া বাহির হইল—৩য়টিতে তার কোন দিক দিয়াই বাহির হইল না। ইহার দ্বারা কি বুঝিলে? মর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া গল্পটি লিখিয়া ফেল।

২০। **প্রকৃত মহত্ত্ব**—তিন পুত্রের মধ্যে সব চেয়ে মহত্ত্বের কাজ যে করিবে সে একটি মণি উপহার পাইবে। প্রথম পুত্র বলিল—বিনা রসিদে বিনা সাক্ষ্যে আমার কাছে একজন হাজার মোহর রাখিতে দিয়াছিল—আমি চাহিবামাত্র ফেরৎ দিয়াছি। দ্বিতীয় পুত্র বলিল—আমি জলে ঝাঁপ দিয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া একটি বালককে বাঁচাইয়াছি। তৃতীয় পুত্র বলিল—আমার ভীষণ শত্রুকে পর্ব্বতশিখরের একপ্রান্তে ঘুমাইতে দেখিয়াছি, তাহার অনিষ্ট করিতে পারিতাম, তাহা না করিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে জাগাইয়া দিয়াছি।

ইহাদের মধ্যে কে মহত্তম? উত্তর দাও ও গল্পাকারে বিবৃত কর।

২১। **উপস্থিত বুদ্ধি**-প্রদর্শনের দুই একটি গল্প বিবৃত কর।

(ক) ঘরে আগুন লাগিয়াছে—সকলেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে—কেবল একটি শিশুকে বাহির করিতে পারা যায় নাই; একটি যুবক তাড়াতাড়ি দুইখানি ভিজা কম্বল গায়ে দিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া একখানি ভিজা কম্বলে ছেলেটিকে জড়াইয়া লইয়া আসিল।

(খ) সার জেমস্ থর্ণ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। তিনি একটি গির্জ্জার চূড়ায় কার্য্য করিতেছেন—ভারার উপর তক্তায় দাঁড়াইয়া তিনি নিজের অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিতেছিলেন—দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া পিছাইতেছিলেন—যত দূর যাইতেছিলেন ততই ভাল লাগিতেছিল। আর এক পা পিছাইলেই সর্ব্বনাশ। একজন শ্রমিক আর একটি তক্তা হইতে ইহা দেখিল। সে যদি হাঁকিয়া সাবধান করিয়া দেয়, তাহাতেও শিল্পী রক্ষা পায় না, ভয় পাইয়া পড়িয়া যাইবে। তখন বুদ্ধিমান্ শ্রমিক

একটা প্রকাণ্ড তুলা রঙে ভিজাইয়া শিল্পীর কারুকার্য্যের উপর ছুড়িয়া মারিল,—অমনি শিল্পী সামনের দিকে ছুটিয়া আসিলেন এবং বাঁচিয়া গেলেন। কাজটা নষ্ট হইল—কিন্তু প্রাণটা বাঁচিল।

২২। **জীবজন্তুর বুদ্ধির গল্প**—কেমন করিয়া সুইট্‌সারল্যাণ্ডের কুকুর বরফের মধ্যে পথহারা মানুষের জীবন রক্ষা করে, কেমন করিয়া একটি পোষ্য বানর অগ্নিবেষ্টিত গৃহের উপর তলা হইতে একটি শিশুকে বাঁচাইয়াছিল—কেমন করিয়া একদল বানর নিজেদের দেহগুলি গাঁথিয়া সাঁকো তৈরী করিয়া নদী পার হইয়াছিল—কেমন করিয়া কৃতজ্ঞ সিংহ রোমদেশীয় ক্রীতদাসের জীবন হরণ না করিয়া আদর করিয়া অঙ্গলেহন করিয়াছিল, কেমন করিয়া হস্তীর শুঁড়ে সূচ ফোটানোর জন্য হস্তী দর্জ্জীর দোকান নষ্ট করিয়া প্রতিহিংসা লইয়াছিল, কেমন করিয়া হাতীটানা চলন্ত কামানের চাকার তলা হইতে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হস্তী ইংরাজ সৈনিককে বাঁচাইয়াছিল—এই সকল গল্প শিক্ষকদের কাছ হইতে শুনিয়া লইয়া নিজের ভাষায় প্রকাশ কর।

২৩। **রাজা আলফ্রেডের** গল্প, **উইলিয়ম টেলের** গল্প, রোমের পরিত্রাতা **হোরেশিয়াসের** গল্প; **পিটার দি গ্রেটের** গল্প, **হাওয়ার্ড** ও **ফ্লোরেনস্‌ নাইটিঙ্গেলের** আত্মত্যাগের কাহিনী, সার **ফিলিপ সিডনীর** রণশয্যার কাহিনী, **নেপোলিয়নের** দিগ্বিজয়ের কথা, **আলেকজাণ্ডার** ও কাফরি সর্দ্দারের কথা, **মোজেস** ও **ইস্রায়েল্‌** জাতির পরিত্রাণের কাহিনী, **সোহ্‌রাব** ও **রোস্তমের** কাহিনী, **রবিন হুডের** কাহিনী, **সলোমনের** কাহিনী, **মাইদাসের** চৈতন্যোদয়ের কাহিনী, **আটালাণ্টার** ধাবন-পণের কাহিনী—এইগুলি শিক্ষকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও এবং নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

বিবিধ বিষয়ক রচনা

মহাত্মা গান্ধী

বুদ্ধ, খৃষ্ট, শ্রীচৈতন্যের মত এ যুগে যিনি নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন—তিনিই মহাত্মা গান্ধী। গুজরাটের পোরবন্দরে মহাত্মা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পুরা নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ইঁহার পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধী।

ইনি বাল্যকালে খুব বুদ্ধিমান্ ছাত্র ছিলেন না, কিন্তু তখন হইতেই তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করিয়া সতেরো বৎসর বয়সে ইনি বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়িতে যান। যাইবার সময় মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া যান—সেখানে মদ্য-মাংস স্পর্শ করিবেন না। কেবল বিলাতে নয়, সমস্ত জীবনই তিনি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৮৯২ সালে ইনি ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে ফিরিয়া ব্যারিষ্টারি সুরু করেন। একটা মামলায় ইনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। সেখানে গিয়া তিনি ব্যারিষ্টারি করিতে চাহেন। এখানে সাহেবরা ভারতবাসীর উপর বড়ই অত্যাচার করিত। ভারত-বাসীর দুঃখ ও অপমানে তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন। তাহার ফলে তিনি সেখানে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলেন এবং বারবার জেলে গেলেন। তাহাতে কিছু ফল হইল। তখন তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া দেখিলেন—সমস্ত দেশের উপরই সাহেবরা নিত্যই অত্যাচার করিতেছে।

জাতীয় মহাসভা তখন ভারতবর্ষে দেশের কল্যাণের জন্য আন্দোলন

করিতেছিল। মহাত্মা তাহাতে যোগ দিলেন। জনসাধারণের সঙ্গে এই জাতীয় মহাসভার যোগ ছিল না—ইহা ছিল কতকগুলি শিক্ষিত লোকদের একটা প্রতিষ্ঠান। মহাত্মা জনসাধারণের সঙ্গে ইহার যোগ স্থাপন করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন—সভা ও বক্তৃতাতে কোন কাজ হইবে না—অহিংস ভাবে সত্যাগ্রহ করিতে হইবে।

১৯১৫ সালে সত্যাগ্রহ-প্রচারের জন্য তিনি শবরমতী আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করিলেন। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা দেশের অসংখ্য দরিদ্র মূর্খ হিন্দুদের অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাদের মানুষ বলিয়াই গণ্য করিত না। মহাত্মা ইহাতে বড় ব্যথা পাইলেন; আর দেখিলেন, দেশের অসংখ্য লোককে এমন করিয়া ঠেলিয়া রাখিলে ভারতবর্ষ কোন দিন বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি পাইবে না। ইহাদের মহাত্মা বলিতেন, হরিজন। এই হরিজনদের সমাজে স্থান দিবার জন্য তিনি আন্দোলন আরম্ভ করিলেন।

তিনি দেখিলেন—হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করিলে কখনও তাহারা একতাবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিবে না, চিরদিন নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করিবে। দুই জাতির মধ্যে যাহাতে মিল হয় সেজন্যও তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার প্রধান অস্ত্র চরকা। ইহা আক্রমণের অস্ত্র নয়—ইহা জাতি-গঠনের অস্ত্র। চরকা চালনার দ্বারা তিনি প্রচার করিয়াছেন—বস্ত্রের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করিও না—দেশের কলকারখানার উপরও নির্ভর করিও না—নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর কর—স্বাবলম্বী হও, কুটীর শিল্পের উন্নতি কর, বিলাসিতা বর্জ্জন কর, অলস হইয়া এক মুহূর্ত্তও কাটাইও না।

বস্ত্রের সম্বন্ধে তাঁহার মুখে কথা, জীবনধারণের অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধেও

সে কথা। চরকাকে উপলক্ষ করিয়া তিনি আমাদের পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী ও অবিলাসী হইতে উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন,—নিজের হাতে কাটা সুতায় তৈরী খদ্দর পরিলে তাহার সঙ্গে জীবনযাত্রার যে যে জিনিসের সামঞ্জস্য হয়—সে সেই জিনিসই ব্যবহার করে। ফলে, বিলাসিতা একেবারেই চলিয়া যাইবে।

গান্ধীজী সত্যাগ্রহী হইয়া অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন—বহুবার জেলে গিয়াছেন। তাঁহার সত্যাগ্রহের একটি দৃষ্টান্ত ডাণ্ডী অভিযান। সরকার লবণের উপর অন্যায় ভাবে কর বসাইয়াছেন। এই কর যাহাতে বন্ধ হয় সেজন্য তিনি ৭৯ জন সহচর লইয়া সমুদ্রতীরের দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন—নিজের হাতে লবণ তৈরী করিবার জন্য। এজন্য তিনি বহু লাঞ্ছনা সহ্য করেন।

মহাত্মা বলেন—মানুষ যতই অত্যাচারী পশু হোক্—তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব একেবারে লোপ পায় না—ঘুমাইয়া থাকে। অহিংসা, ক্ষমা, ভালবাসা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদির দ্বারা তাহা আবার জাগাইয়া তোলা যায়। এই মনুষ্যত্ব জাগিলেই সকল অত্যাচার, অবিচার দূর হইয়া যায়। তিনি আমাদের দেশের সেবকদের এই শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়াছেন। ইহার ফলেই হয়ত আজ আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। জগতে কোন পরাধীন জাতি এই পথ অনুসরণ করে নাই—বিনা যুদ্ধে স্বাধীনতা লাভের পথ তিনি দেখাইয়া দিলেন।

আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি, কিন্তু এখনো ইংরাজের চক্রান্ত থামে নাই—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি চলিতেছে। তাই স্বাধীনতা পাইয়াও ৭৯ বৎসর বয়সেও মহাত্মা একদিনের জন্য বিশ্রাম পান নাই। যেখানেই হানাহানি চলিতেছে মহাত্মা সেখানে গিয়াই শান্তির মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। এজন্য ইনি নোয়াখালীর গ্রামে

গ্রামে ভ্রমণ করিয়াছেন—বিহারের লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন—কলিকাতার বস্তিতে বাস করিয়া জোড়হাতে আবেদন জানাইয়াছেন—তারপর দিল্লীতে গিয়া অত্যাচারীদের হাতের অস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন। মহাত্মার এই সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি প্রচারের ফল ফলিতেছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী একজন উগ্রপন্থী আততায়ীর গুলিতে তাঁহার জীবনাবসান হইল। মহাত্মা আরো কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত আমরা স্বাধীনতার ভার বহিবার যোগ্যতা লাভ করিতাম।

ফুল

তুমি বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তোমাকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। চিত্ত প্রফুল্ল হয় এবং মনের ফুল ফুটে। সেই সঙ্গে কত চিন্তারই না উদয় হয়! বনবাগানের গাছগালার মধ্যে তুমি এত মাধুরী, এত কোমলতা, এত শোভা কি করিয়া পাইলে? তোমার অঙ্গে কত রকমের রঙের ছটা ও রূপের ঘটা। এক সবুজ রঙ হইতে এত রঙ কোথা হইতে আসে? মানুষ কত সুন্দর জিনিস তৈয়ারী করিয়াছে; কিন্তু তোমার মতন এত সুন্দর তাহাদের একটিও নয়। তোমার পাপড়িগুলির মতন এত কোমল এ জগতে কিছুই নাই। তোমার কেশর ও পরাগগুলি আরও সুকুমার। ছুঁইলেই যেন তোমাকে পীড়া দেওয়া হয়।

তোমার মধু—সে এক বিস্ময়ের বস্তু। এই মধু ভ্রমর-প্রজাপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসে। এই মধুই তোমার চারিপাশ সঙ্গীতের মাধুরীতে ভরিয়া তুলে। মধুমক্ষী ইহা লইয়া মৌচাক

রচনা করে। তাহাই আবার আমাদের ভোগের সামগ্রী ও রোগের ঔষধ হইয়া উঠে।

এত দিয়াও বিধাতা ক্ষান্ত হ'ন নাই। বিধাতা এক পাত্রে তাঁহার সৃষ্টির সকল মাধুরীর, সকল সুষমার সমাবেশ করিবার উদ্দেশ্যে তোমার মধ্যে এমন সুগন্ধ দিয়াছেন, যাহার তুলনা ত্রিভুবনে নাই। হায়, তোমাকেও কিনা চন্দন মাখিতে হয়!

কিন্তু দুঃখ এই, তোমার জীবন মাত্র দুইচার দিনের। পাছে দীর্ঘজীবী হইলে তোমার মাধুরী বা আদর কমে, তাই বোধ হয় রসরাজ তোমাকে বেশিদিন জীবিত রাখেন না। মানুষ এমনি নিষ্ঠুর, এমনি স্বার্থপর যে, তোমাকে দুই চারদিনও বাঁচিতে দেয় না। ফুটিবামাত্র বোঁটা হইতে তোমাকে ছিঁড়িয়া ভোগে লাগায়—তোমার কোমল অঙ্গে সূচ ফোটায়,—তোমাকে লইয়াও ব্যবসা করে।

বনবাগান তোমাকে ফুটাইয়া রসরাজের পূজা করে। তোমাকে জীবন দিয়া, তোমাকে জীবন্ত রাখিয়া তাহারা বিধাতারই মহিমা-কীর্ত্তন করে। মানুষ তোমাকে বধ করিয়া দেবীমূর্ত্তির পূজা করে। দেবতা কি তাহাতে তুষ্ট হ'ন? কোন্‌টি প্রকৃত পূজা?

তুমি আপন বোঁটায় রহিয়া যখন ঝরিয়া যাও—তখনই তোমার দান নিঃশেষ হন না। দল ও পরাগ ছুটি লয়—ফলের গুটি রহিয়া যায়। সুন্দর বিদায় লয়,—কল্যাণ থাকিয়া যায়। সেই কল্যাণের ধারা অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকে।

[ভিন্ন ভিন্ন ফুলের সামান্য সামান্য পরিচয় দাও। বিজ্ঞানের পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্য লও।]

ফল

(সংক্ষিপ্ত)

ফুল হইতে ফল জন্মে। ফল প্রায় সকল গাছেরই হয়। যে গাছ-গুলির ফল সুমিষ্ট (বা ফুল সুন্দর) সেগুলিকে আমরা লোকালয় বা বাগানে ঠাঁই দিয়াছি। যেগুলির ফল বিস্বাদ, সেগুলি হয় বনজঙ্গলে, নয় লোকালয়ের আশেপাশে অনাদরে থাকিয়া গিয়াছে। মানুষ ও পশুপক্ষী বীজের বিস্তার করে। সেজন্য এক দেশের ফল অন্য দেশের মাটিতেও জন্মিতে পারে। পাকিলে ফলের বর্ণ ও গন্ধের পরিবর্ত্তন হয়। ফলের গন্ধ ও বর্ণ জীবজন্তুকে 'ফলাহারের' নিমন্ত্রণ করিয়া আনে।

আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্যের মধ্যে ফল অন্যতম। আমাদের শরীর গঠনের উপযোগী সমস্ত উপাদানই ফলে আছে। কেবল ফল খাইয়াই মানুষ বাঁচিতে পারে। রোগীর পথ্য ও ঔষধরূপে অনেক ফল বড়ই উপকারী। ফলই একমাত্র বিশুদ্ধ খাদ্য—যাহাতে ভেজাল চলে না।

মাটির ও জলবায়ুর সঙ্গে ফলের নিবিড় সম্বন্ধ। সকল মাটিতে ও সকল জলবায়ুতে সকল ফল জন্মে না। কোন কোন মাটিতে মিষ্ট ফলও বিস্বাদ বা টক হইয়া যায়। ফল সাধারণতঃ দুই প্রকারের—

(১) একপ্রকার ফলের উপর নরম শাঁস—ভিতরে বীজ। যেমন—**আম, পেয়ারা।**

(২) আর একপ্রকার ফলের উপরে ছোবড়া, ভিতরে শক্ত আঁটি বা বীজের মধ্যে শাঁস। যেমন—**নারিকেল, বাদাম।**

কোন ফল লতায় জন্মে, কোন ফল গাছে ধরে। কোন ফল এক-বীজক—কোন ফল বহুবীজক—কোন ফলের বীজই নাই। কোন ফল পরিণত হইয়া পচিয়া যায়,—কোন ফল শুকাইয়া যায়। কোন ফল

দুই-চারিদিন মাত্র তাজা বা টাট্‌কা থাকে,—কোন ফল বহুদিন পর্য্যন্ত আহারের উপযোগী থাকে। কোন ফল গুচ্ছে গুচ্ছে ধরে,—কোন ফল পৃথক্ পৃথক্ ফলে। কোন কোন ফলের শস্য বহু ভাগে (কোয়ায়) বিভক্ত। কোন ফল বারো মাস ফলে,—কোন কোন ফলের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঋতু আছে। কোন কোন ফল পরিণত ও অপরিণত দুই অবস্থাতেই সুখাদ্য। কোন কোন ফল রন্ধন করিয়া খাইতে হয়। কোন কোন ফলের মধ্যে শাঁস বা জল পৃথক্ ভাবে থাকে। এ সমস্ত জানিয়া লও।

অনুশীলনী

উপরের পরিচয়গুলির দৃষ্টান্ত দাও এবং নিম্নলিখিত ফলগুলি সম্বন্ধে এক একটি বাক্য রচনা কর—**নারিকেল, কলা, পেঁপে, কমলালেবু, কাঁটাল, তরমুজ, লিচু, আতা, আঙুর, আম, তাল, বেল, বাদাম** ও **বাতাবি**। কোন্ কোন্ ফল বিদেশী? কোন্ ফলের স্বাদ কিরূপ? [বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা লও]।

সর্প

কথায় বলে, বাঘের দেখা—সাপের লেখা। বাঘের সঙ্গে বনের মধ্যে দেখা হইলে রক্ষা নাই, কিন্তু কপালে মৃত্যু লেখা থাকিলে সুখশয্যায় শুইয়া থাকিয়াও সাপের দাঁতে প্রাণ যাইতে পারে। পুরাণে আছে—**পরীক্ষিৎ** যথেষ্ট সাবধান থাকিয়াও সর্পদংশনে প্রাণ হারাইলেন। **লখীন্দর** লোহার বাড়ীর সাত তলার উপরে থাকিয়াও রক্ষা পাইলেন না। এই দুটি গল্প ঐ কথা বুঝাইবার জন্যই রচিত।

ছোট আধ হাত লম্বা একটি সাপ একটি বিরাটকায় মানুষকে এক

ছোবলেই হত্যা করিতে পারে। কিসের জোরে? বিষের জোরে, দাঁতের জোরে নয়। ঢোঁড়া সাপ কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিলেও মানুষ মরে না। ঢোঁড়ার ত বিষ নাই। কেউটে, গোখুরা, খরিশ ইত্যাদির দাঁতে বিষ আছে।

বিষধর সাপের দুইটি বড়-বড় লম্বা বিষ দাঁত থাকে। এইগুলির গোড়ায় বিষের থলি থাকে। ঐ দাঁত দুইটি আগাগোড়া ফাঁপা।

সাপ ঐ বিষ-দাঁত দিয়াই কামড়ায়। তখন বিষের থলি হইতে কয়েক ফোঁটা বিষ ঝরিয়া ক্ষতের মধ্যে ঢুকিয়া যায়। এই বিষ-দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলেও কিছুদিন পরে আবার গজায়। সাপের কাণ নাই। সাপের চেরা জিভ স্পর্শেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়—দুয়েরই কাজ করে।

সাপের চোয়ালের হাড় জোড়া নহে। তাই সাপ খুব বড় হাঁ করিতে পারে এবং নিজের চেয়ে মোটা জন্তুকেও গিলিয়া উদর-গহ্বরে চালান করিয়া দিতে পারে। কেউটে, গোখুরা প্রভৃতি কয়েকটি বিষধর সাপ ফণা তোলে। মেরুদণ্ডের দুইপাশের কাঁটাকে খাড়া করিয়া সাপ ফণাকে চেপ্‌টা করিয়া দেয়। হাত-পা না থাকিলে কি হয়, সাপের শরীরটাই হাত-পা'র অন্যান্য কাজ সবই করে। সাপের মেরুদণ্ড এমনভাবে তৈরী যে, দেহ দিয়া তাহার শিকারকে খুব জোরে জড়াইয়া ধরিতে পারে। এত জোরে সে জড়াইয়া ধরে যে, তাহাতে শিকারের হাড় ভাঙ্গিয়া যায় কিংবা দম আটকাইয়া যায়।

সাপের রাজা অজগর। অজ অর্থাৎ ছাগল গিলিতে পারে বলিয়া ইহার নাম অজগর। অজগর পাহাড়-পর্ব্বতে থাকে।

আমাদের দেশ সাপের দেশ,—'নাগলোক' বলিলেই হয়। বৎসর বৎসর হাজার হাজার লোক সর্পদংশনে মারা যায়। তাই এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে, গানে, সাহিত্যে, পুরাণে, ইতিহাসে সর্ব্বত্রই সাপের কথা।

সর্প-ভয়ে এদেশের লোক পৃথক্ একটি দেবতারই (**মনসাদেবী**) কল্পনা করিয়াছে, কিন্তু সর্পদংশনের কোন অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। ইউরোপে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হইতেছে। সে দেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরাও কোন ঔষধ বাহির করিতে পারেন নাই। এদেশে একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা মন্ত্র-তন্ত্রের সাহায্যে সর্পদংশনের চিকিৎসা করে। তাহাদিগকে **ওঝা** বা **রোজা** বলে।

ভগবান্ সকল জীবকেই আত্মরক্ষার অস্ত্র দিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে সর্পকে যাহা দিয়াছেন তাহাতে মানুষের দর্পও চূর্ণ হইয়াছে। এমনই সাংঘাতিক সে অস্ত্র যে, সম্পূর্ণ সতর্ক থাকিয়াও তাহা হইতে লোক নিস্তার পায় না। তবে মানুষের একটা বাহাদুরি আছে। এমন সাংঘাতিক জীব লইয়া খেলা দেখাইয়াও সে জীবিকা অর্জ্জন করে। যাহারা সাপ ধরে ও খেলায়, তাহাদিগকে বলে **মাল** বা **সাপুড়িয়া**।

অনুশীলনী

কুম্ভীর—জলচর সরীসৃপ—টিকটিকিকে অনেকগুণ বাড়াইলে যেমন হয় আকারে তেমনি; ধারালো দাঁত, কামড়ের জোড়। চারিটি পা—বড়ই দুর্ব্বল। তাড়াতাড়ি চলিতে পারে না। লেজই প্রধান অস্ত্র—খুব জোরালো। লেজের ঝাপ্টায় হাতীকেও কাৎ করে। পিঠের চামড়া যেমন শক্ত, তেমনি পুরু। নদীর ধারে বালির গর্ত্তে ডিম পাড়িয়া বালি ঢাকা দেয়—রৌদ্রের তাপে ডিম ফোটে। শিয়াল ও বেজি ডিম চুরি করিয়া অনেক ডিম খাইয়া ফেলে। তাই রক্ষা, নতুবা নদী, খাল-বিলের জলে নামার উপায় থাকিত না।

ভেক—ব্যাঙাচির লেজ খসিয়া গেলে ব্যাঙের ছানা জন্মে। ব্যাঙের শরীর আগাগোড়া চর্ব্বিতে গড়া। সমস্ত শীতকালটা গর্ত্তের মধ্যে

কুম্ভকর্ণের মত ঘুমায়। দেহের চর্ব্বিই অনাহারী ব্যাঙকে বাঁচাইয়া রাখে। ব্যাঙ শ্বাস গ্রহণ করে বড় কম—সে জন্য তাহার রক্ত ঠাণ্ডা, ব্যাঙ পোকামাকড় খায়—নিজে কিন্তু সাপের প্রিয় খাদ্য। বর্ষা পড়িলে ব্যাঙের বড়ই আনন্দ! এক সঙ্গে শত শত ব্যাঙ (মত্ত দাদুরীরা) ঘ্যাঙ-ঘ্যাঙ স্বরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেয়।

মৎস্য—বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য। বঙ্গদেশকে 'মৎস্যদেশ' বলিলেও চলিত। [নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর জানিয়া লও—অথবা তোমাদের বিজ্ঞানের পুস্তক হইতে সংগ্রহ কর। মাছের ডানা, কান্‌কো, পটকা, লেজ, আঁশ ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক্ কাজ কি? মাছ কি সাঁতরায়? মরা মাছ জলে ভাসে কেন? মাছ জলে কি করিয়া বাতাস পায়? কই-মাছ ডাঙ্গায় বাঁচে কেন? মাছ কি কি খায়? মাছ কখন্ ডিম পাড়ে? মাছ ধরিবার কি কি উপায় আছে? কত প্রকারের মাছ আছে? মাছের তেল জিনিসটি কি? আমরা মাছ কি কি রূপে খাই? বাঙলা-দেশের নদী, খাল, বিল, পুকুরে এতই মাছের বৃদ্ধি যে বাঙালী যদি মাছ না খাইত মাছই বাঙালীকে খাইয়া ফেলিত।]

ছয়-ঋতু

(কথোপকথনের ভঙ্গীতে নিবদ্ধ রচনা)

তমসা—দাদা, বইএ পড়েছি ছয়টা রিপু আছে, আমার মনে হয় ছয়টা ঋতুই সেই ছয়টা রিপু। একটাতেও বেশ শান্তিতে বা স্বস্তিতে থাক্‌বার যো নেই। ভগবান এ পোড়া দেশের জন্য একটা ভাল ঋতু দিতে পারলেন না।

আলোক—কেন? এমন কথা কেন বল্‌ছিস, বোন। ভগবান্ ত

বেশ হিসাব ক'রেই ঋতুগুলির সৃষ্টি করেছেন। বৎসরের চক্রাকার পথে ঋতুগুলো এমন চমৎকার ক'রে সাজানো যে, বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে কোন ক্লেশই ত হয় না।

তমসা—কোন্‌টা ভাল শুনি? এই **গ্রীষ্মকালে** দেখ, ধুলো, মশা, মাছি। দারুণ রোদ্দুর—দিনের বেলায় বা'র হওয়ার যো নেই। গরমে ছটফট ক'রতে হয়, দরদর ক'রে ঘাম ঝরে, অনবরত ঢকঢক ক'রে জল খেতে হয়। ভাতে রুচি থাকে না, রাতে ঘুম হয় না। বৈকালবেলায় কালবৈশাখীর ঝড়, তাতে গাছপালা ভেঙে পড়ে, বাড়ীঘর উড়ে যায়। এই গ্রীষ্মঋতুর ভাল কোন্‌খানে?

তারপর দেখ **বর্ষা**, পথঘাটে কাদা, যখন তখন বৃষ্টি, বাড়ীর বা'র হ'বার যো নেই। এক-একদিন সূর্যোর মুখ দেখাও যায় না। কাপড়-চোপড় শুকায় না। জিনিসপত্রে স্যাঁতলা ধ'রে যায়। মেঘের ডাকে প্রাণ চমকে উঠে। ভাল হজম হয় না। মন ভাল থাকে না। তারপর বন্যা আসে, কত লোকের ঘরবাড়ী ভেসে যায়।

তারপর দেখ **শরৎ**। শরৎকালেও বৃষ্টির বিরাম নেই, পথঘাট শুকায় না। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া-জ্বর—লোকের দুঃখের অবধি থাকে না। কত লোক ঐ জ্বরে ম'রে যায়। রাত্রিকালে সাপের ভয়। ঢাক-ঢোলের শব্দে কাণ পাতা যায় না। ট্রেনে ষ্টীমারে দারুণ ভিড়।

তারপরে **হেমন্ত**। বেশি ঠাণ্ডাও নয়—গরমও নয়। কি গায়ে দেব ঠিক করতেই পারা যায় না। ফলে, সর্দ্দিকাসিতে ভুগ্‌তে হয়—বাগানে ফুল ফল কিছুই নেই। চারিদিক্ ধোঁয়ায় ভরা। প্রকৃতি মুখটি মলিন ক'রে শিশিরের ছলে অশ্রুপাত করে। সমস্তই নিরানন্দ। যারা বর্ষাকাল হ'তে ম্যালেরিয়ায় ভুগেছে, তারা এই ঋতুতে চিরবিদায় নেয়।

তারপর শীত যখন জেঁকে আসে, তখন জলের যেন দাঁত ওঠে। হাত

দিয়ে জল ছোঁওয়ার যো নেই—স্নান বন্ধ করতে হয়। ভোরে উঠতে পারা যায় না। সন্ধ্যা হ'লেই ঘরে ঢুকতে হয়। দিনগুলো বেজায় ছোট রাত আর ফুরায় না! বনবাগানে বা গাছপালায় কোন শ্রী থাকে না। সকালে কুয়াশা, সন্ধ্যাকালে ধোঁয়ায় আকাশ থাকে ভ'রে। বুড়োবুড়ীরা কেসে কেসে মরে,—সুস্থ লোকেরও হাঁপানি ধরে। গরীবের দুর্দ্দশার অবধি থাকে না। জীবজন্তু সব মৃতপ্রায়।

তারপর **বসন্ত**। ঋতু-বসন্তের সঙ্গে ব্যাধি-বসন্তেরও আবির্ভাব। কি বিশ্রী রোগ! নদী-পুকুরের জল ক'মে যায়—সহজেই জল বিষাক্ত ও রোগের বীজাণুতে দূষিত হয়ে ওঠে। সেই জল খেয়ে গ্রামে গ্রামে কলেরা হয়। পানীয় জলের কষ্ট কি কম! মশামাছির উৎপাত আরম্ভ হয়। গাছগুলো নেড়া হ'য়ে যায়। শুকনা পাতা আর ধূলো উড়িয়ে এলোমেলো বাতাস বইতে থাকে। কোকিলের চীৎকারে কাণে তালা ধ'রে যায়।

এই ত তোমার ছয়টা ঋতু। এখন বল দেখি এরা ঋতু না রিপু?

আলোক—তুমি অমাবস্যাটাই দেখ,—পূর্ণিমাটা ত দেখ না। প্রত্যেক ঋতুই আমাদের যে কত আনন্দ দেয়—কত যে কল্যাণ সাধন করে, তা'ত একবার ভাবলে না।

গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখী হয়—কিন্তু কালবৈশাখীর ঝড় রোগের বীজাণু, দূষিত পদার্থ ও জঞ্জাল আবর্জ্জনা সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারপর হয় অবিরল বর্ষণ—তাতে পৃথিবী জুড়ায়, শুকনো মাটি সরস হয়, বীজ অঙ্কুরিত হয়, আরও কত কি উপকার হয়। শীতল জল, গাছের ছায়া, সন্ধ্যার শীতল হাওয়া এসব কি উপভোগ্য নয়? কত সুগন্ধি ফুল ফোটে বল দেখি! বাতাসে কি হাস্নুহানার মিঠে গন্ধ পাও না?

তারপর ফলের ভাণ্ডারের কথা ভাব দেখি; আম, জাম, তরমুজ,

কাঁটাল, লিচু, গোলাপজাম—আর কত নাম করব? রৌদ্র প্রখর বটে, কিন্তু তাতে রোগের বীজাণুগুলো পুড়ে যায়। ঐ রোদই জলকে বাষ্প ক'রে মেঘের জন্ম দেয়। ঘাম ঝরে বটে, কিন্তু ঘাম ঝরা ত ভালই। সারা বছরের যত দূষিত ক্লেদ দেহে জমা থাকে তা বেরিয়ে যায়।

তারপর **বর্ষা** আসে দেবরাজের আশীর্ব্বাদের মত। নদীপুকুর সব ভ'রে উঠে—ধূলার উৎপাত থাকে না, ব্রহ্মাণ্ডটা ঠাণ্ডা হয়। দেহের দাহ যায় জুড়িয়ে—জীবজন্তু, গাছপালা সব নূতন প্রাণ পায়। মা মেদিনী আবার শ্যামলা হ'য়ে ওঠেন। চাষা, মাঝি, নেয়ে ও জেলেদের এ সময়ে কত আনন্দ! সব চেয়ে বড় কথা,— দু-তিন মাস ধ'রে অবিরল ধারাপাত হয় ব'লেই দুইবেলা বাড়া ভাত খেতে পাও। বাংলার প্রধান সম্বল ধান আর পাট—দুই-ই এই বর্ষার দান।

শরতের নিন্দা করলে তুমি। শরতেই বঙ্গভূমি শস্যশ্যামলা। বর্ষার যে অসুবিধা ও কষ্ট শরতে তার কিছুই থাকে না। অথচ বর্ষার সুফলটা পুরাদস্তুর পাওয়া যায়। এই শরৎকালে নদী কূলেকূলে ভরা, অথচ বন্যা নেই। বৃষ্টি হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে। আকাশের বিশ্রী চেহারা আর থাকে না। কৃষকের খাটনি ক'মে যায়—গাইগুলি বেশ সুপুষ্ট হ'য়ে কেঁড়েভরা দুধ দেয়। বনে, বাগানে ও পুকুরে ফুলের ছড়াছড়ি। আউশ ধান পাকে। রাত্রিকালে আকাশে জ্যোৎস্নার বাণ আসে। তারপর **পূজার আনন্দ** যে কত—তা আর কি বলতে হবে?

হেমন্তকালে গরম-ও নেই, বেশি ঠাণ্ডাও নেই, বর্ষার কষ্টও নেই। এই কাল ত চমৎকার, তমসা। এই সময়েই বাংলার ক্ষেতে ক্ষেতে সবুজ ধান সোনার ধান হ'য়ে উঠে। হেমন্ত লক্ষ্মীর দানই ত আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ্। এ সময় আলু ও চৈতালী ফসল লাগানো হয়, হেমন্তের মাটি সেগুলিকে বুকের রস দিয়ে **মাটি-র** মত প্রতিপালন করে।

তারপর **শীতের** কথা। এই শীতের জন্য লোকে **দার্জ্জিলিং, সিমলা** ছোটে, আর একে নিন্দা ক'রছ তুমি! এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীত ত পরম উপভোগ্য। গরমে যারা কাতর হ'য়ে পড়ে, শীতে তারা খুব খাটতে পারে। এ সময় রোদ ও আগুন পৌষের পিঠের চেয়েও মিঠে লাগে। ক্ষেতের ধান খামারে আসে, তাতে কি কৃষিসম্বল বাংলা দেশের কম আনন্দ? এই ঋতুতে খাদ্যসুখ কি কম? নূতন গুড় (আখের ও খেজুরের), কফি, মটরশুটি, নূতন আলু, কমলালেবু ও প্রচুর তরী-তরকারী কি ভোজনের আয়োজন বাড়ায় না? শীতকালে বন-বাগানে শোভা থাকে না—কিন্তু ক্ষেত ও আঙিনার শোভা ত বাড়ে।

তারপর **বসন্তকাল**। বসন্তকে ঋতুরাজ বলা হয়, তা কি কবিকল্পনা মাত্র? বন-বাগান যে মঞ্জরী-মুকুলে ও ফলে ফুলে ভ'রে যায়, মৌমাছির গুঞ্জনে যে মুকুলভরা আমবাগান মুখরিত হয়—কোকিল-পাপিয়া যে মধুরকণ্ঠে গান ধরে—সকল গাছেই যে রঙিন নূতন পাতাগুলি গজায়—ঝিরঝির ক'রে যে মলয়বাতাস বইতে থাকে—সেগুলিতে কি কোন মাধুর্য্য নেই? তারপর যব, গম, সরিষা, মসিনা, ছোলা, মটর, মসূর, তিসি, কলাই ইত্যাদি বহুপ্রকারের ফসল তো বসন্ত-লক্ষ্মীর দান। এগুলিকে উপেক্ষা করলে চলবে কেন? দেশের কল্যাণ অকল্যাণের কথা বলতে গেলে এ সকল কথাও ভাবতে হবে। আর তোমার নিজের স্বস্তিশান্তি আরাম-স্বচ্ছন্দ্যের কথা যদি বল—সেটা যতটা তোমার নিজের মনের গতি, প্রকৃতি, দৃষ্টির উপর নির্ভর করে—ততটা ঋতু বা মাসের উপর নির্ভর করে না। তুমি হতভাগ্য, তাই তোমার কাছে ছয় ঋতু হয়েছে ছয় রিপু।

[এই নিবন্ধটি পাঠ করিয়া ছয় ঋতু সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিবন্ধ লিখ।]

কাশীভ্রমণ

(পত্রাকারে নিবন্ধ)

৮ই মাঘ, ১৩৫০

১৯৮, রামাপুরা, কাশী।

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদা, আপনি আস্‌বার সময় ব'লে দিয়েছিলেন কাশীতে যা যা দেখ্‌ব, চিঠি লিখে আপনাকে জানাতে। কাল আমার সব দেখা শেষ হয়েছে। তাই আজ চিঠি লিখছি।

পথে ছোটনাগপুরের পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ট্রেন আস্‌তে দু'ধারের শোভা আমার খুব ভাল লেগেছিল। দুইটা টানেল এবং শোণনদীর সাঁকো পার হ'বার সময় ভারি স্ফূর্ত্তি হয়েছিল। মোগলসরাই হ'য়ে এসেছি—সে জন্য গঙ্গার সাঁকো (ডাফরিন ব্রিজ)-ও পার হয়েছি! সাঁকোর উপর হ'তে মন্দিরের চূড়ায় ভরা ছবির মত কাশীনগরটিকে দেখে মনে হলো স্বপ্ন দেখছি। সব হতে উঁচু চূড়া দুইটি, শুন্‌লাম, বেণীমাধবের ধ্বজা।

গঙ্গার ধারের দিকে কাশীশহরে বড় ঘন বসতি। বাড়ীগুলির অধিকাংশই পাথরের তৈরী—তেতলা, চৌতলা, পাঁচতলা। জানালা বড় একটা নেই—মাঝে মাঝে ঘুলঘুলি আছে। পথগুলি সরু সরু—অন্ধকার। শুন্‌লাম পুরাণো শহর সবই এই রকম! নয়া কাশীর দিক্‌টা অর্থাৎ সিক্‌রোলের দিক্‌টার বাড়ীঘর হালফ্যাসানের—রাস্তাগুলি কলিকাতার মত। সিক্‌রোলে ইংরাজেরা থাকেন এবং সৈন্যাবাস, আফিস-আদালত সবই একদিকে। পুরাণো কাশী ও সিক্‌রোলের

মাঝামাঝি এদেশের গণ্যমান্য অনেক লোকের বাড়ী। অনেক ধনী লোকের বাড়ীও এদিকে আছে। তার মধ্যে হাতোয়ার রাজবাড়ী—ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার বাড়ী উল্লেখযোগ্য।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাই—আরতি দেখি। আরতির সময় যে স্তবগান হয়—তা শুনতে বড় ভাল লাগে। অর্থ বুঝি না, কিন্তু প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়। যে মন্দিরে ভারতবর্ষের সব জায়গা হ'তে ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীরা এসে ভক্তিভরে প্রণত হয়—সেখানে প্রণাম ক'রে প্রাণে আনন্দ হ'ল।

মন্দিরের সোনার পাতে মোড়া চূড়াগুলি সূর্য্যকিরণে যখন ঝলমল ক'রে **অহল্যাবাঈ ও রণজিৎ সিংহের** গৌরব প্রচার করে, তখন দেখে আনন্দ হয়; কিন্তু মনে হয় ভিখারী ভোলানাথের মন্দিরে এত সোনা কেন? মন্দিরে যাবার পথটি বড় সঙ্কীর্ণ—তা আবার শিবের পোষা ষাঁড়গুলি অবরোধ ক'রে ঘুরে বেড়ায়।

দশাশ্বমেধ ঘাটটি বড় চমৎকার। বিরাট্ ঘাট—অগুণ্তি সিঁড়ি—অসংখ্য নরনারী স্নান ক'রছে—পূজা ক'রছে, স্তবপাঠ ক'রছে। গান চলছে—শাস্ত্রালোচনা চলছে। কত সাধু-সন্ন্যাসী ধুনী জ্বেলে ব'সে আছেন, তাঁদের চারিপার্শ্বে জনতা। এঁরা অরণ্যের তপস্বী ন'ন—এঁরা জনারণ্যই ভালবাসেন। এ ঘাটে সকাল-বিকাল ব'সে থাকি আর হিন্দুদের ধর্ম্মনিষ্ঠা দেখি। গোটা ভারতবর্ষেরই এখানে পরিচয় পাওয়া যায়—সকল প্রদেশের লোক এখানে একত্র হয়। এত বুড়াবুড়ী এক-জায়গায় আর কোথাও দেখি নি।

কাশীর রূপ দেখতে হ'লে গঙ্গাবক্ষে নৌকা হ'তে দেখাই ঠিক। পটে আঁকা ছবির মত দেখায়। দশাশ্বমেধ ঘাট হ'তে নৌকা ক'রে মণিকর্ণিকা-ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম—গঙ্গার ধারের মঠ-মন্দিরের শোভা দেখতে

দেখতে। অনেক বাড়ী ও মন্দির নদীর গর্ভ হ'তেই উঠেছে। **মণিকর্ণিকা** ঘাটে নামতেই **হরিশ্চন্দ্রের** উপাখ্যান মনে পড়ল। তারপর **বেণীমাধবের** মন্দিরে গেলাম। যে দুটি চূড়াকে বেণীমাধবের ধ্বজা ব'লে জেনেছিলাম—দেখলাম তা আরওঙ্গজেবের ধ্বজা অর্থাৎ তা মন্দিরই নয়—আওরঙ্গজেব কর্তৃক নির্ম্মিত একটি দরগার মিনার। ঐ মিনারে অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলাম। সেখান হ'তে গোটা কাশীশহরের পুরা দৃশ্যটি দেখা যায়—গঙ্গার নৌকাগুলোকে মোচার খোলের মত মনে হয়।

বুদ্ধদেব যেখানে প্রথম ধর্ম্ম প্রচার করেন, তিন ক্রোশ দূরে সেই **মৃগদাব-সারনাথে** একদিন গিয়েছিলাম। সেখানকার স্তূপ, **মূল-গন্ধকুটী** বিহার, মিউজিয়ম ও প্রাচীন বিহারের ভগ্নাবশেষ দেখলাম।

ইতিহাসে অশোকস্তম্ভের সিংহচূড়ার ছবি দেখেছিলাম—সেই সিংহ-চূড়াটি এখানে দেখলাম। দেখে মনে হ'ল যেন ননী দিয়ে গড়া। দুই হাজার বছর আগে গঠিত, তবু মনে হয় যেন সদ্যোরচিত।

পরের পত্রে সারনাথ সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখব। এ ছাড়া ঢুণ্ডিগণেশ, কালভৈরব, আদিকেশব, নৃসিংহদেব, সঙ্কটাদেবী, কেদারেশ্বর, তিল-ভাণ্ডেশ্বর, অন্নপূর্ণা ইত্যাদি অনেক দেবদেবীর মন্দিরে গিয়েছিলাম। **রাণী ভবানীর** দুর্গাবাড়ী, **অহল্যাবাঈএর ঘাট**, ত্রিলোচনঘাট, অসিঘাট, কেদারঘাট, পাঁচগঙ্গাঘাট, ধ্রুবঘাট, মানমন্দির, জ্ঞানবাপী, ব্যাসকাশী, কাশীরাজের প্রাসাদ, বিষ্ণুকুণ্ড, হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি অনেক কিছু দেখেছি। পরপত্রে এ সকলের সম্বন্ধে জানাবে।

সন্ধ্যার কুলায়,
টালিগঞ্জ।

ইতি—স্নেহের
কবিকঙ্কণ

অনুশীলনী

পুরী—পুরী কোথায়? কি জন্য বিখ্যাত? কলিকাতা হইতে কোন্ পথে কি ভাবে যাওয়া যায়। লোকে কি কি কারণে পুরী যায়? কোন্ সময়ে লোকের ভিড় হয়? কোন্ সময় সমুদ্রতীরে ভিড় বেশি হয়? স্বাস্থ্যনিবাস হিসাবে পুরীর মর্য্যাদা। পুরীতে দ্রষ্টব্য কি কি আছে? শ্রীচৈতন্যদেব, শঙ্করাচার্য্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ইত্যাদির সহিত পুরীর সম্বন্ধ কি? জগন্নাথের মন্দির ও সমুদ্রতীরের বর্ণনা কর।

দিল্লী—দিল্লী নগরীর ইতিহাস—ইতিহাসের পুস্তক হইতে সংগ্রহ কর। ইংরাজ আমলে দিল্লী রাজধানী কবে হইতে হইল? দিল্লীর দরবার সম্বন্ধে কি জান? নয়া দিল্লীর পরিচয় দাও। দিল্লীতে কি কি দ্রষ্টব্য আছে? দিল্লী কি করিয়া যাইতে হয়? দিল্লীর ভৌগোলিক পরিচয় দাও।

কলিকাতা—কলিকাতানগরীর উত্থান কি করিয়া হইল—ইতিহাসের পুস্তক হইতে সংগ্রহ কর। কলিকাতা নাম কেন হইল? কলিকাতার ভৌগোলিক পরিচয়? জনসংখ্যা? প্রসিদ্ধ অংশগুলির নাম? রেলপথসংযোগ? কলিকাতায় ভারতের সকল জাতির লোক একত্র হইল কি করিয়া? কলিকাতার বাণিজ্য?

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বড়বাজার, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দির, গড়ের মাঠ, কালীমন্দির, ঢাকুরিয়ার লেক, খিদিরপুর ডক্, পার্শ্বনাথের মন্দির, মেডিক্যাল কলেজ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, থিয়েটার, বায়স্কোপ, হাইকোর্ট ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।]

গঙ্গা—উৎপত্তি, মোহনা, শাখানদী, উপনদী, তীরস্থ নগর, গঞ্জ, তীর্থ, মঠ, দুর্গ। গঙ্গার দ্বারা এ-দেশের কি উপকার ও অপকার সাধিত

হইয়াছে? গঙ্গাজল হিন্দুদের কাছে এত পবিত্র কেন? গঙ্গা তাহাদের দেবী কেন? গঙ্গার সহিত দেশের সভ্যতা, ঐশ্বর্য্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদির সম্বন্ধ কি?

ভূমিকম্প

যত প্রকার প্রাকৃতিক উপদ্রব আছে, তাহাদের মধ্যে ভূমিকম্প সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। বন্যা, ঝঞ্ঝা ইত্যাদির পূর্ব্বসূচনা দেখা যায়, বজ্রও একটা তাড়িত-বার্ত্তা পাঠায়, আসিবার আগে ইহা কিন্তু কোন সংবাদই দেয় না। পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইবার কোন উপায় নাই। যখন ঘটে, তখন দুইচার মিনিটের মধ্যে একটি দেশকে-দেশ উৎসন্ন যাইতে পারে।

ভূমিকম্প নানা কারণে ঘটিতে পারে। আগ্নেয় গিরির উৎপাতে নিকটবর্ত্তী প্রদেশ কাঁপিতে থাকে। যে দেশে ইহা আছে সে দেশে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। সহসা অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় পৃথিবীর উপরিভাগ সঙ্কুচিত হইলে, নীচের মৃত্তিকা স্তর ভাঙ্গিয়া গেলে অথবা জ্বলন্ত ভূগর্ভে অতিরিক্ত জল ঢুকিয়া সহসা বাষ্পে পরিণত হইলেও ঘটিতে পারে। পৃথিবীর উপরিভাগের খানিকটা অংশ বসিয়া গেলেও এই দুর্ঘটনা ঘটে।

ভূমধ্য-সাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশ, জাপান, উত্তর ভারতবর্ষ ও পশ্চিম আমেরিকায় প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। সমুদ্রের তলে ভূমিকম্প হইলে ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে পোর্ত্তুগালের ও ১৯০৭ খৃঃ অব্দে জ্যামেকায় ভীষণ ক্ষতি হইয়াছিল। কয়েক বৎসর আগে জাপানে ভূমিকম্প হইয়া অসংখ্য লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৭৩১ খৃস্টাব্দের ভূমিকম্পে চীনের পিকিন নগরে লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানি হয়। ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে ভূমিকম্পের সঙ্গে ভীষণ ঝড় হয়, তাহাতে দাক্ষিণবঙ্গে একটা খণ্ডপ্রলয় হইয়া যায়।

এদেশে ১৮৯৮ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পে বঙ্গদেশে ও আসামের এবং ১৯৩৪ অব্দের ভূমিকম্পে উত্তর বিহারের অধিকাংশ কোঠাবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। এই ভূমিকম্পে হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি হইয়াছে ও বহু কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে।

মুঙ্গের, মজঃফরপুর নামক দুইটি প্রধান নগর একেবারে বিধ্বস্ত। দ্বারভাঙ্গা, জামালপুর, সীতামারি ও নেপালে কাটমুণ্ড শহর প্রায় বিধ্বস্ত। লোকের হাহাকারে ও আর্ত্তনাদে সমস্ত ভারতবর্ষ মুখরিত হইয়াছে। ঐরূপ ভীষণ ভূমিকম্প ভারতবর্ষে বোধ হয় কখনও হয় নাই।

ভূমিকম্পে অনেক সময় দেশের রূপই বদলাইয়া যায়। কোন স্থান উঁচু হইয়া উঠে, কোন স্থান বসিয়া যায়, নদী মজিয়া যায়, নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মাটি ফাটিয়া গরম জল, বালি. গন্ধক ও কাদা উঠে—নূতন নূতন প্রস্রবনের সৃষ্টি হয়। ইহা ছাড়া, বন্যা আছে—আগুন লাগিয়া গ্রাম, নগর পুড়িয়া যায়—মড়ক লাগিয়া যায়। ইহা একটি **খণ্ড-প্রলয়** বিশেষ।

জন মিল্‌নের তালিকা অনুসারে ১৬শ শতাব্দীতে ২৫৩ বার, ১৭শ শতাব্দীতে ৩৭৮ বার, ১৮শ শতাব্দীতে ৬৪০ বার এবং ১৯শ শতাব্দীতে ২১১৮ বার ভূমিকম্প হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ক্রমে ভূমিকম্পের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে।

মানুষ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালানকোঠা-ইমারত তৈয়ারী করিয়া, কাজ-করিবার ও সুখের সংসার ফাঁদিয়া বসে। এইভাবে শত শত বৎসরে এক-একটা শহর গড়িয়া উঠে। মা-মেদিনী দু'চার মিনিটের জন্য একবার গা-ঝাড়া দিলেই একেবারে সব শ্মশান। মানুষের বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধন-দৌলতের এত আড়ম্বর, ঘটা ও সমারোহ যে কত অসার, কত ভঙ্গুর, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য **রুদ্রদেব** মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়েন—

ভূমিকম্প সেই হুঙ্কারেরই ফল। ভূমিকম্প ইটপাথর আর লোহার গড়া বর্ত্তমান ইমারতী সভ্যতার পরম শত্রু। মূলধনী ও ধনীদের দর্প চূর্ণ করিতেই প্রধানতঃ ভূমিকম্পের আবির্ভাব। কুটীরের ভয় বন্যাঝঞ্ঝায়—ভূমিকম্পে তাহার ভয় নাই। তাই বলিয়া কুটীরবাসী গরীব লোকেরাও ভূমিকম্পের হাত হইতে রেহাই পায় কই? বেচারারা ধনীদের ইমারতে জীবিকা অর্জ্জন করিতে গিয়ে চাপা পড়ে।

অনুশীলনী

দুর্ভিক্ষ—দুর্ভিক্ষের অর্থ কি? দুর্ভিক্ষ কেন হয়? কোন্ দেশে বেশি হয়? আগে বেশি হইত? না—এখন বেশি হয়? আজকাল দুর্ভিক্ষনিবারণের কি সুযোগ হইয়াছে? সরকার ও দেশের লোক দুর্ভিক্ষের সময়ে কি ভাবে সাহায্য করে? রেলপথের সহিত দুর্ভিক্ষ-নিবারণের কি সম্বন্ধ? কি উপায়ে দুর্ভিক্ষকে চিরদিনের মত দূর করা যায়? দুর্ভিক্ষের ভীষণ চিত্র অঙ্কিত কর। বাংলার দুই মন্বন্তরের কাহিনী।

বন্যা—বন্যা কেন হয়? বন্যার সময় দেশের কি অবস্থা হয়? বন্যা নিবারণের উপায় কি? বন্যা আসিবার পূর্ব্বে কিছু জানা যায় কি? বন্যা কোথায় বেশি হয়? বন্যার সঙ্গে দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধ কি? সংবাদপত্রে যদি কোন বন্যার বিবরণ পড়িয়া থাক তবে এই প্রসঙ্গে জানাও। বন্যায় কি কেবল কুফলই হয়?

ঝঞ্ঝা—ঝঞ্ঝা কত প্রকারের? একটি কালবৈশাখী ঝড়ের বর্ণনা দাও। ঝঞ্ঝায় জাহাজ, নৌকা, জীবজন্তু, গাছপালা, ঘরদুয়ার ও মানুষের জীবনে কি ক্ষতি হয়? ঝঞ্ঝায় কি কোন ফল ভাল হয়? ঝঞ্ঝায় কোথায় বেশি ক্ষতি? গ্রামে—না নগরে? পূর্ব্ব হইতে ঝঞ্ঝার খবর কি জানা যায়?

মহামারী—কোন্ কোন্ রোগের প্রকোপে মহামারী ঘটে। মহামারী কেন ঘটে? মহামারী ঘটিলে পুরজনপদের কি অবস্থা হয়—

তাহার বর্ণনা দাও। মহামারী নিবারণের উপায় কি? যাগযজ্ঞ ও দেবপূজাদিতে কি কোন ফল হয়? কোন্ দেশে বা কোন্ অঞ্চলে মহামারী বেশি হয়? মহামারী ঘটিলে জনসাধারণ, দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠান ও হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য কি? কলেরা, বসন্ত ও প্লেগের জন্য বর্ত্তমান যুগে কি ব্যবস্থা হইয়াছে? ম্যালেরিয়াকে মহামারী বলা যায় কি?

রচনা সম্বন্ধে দুই একটি কথা

রচনা বলিলে কেবল মামুলি নিবন্ধ-রচনা বুঝায় না। রচনা নানাশ্রেণীর হইতে পারে এবং নানা ভঙ্গীতে রচনা লেখা যাইতে পারে। এই পুস্তকে সকল ভঙ্গীর নিদর্শন দেখানোর সুযোগ নাই। **বাঁশ, গো ও মহিষ, একটি অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা, ফুল, পাখী, সীতা, কাশীভ্রমণ, ছয় ঋতু** ইত্যাদির প্রত্যেকটি ভিন্ন-ভিন্ন ভঙ্গীর রচনার দৃষ্টান্ত।

কোন বিষয়ে রচনা লিখিতে হইলে যে ভঙ্গীটি বিষয়ের উপযোগী হইবে, শিক্ষার্থিগণ সেই ভঙ্গীটি বাছিয়া লইবে, ইহাই প্রত্যাশা করা যায়। যে কোন ভঙ্গীর রচনাকে নিবন্ধাকারেও পরিবর্ত্তিত করিতে পারা যাইবে।

নিম্নতর শ্রেণীর বালকগণ প্রভূত সঙ্কেতসূত্র না পাইলে কোন রচনাই লিখিতে পারে না। সে-জন্য অনেক বিষয়ের সঙ্কেতসূত্র বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইল।

অল্প পরিসরের মধ্যে রচনার নিদর্শন বা সঙ্কেতসূত্র দেওয়াই চলে,—বহু রচনা লিখিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়।

পরিশিষ্ট

বিবিধ প্রকারের প্রশ্নের নিদর্শন

১। নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলি হইতে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ গঠন করিয়া সেইগুলির দ্বারা বাক্য রচনা কর ঃ—

পাওয়া, চলা, হাঁটা, নাচা, দৌড়ানো, সাতরানো, টানা, চষা, বিধা।

২। নিম্নলিখিত বিশেষ্যপদগুলি হইতে নাম-ধাতুর ক্রিয়া পদ গঠন করিয়া বাক্যে ব্যবহার কর ঃ—

লতা, আটক, গাছ, কাদা, পাঁক, বেত, ঘাড়, লাথি, হাত, আঁচড়, কামড়, আগল (অগল), জিজ্ঞাসা, আতঙ্ক (আঁৎকানো)। ফল, ফুল।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলি হইতে চলতি ভাষায় বিশেষণ পদ গঠন করিয়া বাক্যে ব্যবহার কর ঃ—

ঘুম, চুরি, চলা, নিবানো, জ্বলা, পাটনা, সে-কাল, মাঠ, মাটি জমক, জাঁক, তামা, আঁশ, বাড়, উঠা, হাসি, কাঁদান, ফুটা, আদর, বাঁধা।

৪। নিম্নলিখিত পদগুলিকে বিশেষণে ব্যবহার কর ঃ—

সত্য, মিথ্যা, বিনা, আসছে, অন্ধকার, পুণ্য, অতিশয়, সমুদয়, আশ্চর্য্য, চমৎকার, বিলক্ষণ, সম্ভব, সামান্য, শেষ, সমূহ, মূল, সার।

৫। এই শব্দগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন পদে ব্যবহার কর ঃ—

বিশেষ, নিশ্চয়, কাজেই দিব্য, গেল, বিনা, নীল, পাঁচ, ভিতর, উপর, ভালো, হয়, নয়, না, কি, জানা, যথেষ্ট, জোর, যে, দূর।

৬। শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর ঃ—

—থাকিলে যাহার গাছ মরিয়া যায় তাহাকে—বলে।—দিক্ হইতে

—কালে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহাকে—বলে।—ভিক্ষা করিয়া খাইব —দাসত্ব করিব না। পক্ষীর—, ভ্রমরের—, নদীর—সমস্ত মিলিয়া অপূর্ব—সৃষ্টি করিয়াছে। নদী-সমুদ্রের জল—হইয়া আকাশে উঠে, তাহাই—হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে।—যত প্রখর হইবে,—ততই প্রবল হইবে —কাছে গান শিখিতে গিয়া অনেক—তাহার ধর্ম্মই গ্রহণ করিয়া বসে। কার্য্যে কাহাকেও—করিয়া বিনা কারণে তাহাকে—করা উচিত নয়। এ জগতে—সুখ নাই, দুঃখকে—দিয়া সুখ—করিবার উপায় নাই।—দান করে,—চোখ উঠায়। এদেশ হইতে পাট—হয়, তাহার বদলে শীতবস্ত্র এদেশে—হয়।—গুড় চালিবে,—মিষ্টি হইবে।

৭। নিম্নলিখিত শূন্যস্থানগুলিতে অক্ষর বসাইয়া শব্দগুলিকে সম্পূর্ণাঙ্গ কর :—

স—রাচ—, অ—য়ো—নীয়, প্র—ন্ন—লি লা—গা—থী, শ—নাথী —, দি—জয়া, প্রতি—ন্দ্বী, সে—শু—ব, স—বরা—, অ—বশ্য— অ— র্য্যাদি—, উ—র্ত—কা, উ—কা—ত, —ত্—র্না—, দু—ধ—ল, শ—শ্যা, প্র—স—র, ভ—র—তি, চ—ণামৃ—।

৮। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মার্জ্জিত ভাষার রূপ বল :—

ভাত, মাড, দাড়, মশা, দুধ, উট, মউনা, ননী, গাধা, দই, মাছি, মাছ, পাগল, হালকা, ঠুনকো, সবুজ, গরম, নরম, ঝাঁটা, কাঁটা, হাঁচি, ঘুমন্ত, খাঁচা, কলসী, জাতা, কাটারি, দা, পশম, রেশম, বেগুন, খাঁটী, কলম, দোয়াত, সাকরেদ, ওস্তাদ, তাঁতী, কাঁসারী, চামার, উনুন, কয়লা।

৯। অর্থের পরিবর্ত্তন না করিয়া নিম্নলিখিত উক্তিগুলিকে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ কর :—

আমার ফুল ভাল লাগে। আমি সাঁতার জানি। তাহাকে সন্তুষ্ট

কর। তাহার পরাজয় হইয়াছে। আমি ভয় পাইলাম। ভরা পেটে হাঁটা যায় না। চন্দ্র উদিত হইল। সে রাত্রিতে দেখিতে পায় না। ফুল হইতে ফল জন্মে। আকাশে মেঘ নাই। সে আসিলেই আমি যাইব। অভাব আছে বলিয়াই চাহিতেছি। স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে সচেষ্ট হইও। যত্ন বিনা রত্ন লাভ হয় না। দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় না মহীতে। আমার দোষ নাই। দোষী হই, দণ্ডিত হইব। প্রার্থীকে ফিরাইও না। মহারাজের জয় হউক। ঘুমন্তকে জাগায়ো না। অসত্য কখনও জয়ী হয় না। দেরী হইলে যে ক্ষতি হইবে—তাহার পূরণ হওয়া অসম্ভব। একখানি চিঠি পাইলাম তাহাতে লেখকের নাম নাই। দাতার গৌরব যত বাড়িবে, গ্রহীতার গৌরব তত কমিবে। রবিদাসের শ্রীবৃদ্ধি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাঁহার মনে ধন-লালসা স্থান পায় না। তিনি রাজার সমীপে আহূত হইলেন।

১০। ভুল থাকিলে সংশোধন কর ঃ—

রোগ জন্মিতে উপক্রম করিল। সে যাইবার উপক্রম হইল। পাছে রাগ কর সেজন্য আসিলাম, বরং আসিতাম না। ভাত খাইয়া ঘুম পাইল, দুইদিন ঘুমাইয়াছিলাম না, সামান্য শোয়ামাত্র ঘুমে পতিত হইলাম। রাত্রি অবসান হইল, পাখিগণ আপনাপন কুলায়ে গুঞ্জন করিতে লাগিল। সে চোখে কানা, পায়ে খোঁড়া, কানে বধির। ভীম আপ্রাণ বলে শাঁখে ফুঁ প্রদান করিতে লাগিলেন। একেবারে নির্লোভী হইলে জীবনে কারুর উন্নতি হয় না; যদ্যপিও এই লোভের একটা পর্য্যন্ত আছে। চালাইবার জন্য ইঞ্জিনের জল প্রয়োজন। তাহার বাড়ী আমার যাতায়াত থাকিল না। দোষেরা অপেক্ষা গুণেরা বেশী হইলে, মানুষকে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মুখশ্রী ও কণ্ঠের সঙ্গীত শুনিয়া লোকগণ মুগ্ধ হয়। বিচারক কর্ত্তৃক সে শাস্তি প্রদত্ত হইয়াছে। টাকা

লেফাফাদুরস্ত, জলজিয়ন্ত,। আকাশকুসুম, হস্তিস্নান, পাকচক্র, জলপানি, হাতখরচ, কাঠফাটা, ফুটিফাটা, বাঁশবনে ডোমকানা।

১৫। নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলিকে বাক্যে ব্যবহার কর :—

বরদাস্ত করা, দরখাস্ত করা, বরখাস্ত করা, গেরেফ্তার করা, আর্জি করা, পেশ করা, রপ্তানি করা, বাহাল করা, বন্দোবস্ত করা, আমদানি করা, আন্দাজ করা, মুলাকাৎ করা, মৎলব করা, সাজা দেওয়া, তর্জ্জমা করা, হাওলাৎ করা, তাঁবেদারি করা, উমেদারি করা।

১৬। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে উপবাক্য যোগে পূর্ণাঙ্গ কর :—

যদিও তাহার স্বাস্থ্য ভাল—। বরং পায়ে হাঁটিয়া যাইব,—। পাছে ট্রেন ফেল করি,—। যেহেতু তাহার অবস্থা মন্দ—। এতই যদি তোমার অভাব—। দিয বা একটি চাকরি পাইলাম—। যতই সাধ্যসাধনা করা—। যেখানে বাঘের ভয়—। সারা রাত্রি বৃষ্টি হইলেও—। ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই—। কেবল কি সে চুরি করে—। গানত জানিই, তাছাড়া—। জমিদারের খাজনা ত আছেই —। তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে—। কান টানিলে—। দাঁত থাকতে—। সুসময়ে সকলেই—, অসময়ে—। পেটে খেলে—। খোঁড়ার পা—। শালগ্রামের উঠাবসা—। বড় হবিত—।

১৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলির বিপরীতার্থক শব্দ বল :—

উত্তাপ, অনুকূল, দক্ষিণ, পথ্য, সহযোগী, সাফল্য, জয়, চতুর, চালাক, ঘুমন্ত, কম, ন্যূন, হ্রস্ব, মিহি, সুগন্ধি, দুর্লভ, সুকর, বিনীত, ওঠা, শুকো, শুক্নো, শুষ্ক, নীরস, সহজ, দরদী, গতিক, দুঃস্থ, সুমতি, বিপন্ন, উত্তম,

উত্তমর্ণ, কুটিল, প্রবীণ, প্রাচীন, উর্দ্ধতন, দৌরাত্ম্য, দণ্ড, স্মৃতি, আয়, লাভ, বাঁকা, ঋজু, দ্রুত, ঝামা, প্রকৃতিস্থ।

১৮। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সহিত যথাযোগ্য বিশেষণ বসাইয়া বাক্য রচনা কর :—

মনোযোগ, পরিশ্রম, তৃপ্তি, সাহস, তেজস্বিতা, আনন্দ, দুঃখ, বিপদ্, ঐশ্বর্য্য, শাসন, আলোচনা, আরাধনা, পিপাসা, বিবেচনা, বিচার, বিবাদ, ঘটনা, সংবাদ, মিলন, শোক, পরাজয়, পরাক্রম, গৌরব, বিকাশ।

১৯। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্য হইতে বাছিয়া এক-একটি বিশেষণপদের সহিত এক-একটি উপযোগী বিশেষ্যপদ যোগ কর :—

নিষ্কলঙ্ক, পঙ্কিল, অনির্ব্বচনীয়, অনুপম, তৃপ্তি প্রশ্ন, দেশবিখ্যাত, অপরিসীম, শয্যা, দুরূহ. প্রকৃতি, অক্লান্ত, অসামান্য, মূর্ত্তি, অসৎ, আনন্দ, সৌন্দর্য্য, চরিত্র. দুগ্ধধবল. জল, উৎসর্গ দেবতা. মহিলা, চরিত্র, সরল, পরিশ্রম, কবি, প্রতিভা, সৌম্য, আরাধ্য, মহীয়সী।

২০। যোগ কর :—

আপন্ন, উদ্ধার সঙ্কুল কাল ও গ্রস্ত—**বিপদ্** শব্দে।

পীড়া, রোগ, ত্রাণ ছেদ, উ পরি—**শিরঃ** শব্দে।

রেখা, রত্ন, পুঞ্জ, শাস্ত্র বেত্তা, ইন্দ্র—**জ্যোতিঃ** শব্দে।

অঙ্গনা, অন্ত, ইন্দ্র দিগন্ত, মণ্ডল—**দিক্** শব্দে।

২১। অল্পকথায় এই বাক্যগুলির ভাবপ্রকাশ কর :—

(ক) এই বিদ্যার আলয়টির শ্রী যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে নগরে যাহারা বাস করে তাহাদের প্রত্যেকের শক্তির অতিক্রম না করিয়া অর্থের দ্বারা সাহায্য করা উচিত

(খ) যাহার সন্তান নাই তাহার গৃহে আনন্দ নাই। (গ) যাঁহারা পূজার যোগ্য তাঁহাদের বাক্যও শিরে ধারণের যোগ্য। (ঘ) হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সেনা লইয়া মগধরাজ যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। (ঙ) যাহাদের কিছুই নাই, যাহাদের অন্ন জোটে না, যাহাদের সহায় নাই, সম্বল নাই, তাহারাই তোমার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করে। (চ) বিদ্যাসাগর ছিলেন দীনগণের বন্ধু, তাঁহার ভয়-ডর ছিল না, তাঁহার তেজ ছিল অপরিমিত, দেশের হিত ইচ্ছা করিতেন এবং সাধারণ লোকদের শিক্ষক ও গুরু ছিলেন।

২২। অর্থের প্রভেদ নির্ণয় কর :—

সারা ও সাড়া, বাড়ি ও বাড়ী, পরস্ব ও পরশ্ব, উদ্দেশ ও উদ্দেশ্য, প্রভূত ও প্রভুত্ব, পারা ও পাড়া, পার ও পাড়, জাতি ও জাতী, তুলা ও তুলা, তাঁত ও তাত, কুঁড়ে ও কুড়ে, পাঁশ ও পাশ, অবলা ও অবোলা, কাট ও কাঠ, কুটা ও কুঠা, জোর ও জোড়, ক্রোর ও ক্রোড়, কটি ও কোটি, মাপ ও মাফ, আবরণ ও আভরণ, কুল ও কূল, গুড় ও গূঢ়, পাট ও পাঠ, চুরি ও চুড়ি, পান ও পাণ, চাল ও চা'ল, দারা ও দাড়ি।

২৩। নিম্নলিখিত দুই দুইটি শব্দ লইয়া এক একটি বাক্য গঠন কর :—

১। কাক, কোকিল; ২। বিড়াল, বাঘ; ৩। অহি, নকুল; ৪। আকবর, প্রতাপ; ৫। চন্দ্র ও সূর্য্য; ৬। কৌরব, পাণ্ডব; ৭। ভয়, ভক্তি; ৮। দেশ, দশ; ৯। এক, দশ; ১০। ফুল, ফল; ১১। বসন্ত, কোকিল; ১২। শরৎ, ধান্য; ১৩। বিক্রমাদিত্য, কালিদাস; ১৪। জল, বাষ্প; ১৫। পল্লী, নগর।

২৪। মার্জ্জিত ভাষায় পরিণত কর :—

(ক) ঘরে ভাত নাই, পরনে ছেঁড়া ময়লা কাপড়, খড়ের ঘরের চালে ফুটো, জল পড়ে, ব্যামো হ'লে দাওয়াই পায় না, এছাড়া জমিদারের জুলুম, এইত চাষীদের হাল। মজুরেরা রোজ আনে রোজ খায়—এক রোজেরও পুঁজি থাকে না—যেদিন কাজ পায় না সেদিন হয়ত উপোষ করে। এইত মজুরদের হাল। গাঁয়ের ছুতোর, কামার, কাঁসারি, সেকরা, তাদের পেটেও ভাত জোটে না।

(খ) আজকাল ছেলেরা পড়াশোনায় মন দেয় না, খেলার মাঠেই কাটায় বিকেল বেলাটা, সন্ধ্যের সময় বায়স্কোপে যায়—সকাল বেলায় খবরের কাগজ খুলে খেলা নিয়ে গুলতান করে, ইস্কুলে যায় বটে, কিন্তু পড়া শোনার জন্য নয়, একবয়সী ছেলেদের সাথে মিশে গল্প ক'রে দুপুর বেলাটা কাটাবার জন্যে। ইস্কুলে সাজা দেওয়া যত উঠে যাচ্ছে—পরীক্ষা যত সোজা হচ্ছে ছেলেদের দেওয়া মাইনে ছাড়া ইস্কুল চালানো যত কঠিন হচ্ছে—পড়া শুনার দফা তত ঠাণ্ডা হচ্ছে।

২৫। গুরুচণ্ডালী দোষ সংশোধন করিয়া লিখ :—

ব্রহ্মদত্তের রাজত্বির সময় এক বামুন তক্ষশিলা শহরে সর্ব্বশাস্ত্র পড়ে শেষে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া হিমালয়ে যান। কিছুকাল পরে তিনি একবার সমতলে অবতীর্ণ হয়ে আসিয়া বারাণসী শহরে ঢোকেন। রাজপথে তাঁহাকে দেখে রাজার ভক্তি গজাইল। রাজা দেখে বুঝিলেন—এই সন্নিসী সমস্ত লোভলালসা জয় ক'রে একেবারে সুখদুঃখের সীমা ছাড়িয়ে উঠেছেন। রাজা কদর ক'রে তাঁর প্যালেসে ডেকে এনে অনেক ভকতি নিবেদন করিলেন। সন্নিসী মহাখুশী হইয়া রাজাকে বলিলেন—"তোমার কি আর্জ্জি?" রাজা বলিলেন—"হুজুর কিছুকাল আপনি আমার পুরবাগানে বসতি ক'রে আতিথ্য গ্রহণ করুন।"

২৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে যথাযোগ্য ক্রম ও শৃঙ্খলা অনুসারে বাক্যে সাজাও :—

(ক) পথের কাঙাল সম্রাটের নিমন্ত্রিত কবি সভায়। (খ) নানা প্রশ্নের বহুকাল ধরিয়া আসিতেছে বৈজ্ঞানিকদের হইতেই মনে ভূমিকম্প সৃষ্টি। (গ) ভারতবর্ষের আগেও বড় বড় সর্ব্বত্র এরূপ নৌকা ছিল। (ঘ) চাষবাস ব্রাহ্মণ হইলেও কবিকঙ্কণ করিয়া নিজে খাইতেন। (ঙ) সে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবে তোমরা কি আবার? (চ) সীতাকে অযোধ্যার সিংহাসন দিয়া রামচন্দ্র বিভীষণকে লইয়া লঙ্কায় ফিরিলেন। (ছ) জটায়ুকে বাঁচাইতে গিয়া নিজের হাতে সীতাকে রাবণের প্রাণ দিতে হইল। (জ) যাত্রার সময় সন্ধ্যার আরম্ভ হইল। (ঝ) জলে হাত পুড়িয়া গেলে আগুনে হাত দিও না, তাহাতে জ্বালা না বাড়িয়া কমিয়া যাইবে। (ঞ) ফল হইতে জন্মে ফুল, গাছের বীজ নূতন ফলের করে সৃষ্টি। (ট) দেশের যাহা কিছু ছিল দশের সবই তাঁহার।

২৭। নিম্নলিখিত শব্দগুলিকে শুদ্ধভাবে লিখ :—

কদিচ, পিচাশ, সততা, যোদ্ধাগণ, পিতৃঠাকুর, সোজন্যতা. দুরাদৃষ্ট, দুরাবস্থা, জাত্যাভিমান. বয়াধিক্য, দিগেন্দ্র, বেআব্রুতা, জ্ঞাতার্থে, আপত্য, গৃহিণীরোগ, উদ্বর্ত্ত, যাবদীয়, আমাবস্যা, সুরধনী, মঞ্জুরী, মুঞ্জরী, পৃথকান্ন, নিরপরাধী, নির্ব্বিরোধী, ভগবানদত্ত, ভাগ্যমানী, বোঝমান, পছন্দনীয়, যশাকাঙ্ক্ষা, এদেশীয়, বরফাচ্ছন্ন, চাষাবাদ, আপ্তদোষ, উপরোক্ত, শক্তিহীন, প্রদর্শন, করানো, ঘনিষ্ঠতম, জলছত্র, দাহ্যশক্তি, উৎসর্গীকৃত, নিশ্চয়তা।

২৮। (ক) এমন দশটি বাক্য লিখ যেগুলিতে ক্রিয়াপদ নাই। (খ) এমন দশটি বাক্য লিখ যাহাতে তিনটি করিয়া

ভিন্ন ভিন্ন কারক পদ আছে। (গ) গণ-শব্দ যোগে নিম্নলিখিত শব্দগুলির বহুবচন দেখাও :—

বিদ্বান, রাজা, পক্ষী, ভ্রাতা, যোদ্ধা, বণিক, সম্রাট্, সখী

(ঘ) এমন কয়টি প্রবাদ বাক্য বল যেগুলিতে নিম্নলিখিত শব্দের কোন-না-কোনটি আছে—

সূচ, উঠান, মূল, লাঠি, লাজ, ইজ্জত, ঘোড়া, তাঁতী, গোয়াল, কাঁটাল, গাছ, চাল, মাছ, ছাতা, বিড়াল, ক্ষুর, দাঁত, দু কান-কাটা।

২৯। নিম্নলিখিত কবিতাগুলির ভাবার্থ লিখ :—

অক্ষমের মা—একটি ছেলে কাঙাল তোমার অন্য ছেলে ধনী,
একটি তোমার পথের কাঁকর আরটি চূড়ামণি।
একজন মা ভিখ মেগে খায় অন্যজনা দাতা,
একজন মা পায়ের চাকর অন্যে দেশের মাথা :
বড়র তোমার বুদ্ধি কত, ছোটটি নির্ব্বোধ,
ছোট কেবল দেনাই বাড়ায় বড় করেন শোধ।
বড় তোমার গুণের সাগর নিত্য যোগায় ভেট,
ছোটর অপযশে সদাই তোমার মাথা হেঁট।
এক জিনিসে ছোট তোমার বড়য় গেছে জিতে,
ছোটই বেশি ভাগ বসালো তোমার স্নেহটিতে।

গোলামের তেজ—ঘুড়ি ডেকে কয়, "ওরে প্রজাপতি, যোজন খানেক তলে,
রোস্ তুই, তবু দেখি তোরে শুধু দিব্য দৃষ্টি-বলে।
আচ্ছা বল্ ত গ্রহমণ্ডলে চলা ফেরা দেখে মোর,
অবাক হ'য়ে কি রোস্ নাক চেয়ে? হিংসা হয় না তোর?"

প্রজাপতি কয়—"মর কি বুদ্ধি, কাগুজে চিড়িয়া ঘুড়ি,
আমি কেন তোর হিংসা করব? মধু খেয়ে খেয়ে উড়ি।
তুই ত বন্দী, কর না বড়াই যতই উপরে থেকে,
স্বাধীন কখন' হিংসে করে কি গোলামের তেজ দেখে?"

ছোটর কথা—ছোট্ট তারা ঝিকমিকিয়ে নীল আকাশে ভাসে।
ছোট্ট বটে—তবু তারাই ধরার আঁধার নাশে।
ছোট্ট পাখী কাণ জুড়ালো ছোট্ট দীপে ঘরটি আলো
ছোট্ট ফুলে মন মাতালো স্নিগ্ধ মধুর বাসে,
ছোট্ট খোকন ছোট্ট দাঁতে মোহন হাসি হাসে।
ছোট্ট বলে' কিন্তু এরা অবহেলার নয়।
ছোট্টদেরই ভালবাসি বড়য় করি ভয়।
ছোট্ট মুখের মধুর ভাষা জাগায় প্রাণে কতই আশা
তরুর গায়ে অরুণ শোভা ছোট্ট কিশলয়।
ছোট্ট নিয়েই বড়র বড়াই ছোট্টদেরি জয়। (শোভা দেবী)

স্বাবলম্বন—হাত পা সকলেরই আছে, সকলেরই জোর আছে গায়;
কারো বেশি কারো কিছু কম; তাতে কিছু নাহি আসে যায়।
বড় পদ, বেশি টাকাকড়ি, কেহ পায়, কেহ নাহি পায়;
তা যদি আপনার দাম, লজ্জা-দুঃখ কেন হবে তায়?
আমা হতে কিছুই হবে না,—বলে যারা করে হায়-হায়,
তারা করে নিজ অপমান, অবিশ্বাস করে বিধাতায়।

অমূল্য সময়—ধন-বিনিময়ে লোক কত দ্রব্য পায়।
আছে মহামূল্য যত সামগ্রী ধরায়॥
ধন দিলে কি না মিলে? অমূল্য সময়
রাশি-রাশি ধন দাও, ফিরিবার নয়।

নিতান্ত নির্ব্বোধ যেই শুধু সেই জন
অমূল্য সময় করে, বৃথায় যাপন।

কে বড়—আপনাকে বড় বলে বড় সেই নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।
বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয় বড় গুণ যার।
গুণেতে হইলে বড় বড় ক'বে সবে,
যদি বড় হতে চাও ছোট হও তবে।

উদ্যম—কি কারণে ভীরু তব মলিন বদন?
যতন করহ লাভ হইবে রতন।
কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ
উদ্যম বিহনে কভু পূরে মনোরথ?
কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে?
দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় কি মহীতে?

জন্ম ও কর্ম্ম—নীচ কুলে জন্মিলে কি হয়? পঙ্কজেরো জন্ম পাঁকে
রূপে গুণে ফুলের সেরা দেব্‌তা খুসী পেয়ে তাকে।
জন্ম হউক যথা তথা কর্ম্ম ভালো নিয়ে কথা,
রবি বই মুখ খোলে না সে, কবি বই কার কথায় থাকে?

দুঃখের তুলনা—একদা ছিল না জুতা চরণ যুগলে।
দহিল হৃদয়-মন সেই ক্ষোভানলে।
দেখি পথে একজন পদ নাহি তার,
অমনি জুতার খেদ মিটিল আমার।
পরের অভাব মনে করিলে চিন্তন,
নিজের অভাব ক্ষোভ রহে কত ক্ষণ?

ব্যর্থ জীবন—অর্থ আছে কপর্দ্দক নাহি ব্যয় করে,
বিদ্যা আছে বুদ্ধি আছে, কাজ নাহি করে,
শক্তি আছে নাহি করে পর উপকার,
তেজ আছে দাঁড়াইয়া দেখে অবিচার,
সে নর চিত্রিত এক ছবির মতন
গতি নাই, বাক্য নাই, জড় অচেতন।

ফুল—জোটে যদি মোটে একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি',
দুটি যদি জোটে তব অর্দ্ধেকে ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী!
বাজারে বিকায় ফল তণ্ডুল সে শুধু মিটায় দেহের ক্ষুধা,
হৃদয় প্রাণের ক্ষুধা নাশে ফুল দুনিয়ার মাঝে সেইত সুধা।

দান—ওহে মেঘ তুমি আকাশে ঘুরিয়ে কি কথা বলিছ ভাই,
মেঘ ডেকে কয়—"পরের লাগিয়া জীবন ঢালিতে চাই।
কত যতনে লুকায়ে রেখেছি বুকের মাঝারে জল,
বন-উপবনে তৃষিত ভুবনে করিব যে সুশীতল।"
ছোট ছোট তারা, সারারাত ধ'রে কেন জেগে আছ তাই,
অপলক-চোখে হেরিছ মোদের আঁখিতে কি ঘুম নাই?
হেসে তারা কয়—"যারা রাতে হয় আঁধারেতে পথহারা,
তাহাদের লাগি দীপ ধরে জাগি—পথ খুজে পায় তারা।"
ওহে তরু, তুমি নীরব ভাষায় কি কথা জানাও ভাই?
তরু কয়—"মোর যাহা কিছু আছে সবারে বিলাতে চাই।
শ্রান্ত পথিকে ছায়া করি দান দিই সুরসাল ফল;
ভালবাসি তাই সবারে বিলাই যাহা আছে সম্বল।
ভরা নদী, তুমি কি গান গাইয়া কোথা ছুটে যাও ভাই?
নদী ডেকে কয়—"পরের লাগিয়া পরাণ বিলাতে চাই।

সময় যে নাই তাই দ্রুত ধাই দুকূল ভাসায়ে যাই ;
দিল যে পরাণ তাঁর জয়গান দেশে দেশে ঘুরে গাই।"

উত্তম ও অধম—কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়,
কামড়ের চোটে বিষদাঁত ফুটে বিষ লেগে গেল তায়।
ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা বিষম ব্যাথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে হায় জাগে শিয়রের আগে।
বাপেরে সে বলে ভৎর্সনা ছলে কপালে রাখিয়া হাত,
তুমি কেন হায় ছাড়িলে তাহায় তোমারও কি নাই দাঁত ?
মিষ্ট হাসিয়া আর্ত্ত কহিল তুই রে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের গায় দংশি কেমন ক'রে ?
কুকুরের কাজ কুকুর ক'রেছে কামড় দিয়েছে পায়,
তা ব'লে কুকুরে কামড়ানো কিরে মানুষের শোভা পায় ?

শেষ গোলাপ—গেছে মধুমাস, শুকায়ে ঝরেছে সকল গোলাপগুলি,
বুলবুলি আর মিঠে বোল তুলি যায় নাক হেথা বুলি'
সবে দিল ফাঁকি, আছিস্ একাকী, মুখে নাই তোর বাণী !
জীবনপথের একলা পথিক, পথ আর কত খানি।
ব্যথার ব্যথী বা মরমের কথা শুনিতে সাথীটি নাই,
তিল তিল ক'রে দ'হে দ'হে তোরে মরিতে দিব না ভাই !
প্রিয়জনগুলি ঘুমায় যেথায় এই বাগিচার গোরে,
তোরো সেথা ভাই হোক আজ ঠাঁই, বোঁটা হ'তে ঝ-রে ঝ'রে।
এমনি করিয়া বান্ধবগুলি চলে যাবে যবে ছাড়ি,
আমিও তাদের পিছু পিছু আহা চলে যেতে যেন পারি।